CUL-No 1847-347872

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩০এ পৌষ, ১৩২৬

৫ কঃ ১ মঃ—
৫ ক : ১৫ মঃ
৩০ পৌষ ১৩২৬
—৩০ মাঘ
১৩২৭

UNIVERSITY

756·3
017/85
V.5

মঙ্গল পথ

সৃষ্টি রচনায় অসমর্থ, অমিশ্র গুণের প্রকাশ নাই, দেবতার ভাষা অন্তরীক্ষে ঝঙ্কৃত হইলেও মর্ত্ত্যবাসীকে উহা উদ্বুদ্ধ করিয়া মানবের কণ্ঠে অমর বাণী যে দিন স্বরে সুরে তরঙ্গায়িত হইয়া দিনই বিশ্বের জীবনে অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভূত হয়, মানবের প্রভাবে অমোঘ শক্তি লাভ করে।

ন্দ্র মানুষ ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে জাতীয় জীবনের প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হইল, দেবতার আদেশ যে দিন বর্ণযোজিত হইয়া প নির্গত হইল, সেই দিন তিনি হইলেন ঋষি। বাঙালী কে একে অনেক মন্ত্রের সাধনা করিয়াছেন; ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীর জীবনে কি অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অবগত আছেন। আজ মন্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হির ছাড়িয়া অন্তর অধিকার করিয়াছে, এই মন্ত্রপরিবর্ত্তনের র্ত্তকে" আলোচিত হইয়াছে। গতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন জাতি নব দীক্ষিত হইতেছে; অন্তঃসাধনার যুগে সে গোপন মন্ত্র এক্ষণে কনিষ্ঠ সাধকগণের প্রাপ্য, সে মন্ত্র বাংলার গগন পবন মুখরিত জাগ্রত শক্তিরূপে যাহার তাহার নিকট প্রতিভাত নহে, তবে ক্ষিত হইয়াছে, অভিষেকের দিন আগতপ্রায়।

মন্ত্রশক্তিই বাঙালীর জীবনকে গতিশীল করিয়াছে, এই মন্ত্র কণ্ঠবিনির্গত হইলেও, সে গুরু নহে, উপলক্ষ মাত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে সাধকগণের জীবন অধিকার করিতেছেন, জাতীয়-জীব কর্ণধার কোন মানুষ নহে, স্বয়ং ভগবান্।

এই জাতির প্রতিষ্ঠা কোথায় হইবে? জাতীয় যজ্ঞের প্রথম পু ইঙ্গিতে ইহার আভাষ দিয়াছেন।

সপ্তকোটীকণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে

সে আমার সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা স্বর্ণপ্রসূ বাংলা সপ্তকোটী সন্তানের কণ্ঠে একদিন না জলদগর্জ্জনে উচ্চারিত হ "বন্দেমাতরম্", সে প্রথম মন্ত্র ব্যর্থ হইবার নহে, হয় নাই, আজিও সাধনা চলিতেছে।

এই মন্ত্র গৃহীত হইয়াছিল বাঙালীর প্রাণে, মন্ত্রের ইহাই বাঙালীর নির্জ্জীব প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই এই আবিষ্কার, তাই ঋষি গাহিয়াছিলেন—"ত্বং হি প্রাণা শরীরে"।

বাঙালীর সাধনা, মঠে হয় নাই, দেবায়তনে হয় নাই, গীর্জ্জাতে হয় নাই, হইয়াছে—"মন্দিরে মন্দিরে," যেখানে সাধকগ হইয়াছেন, সেইখানেই মাতৃপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া চরণে গড়াগড়ি বর প্রার্থনা করিয়াছেন, পুলকোচ্ছ্বাসে ভায়ে ভায়ে হৃদয় মিলাইয় হইয়াছেন, প্রাণের বিকাশে যে দিন মনের সন্ধান পাওয়া গেল, সেই হইতেই মন্ত্রের পরিবর্ত্তন, এই মন্ত্রপ্রবাহে যাঁহারা ধারাবাহিক আসিতেছেন, তাঁহারাই ইহার মহিমা অধিগত করিয়া, পরমানন্দে ছাড়িয়া গাহিতে পারিলেন, ভারতের তপস্যা—"ত্যাগ নয়, ভোগ নয়,

সাধনার গোপন রহস্য ভাষায় অবর্ণনীয়। সে প্রচেষ্টা রুদ্ধ করিয় র্জ্জগতে আমাদের স্পষ্টতা যাহাতে দিন দিন ফুটিয়া উঠে, তাহারই জন করিতে চাই। অধ্যাত্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ যাঁহারা—তাঁহারা অন্তরে সঙ্ঘের অব্যর্থ শক্তি লাভ করিতেছেন, ইহা আমরা অবগ য়াছি; অতএব সাধনার কথা "প্রবর্ত্তকের" পৃষ্ঠায় অধিক না আঁকিয় প্রকাশের কথাই অধিকতর ভাবে উল্লেখ করিব। ইহাতে স আমাদের দিকে যাঁহারা চাহিয়া থাকেন, তাঁহারাও একটা স্পষ্ট

চন্ত হইবেন, আর যাঁহারা বাহিরের সূত্র ধরিয়া অন্তরের মণিকোটায় ছুতে চাহেন, তাঁহারাও উত্তম সুযোগ পাইবেন।

পথ আমাদের স্পষ্ট, ঋজু। মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। আত্মা , কাজেই আমার জাগরণ, বিশ্বের অকল্যাণের জন্য নহে, মানবাত্মার াবিধানের জন্য, জাগ্রত আত্মার সঙ্গেই আমাদের ঐক্য-া হইবে, তা সে যে জাতিরই হউক্ না, তবে বাংলাদেশেই এই চক্রের নাভিকেন্দ্র সংস্থিত দেখিতে পাই, হয়তো বাঙালীকেই সর্ব্বাগ্রে রূপে প্রকাশ পাইতে হইবে।

এই জাতি খণ্ড প্রাণের জাগরণে গঠিত হইয়া উঠিবে না, আত্মার জাগ- ঘটিলে ইহা সংসিদ্ধ হইবে, সুতরাং বিরোধসৃষ্টি ইহার মূল নীতি নহে, তর যাচ্ঞাও বর্জ্জনীয়। আত্মার প্রকাশই বাহিরকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া বে; বাহিরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সেইখানেই যেখানে আমাদের নমরণের সমস্যা নিহিত আছে, সে সমস্যা নিরাকৃত করিতে হইবে, াত্মার অপমান অথবা নির্য্যাতন করিয়া নহে, মানবাত্মাকে জাগ্রত য়া, তাই বলিতেছি, বাঙালীর কর্ম্মপদ্ধতি বড় বিচিত্র আকারে কাশ পাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রবল জীবন পৃথিবীর বাধায় প্রতিহত হই- ার নহে, ইহার ভীমগতি আর কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

অস্ত্রবলে জীবনসমস্যা মীমাংসিত হয় না, ভারতবর্ষ পশুশক্তিহীন। পশু- বল আহরণপরায়ণ হইলে, প্রতিদ্বন্দ্বী যথেষ্টই বিদ্যমান, বিশ্বের অকল্যাণ- ারী সমস্ত দানবীয় শক্তি ইহার প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে, বিজয়ী হইয়া বার জন্য নহে, আত্মবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ইহারাও যে প্রতিকার চাহে, চাহে, অমঙ্গল আরও অমঙ্গল চাহে না, মিথ্যা—সে আজ কুণ্ঠিত ত, প্রায়শ্চিত চাহে, জগতের ইহা আজ অন্তরের কথা, সেই জন্যই আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, জগৎ চাহে একটা তৃতীয় পন্থা।

বাংলার নবীন জাতি সেই নূতন পথে অভিযান করিবে। বিশ্বের সকল ই আশাপূর্ণনেত্রে নূতনজাতির সিদ্ধিপ্রত্যাশী। জগতের অন্তরতম প্রেরণা লীর জাগরণ চাহে, সে জাগরণের মধ্যে হিংসা থাকিলে, স্বার্থপরতা ল, লোভ থাকিলে, পাপ থাকিলে, স্বয়ং ভগবান্ সে গতি রুদ্ধ া দিবেন, দিব্য জীবন লইয়া পথের মাঝে আজও যে বিঘ্ন, যে পাইতেছি, তাহা আমাদের দৃষ্টিকে উদার প্রসার করিয়া তুলিবার

জন্য, আমাদের অন্তঃপ্রেরণাকে আরও অধিক শক্তিশালী ও জা
করিয়া ধরিবার জন্য, সে বাধা পরম সহায়ক, শত্রু নহে।

অন্তরের যে সাধনা তাহা আঘাতে প্রতিহত হয় না, যেখানে
রের আঘাত পৌঁছিতে পারে না। অন্তর বাহিরে প্রকাশ হইবে,
প্রকারে, নূতন বর্ষে তাহারই একটা আভাস দিব।

আত্মা অমর। সুতরাং আমাদের বাঁচিতে হইবে। সে
ভিক্ষান্নপুষ্ট হইবে না, স্বাধীন উপজীবিকাই আমাদের অবল
তাহার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিব, শিল্প বাণিজ্য বি
করিব, জীবনের জন্য বাহিরের এই প্রকাশ অবধারিত, বাণিজ্যে
প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সাধ্যমত নিজেদের মধ্যেই ই
ক্রমবিস্তার সাধন করিব।

আত্মরক্ষার জন্য অন্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিব—বাহিরের সহিত
সম্বন্ধ, তাহা এই ভাবে রাখিতে চাই—মুক্তিই যে আমাদের
এ কথা গোপন করিব না, এই মুক্তি অন্তরের, বাহিরের সহিত বি
আমাদের ধর্ম্ম নহে।

যেখানে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশে বাধা পাইব সেইখে
আমরা কোন সহায়তা করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব।

সত্যপ্রকাশে সাহসহীন, কার্য্যে কথায় পৌরুষত্ববর্জ্জিত হইব
আপনার এবং অপরের মধ্যে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, এতদুভ
কাহারও অপমান করিয়া সাধনভ্রষ্ট হইব না, শক্তি ও সম্পদ
লোকের সম্মান রক্ষা করিব, আপনাকে কুণ্ঠিত ও ক্ষুদ্র করিয়া
আপনার সত্য ও বৃহৎকে সমান ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া।

পরিশেষে, বর্ত্তমান রাজশক্তির সহিত আমাদের আচরণ কিরূপ
তাহারও একটা ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

রাজশক্তি স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন, তাহা ভাগবত দান বলিয়া
পাতিয়া লইব, লঘুচিত্তের মত ক্ষুদ্রকে বৃহৎ জ্ঞানে আত্মহারা হই
আপনহারা হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন দিব না, যাহা পাইব, তাহার
মূল্য দিতে কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করিব না।

বর্ত্তমান রাজশক্তি বিধাতারই হস্তস্বরূপ আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব
ভেছে, সে কর্ত্তৃত্ব অনন্ত কালের জন্য আমাদের হীন ও দুর্ব্বল

মিশিবার জন্য নহে, ইহার ভিতর থাকিয়াই আমাদের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে, ইতিমধ্যে অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, আমরা রাজশক্তিরই সহায়তা করিব, কেননা ইহাতে আমাদের মুক্তির পথই সুরক্ষিত হইয়া উঠিবে।

শ্রেয়ে স্থির বুদ্ধি এবং শীতল মস্তিষ্ক লইয়া বাংলার নূতন জাতিকে বিশ্ব-প্রতিফলের নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে বলি। জাতি সিডোনিয়ার চলিয়া আসিয়া সাহায্য করিবার জন্য স্বপ্নাবির্ভূত পুরুষ যেমন জাতিন্টপলকে ডাকিয়াছিলেন, তেমনি নানাজনে আহ্বান করিলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ অন্তরদর্শী ভারতের ভাগ্যদেবতা অকালে তপোভঙ্গ করিবেন না, ধীরচিত্তে আপন সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার জন্য তপঃসিদ্ধ অধ্যাত্মপথ নির্ম্মাণ করিবার গুরুভার তোমাদেরই উপরে, হে নবীন জাতি, তুলি বিলম্বিত কালকে তপঃসহায়ে তোমরা কি ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে না?

মন্ত্র-শক্তি

শক্তির খেলা কখনও নিষ্ফল হইবার নহে, সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দি
ভগবানের মঙ্গলবিধানই জয়ী হইয়া চলিয়াছে, দৃশ্যমান জগৎতরঙ্গ
পিছনে অদৃশ্যশক্তির কল্যাণময় হস্ত লক্ষ্য করিয়া করিয়া যিনি চলিয়াছে
তাঁহার জীবনে ব্যর্থতা নাই। শক্তির গতি সকল সময়ে নিরূপণ ক
যায় না, ক্রীড়াভঙ্গী বিচিত্র, কোন্ ঘটনা কোন্ পথে কোন্ লক্ষ্যমুখে ছুটিয়
তাহা অবধারণ করা মানুষের অধিকারবহির্ভূত, আজ যাহাকে অমঙ্গল ব
ধারণা করিতেছি, কাল তাহারই ভিতর হইতে কি শুভ সূচনা দৃষ্টিগো
হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? মানুষ নিরুপায় হইয়া ই
অনিচ্ছায় এক মহামঙ্গলকে অনুগমন করিয়াই অগ্রসর হইতেছে, যেদি
এই সত্যজ্ঞান জীবন্ত হইয়া তাহার সমখানি অধিকৃত করিয়া লয়, সেই দি
তাহার নবজীবনের সূত্রপাত, সচ্চিদানন্দের পুলকহিল্লোলে ভাসাইয়া ম
শক্তি স্বহস্তে অঙ্গুলিধারণপূর্ব্বক তাঁহার চিহ্নিত সন্তানকে অনন্তের প
পরিচালিত করেন, সাধক তখন ভগবানের যন্ত্র মাত্র, কালী স্বয়ং তাঁহার
জন্য সকল সাধনা, সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন।

* * *

এই অপূর্ব্ব তত্ত্বটুকু উপলব্ধি করিবার জন্যই সাধনা। ভিতরে সিদ্ধ
প্রতিভা কুণ্ডলিত, উৎসর্গমন্ত্রের আঘাতে এই সুপ্ত প্রজ্ঞাশক্তি উদ্বুদ্ধ হই
উঠিলে, নবভাবের দ্যোতনায় হৃদয় ভরিয়া যায়, প্রাণ পুলকোচ্ছ্বাসে
করিয়া উঠে, বাহ্যশরীরপর্য্যন্ত সেই প্রজ্ঞার আলোকরেখা অনুস
করিয়া যন্ত্র-পুত্তলিকার মত ধরাপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করে। এই চরম আন
যজ্ঞ একদিনেই সুসিদ্ধ হয় না, সাধক ভগবানের বিকাশোপযো
পূর্ণসামর্থ্য একদিনেই আয়ত্ত করে না, চাই অসাধারণ ধৃতি, অবিচ্ছে
সঙ্কল্প, অটুট বিশ্বাস, এই সকল তপঃসম্পৎ জীবনে পরিস্ফুট হইলে
বুঝিতে হইবে, মহাশক্তি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, এই সূক্ষ্ম অধ্যাত্মগুণগু
অপূর্ব্ব আলোকে মানবহৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, এইগুলি ভগবানে

অগ্রদূত, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বরাগ।

* * *

ভগবান্ উপর হইতে অলক্ষ্য হস্তে আকর্ষণ না করিলে, জীবের আকুলতা উদ্বেলিত হয় না। জীবের ধর্ম্মতৃষ্ণা গৌণ উপলক্ষ মাত্র, মূলতত্ত্ব ভগবানের করুণা; ভগবানের টান যাহার জীবনে অনুভূত হয় নাই, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনভজন সমস্তই নিষ্ফল; ভাগবত কৃপা সকলের জন্যই অবারিত, দেবতার চরণস্পর্শে ব্রহ্মা হইতে কীটানু পর্য্যন্ত সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু ভিতর হইতে অন্তরাত্মার সূক্ষ্ম সম্মতিপত্র না পাইলে ভগবানের করুণাবন্যাও জীবহৃদয় হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, উপর হইতে তাঁহার নিবিড় আকর্ষণ মানুষের আকুল পিপাসার সহিত সংযুক্ত হইয়া যতক্ষণ না শুভযোগের সূচনা করিয়া তুলিতেছে, ততক্ষণ মানুষের দীক্ষা হয় নাই। দীক্ষা প্রথম ভাগবতস্পর্শ মাত্র, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্পর্শানুভব ব্যতীত নিগূঢ় সাধনরহস্যে কাহারও প্রবেশাধিকার কোনকালে সম্ভবপর নয়।

* * *

ভাবের অমর বীর্য্য, মন্ত্রের শক্তি অপরিসীম। অধ্যাত্মশক্তি জীবনে আত্মপ্রকাশ করে একটা কিছু উপলক্ষ, একটা কিছু উপকরণ অবলম্বন করিয়া—মন্ত্র এরূপ একটা সূক্ষ্ম আশ্রয়, মন্ত্র ব্রহ্মণ্যশক্তির বিদ্যুৎ-যন্ত্র, মন্ত্র অধ্যাত্মরহস্যের বীজকোষ, দীক্ষিত সাধকের অন্তরে মন্ত্রশক্তিই অব্যর্থ ক্রমে সমস্ত বিশ্বরহস্য উন্মুক্ত করে। প্রাণের উদ্দাম সাধনা মনের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বিজ্ঞানময় স্তরে উন্নীত করিবার জন্য বাংলার গুরুশক্তি আজ জাতির হৃদয়ে নবভাবের বীজমন্ত্র বপন করিয়াছেন, জ্ঞানের, প্রেমের, শক্তির দিব্যস্পর্শে দীপ্তচরিত্র নবজাতি আজ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে যে তপোমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে, অচিরে তাহার তরঙ্গহিল্লোল সারা বাংলা পরিব্যাপ্ত করিবে, সাধকের বিশ্বাস অগ্নিময় অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিবে, দেশের কলুষপূর্ণ বায়ুমণ্ডল দেখিতে দেখিতে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে। শব্দশক্তির সীমা কোথায়, একটী একটী ভাবপূত মহামন্ত্র দূর দূরান্তরে বিক্ষুব্ধ হইয়া জাতির জীবনে কি বিলোড়ন উপস্থিত করিবে, আজ তাহা কবিকল্পনারও দুরধিগম্য, মন্ত্রশক্তি হিল্লোলে হিল্লোলে চক্রায়ত হইয়া মানুষের অন্তর্জ্জগতে যে বিপুল গতিবিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে, তাহার ফলে জাতীয়চিন্তার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, আজ যে অপরূপ অস্ত্রে সন্নদ্ধ করিয়া বিধাতা

বাঙ্গালীকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহা মর্ত্ত্যের কোনও স্থূলউপাদানবিরচিত নহে, তাহা দিব্য, দীপ্ত, নির্ম্মল, কল্যাণপূত, দক্ষ সৈনিকের মত সিদ্ধহস্তে এই ক্ষুরধার অধ্যাত্ম আয়ুধ ধারণ করিয়া পাপ ও কলুষের বিরুদ্ধে পুণ্য ও প্রেমের সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে, ইহা অধ্যাত্ম সংগ্রাম, অন্তঃশক্তির বলই আমাদের বল, বাঙ্গালী আজ মঙ্গলসাধনাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

* * *

কর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু প্রাণশক্তি অমর অক্ষয়। ভাবই প্রাণ-শক্তিকে প্রেরণা দান করে। অশুদ্ধ ভাবশক্তি প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যে উৎকট বিকর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল, কঠোর দুঃখসাধনায় বাঙ্গালী আজ তাহার ক্ষয় করিয়াছে, উপরের সত্যপ্রেরণা সম্পন্ন করিতে গিয়া ভ্রান্তবুদ্ধির ছায়াপাতে বাঙ্গালী তাহাকে মলিন বিকৃত করিয়াছিল, মানবজাতির জন্য যে বিপুল তপোযজ্ঞ, এইরূপে অহঙ্কারের রুদ্র নৃত্যে তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতার মঙ্গলহস্ত সকল অশুভ মন্থন করিয়া শুভ ও কল্যাণকেই স্পষ্টতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে, আজ তপঃশুদ্ধ নবভাবের স্পর্শে সারা বাংলার কর্ম্ম-স্রোত আমূল রূপান্তর পরিগ্রহ করিবে, বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অচিন্ত্যক্রমে আজ যে নূতন শক্তি আপনার পাদপীঠ রচনা করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ হইয়া বাঙ্গালী নবচরিত্রলাভে কৃতার্থ হইবে।

* * *

ভাবশুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। বিধাতার কঠোর বিধানচক্রের মধ্য দিয়া আসিয়া বাঙ্গালী আজ একটা সিদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে, অজানা মহাশক্তির উপরে অখণ্ড প্রত্যয় স্থাপন করা বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে আজ শ্বাসপ্রশ্বাসের মত সম্পূর্ণ সহজসিদ্ধ। ভগবৎ-শক্তির অব্যর্থ নির্দ্দেশে প্রাণের তরঙ্গলীলা সমস্ত প্রতিরুদ্ধ হইলেও, জীবনভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এই গতিরোধ অনিবার্য্য হইয়াছিল, ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত চিরদিনের জন্য নহে, আজ সমস্ত কুহেলিকাচ্ছায়া বিদীর্ণ করিয়া শুভ ও শুদ্ধ প্রেরণা ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, শক্তির অঙ্গুলিহেলন ব্যতীত বাঙ্গালী আজ একটী পদক্ষেপ পর্য্যন্ত করিবে না, শক্তিসাধনাই সংকে, ব্রহ্মকে, জাতির অন্তরে প্রবুদ্ধ করিবার পন্থা খুলিয়া দিবে, শক্তি স্বয়ং সাধিকা, মন্ত্রদীক্ষিত সাধক অবিচল ধৃতিসহকারে শক্তির ক্রীড়া পরিদর্শন করিতে করিতে দেখিবেন,

নূতন প্রেরণা ক্ষিপ্রবেগে বাংলায় এক সম্পূর্ণ নূতন কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে, স্বর্গচ্যুত দেবশিশুর নিবাসোপযোগী করিয়া মর্ত্ত্যের এই মরুক্ষেত্রেই অপূর্ব্ব স্বর্গোদ্যান বিরচিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্তর্ভাব তপঃশুদ্ধ হইলেই, বাঙ্গালীর অন্তরে বাহিরে দিব্যশক্তিরাজি থরে থরে প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে, ইহা অবধারিত।

* * *

এই অন্তঃশুদ্ধির জন্যই মন্ত্রস্পর্শ প্রয়োজন। আপনার উপর আস্থা হারাইয়াই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভগ্নবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে অন্তরেই শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে, শক্তিমন্ত্রের সাধনায় হতবীর্য্য জাতি অন্তঃস্থিত ব্রহ্মণ্যশক্তির উপর দৃঢ় নির্ভরশীল হইবে, হীন অধম বলিয়া যে আত্মলাঞ্ছনা, তাহা একেবারে নির্ম্মূল হউক, ঘটে ঘটে ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা ঘটাইয়া তোল, ভাগবত শক্তির সহায়ে সংসারকে রূপে রসে পুলকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ কর, ইহারই জন্য একটী অমিত-অন্তর্বলসম্পন্ন সমষ্টিশক্তির প্রয়োজন, প্রেমের অবিনশ্বর সূত্রে বিচ্ছিন্ন অহং-বিন্দুগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াই এই কেন্দ্র দেবচক্র গড়িয়া উঠিবে, সত্যের, প্রেমের, কর্ম্মের মঙ্গলপ্রদীপ হস্তে ধারণ করিয়া এই মন্ত্রপূত সমষ্টি মানবজাতির পুরোভাগে অগ্রসর হইবে, ইহারাই আপনার তপস্যা দিয়া সকল জাতির জন্য দক্ষিণ পথ মুক্ত করিয়া দিবে।

অহং ব্রহ্ম

ভগবান্ যদি আগে শরীর নির্ম্মাণ ক'রে, তারপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন, তা হ'লে বাহিরের দিক্ থেকেই অধ্যাত্মজগৎ ব'লে কিছু থাকিলে সেখানে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে। আর যদি এমন কোন রহস্য স্বীকার করা যায়, যে একেবারেই শূন্য হ'তে এই সব নেমে এসেছে, তা হ'লে আমাদের শূন্য হাতে শূন্য হ'য়েই ফিরে আস্‌তে হবে, তাতে জগতের না কোনও ব্যাখ্যা সিদ্ধ হবে, না জীবনখানি আনন্দে পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।

ভারতের সাধনা এই শূন্যবাদ থেকে আরম্ভ। শূন্যে পরিণত হবার জন্য নয়, শূন্যকে বিশ্লেষণ ক'রে সৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার জন্য।

কথাটা উদ্ভট বটে। শূন্যকে আবার বিচার বিশ্লেষণ করা যায় কি প্রকারে? শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল জাতিকেই এই রকম করে' আস্‌তে হয়েছে। বাইবেলে ভগবান্ আদেশ করলেন, "আলো হউক", তখনি আলোর রেখা ফুটে উঠ্‌লো, এই রকম সাতদিন ধ'রে বিপুল রচনা থরে থরে সাজিয়ে জিরেন্ নিলেন। এমন আজ্‌গুবি ম্যাজিক হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তকে নেই।

হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্ব খুবই বৈজ্ঞানিক। সৃষ্টির পঞ্চ উপাদান, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই তাঁরা নির্ণয় ক'রে গেছেন। যা আছে তা মন দিয়ে আঁকড়ে পাওয়া যায় না, কাজেই আরও কিছুর সাহায্য নিতে হবে।

মনের দৌড় ঐ শূন্য পর্য্যন্ত। আরও কিছু দূর না হয় যাওয়া যায়, মায়াবাদের লৌহকপাটে মাথা ঠুকে ব'সে প'ড়তে হয়, আর এগোবার উপায় নেই। মন দিয়ে ভগবান্‌কে পেতে হ'লে অনেক রহস্য বোধ হয় বটে, কিন্তু সত্যকে নিখুঁত ক'রে পাওয়া যায় না, কেননা মন ছড়ালে বাড়ে বটে, কিন্তু তার স্বভাব—ছড়িয়ে থাকা নয়, টেনে টেনে যতদিন রাখা যায়।

মনের চেয়ে কি আমাদের বড় জিনিষ আছে, তার সন্ধান জানা নেই,

এমন অবস্থায় এ সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে দূরে থাকাই ভাল, কিন্তু মানুষের মনে তো তৃপ্তি নেই, কি যেন তার মনে ছাপ্ দিয়ে গেছে, তার সন্ধান তাকে পেতেই হবে, অথচ তার যোগ্যতাও নেই, মানুষ এই বিষম সমস্যায় প'ড়ে, নানা ধর্ম্ম, শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে; সত্যের সন্ধান এখনও ক'রে উঠ্‌তে পারে নাই।

বাহিরের দিক্ থেকেই ভিতরে প্রবেশ কর, আর ভিতর থেকেই বাহিরে ফিরে এস, মনে গিয়ে ঠেক্‌বে, না হয় মন থেকে শরীরে এসে পৌঁছিবে, এ'রই মধ্যে যা কিছু রহস্য, ফেনিয়ে ফেনিয়ে লেখ আর বল, মানুষের ইহার অধিক জান্‌বার সামর্থ্য নেই।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা না হ'লেও, মনের অতীত একটা অবস্থা আমরা অনুভব ক'র্‌তে পারি। দর্পণে প্রতিবিম্বের মত, মাঝে মাঝে কি একটা অজানা, মনের জগতে নেমে আসে, মন দিয়ে তার সবখানি ধ'র্‌তে না পার্‌লেও, যতখানি ধরা যায় তার সবটুকুকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেটুকু সত্য তা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, আর যা মিথ্যায় পরিণত হয়, তা কল্পনা স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিই।

যা আছে, তার উপর মনের কর্তৃত্ব, তখনই ভ্রম ব'লে অবধারণ হয়, যখন অভাবনীয় কিছু ঘ'টে উঠে। অচিন্ত্য কিছু কোথা হ'তে আসে? মনের বাহিরে যে জগৎ তার ঐশ্বর্য্য না জানি কত বৃহৎ, কত বিপুল, নিত্য নব নব সৃষ্টি, কত রূপ ধ'রে প্রকাশ হচ্ছে তার আর অন্ত নেই, শেষ নেই, অনুসন্ধিৎসু মন এই অসীমের সন্ধান আজও ক'র্‌তে পারে নাই।

মনের এই অনুসন্ধানপ্রচেষ্টা, কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। সে দেখে, স্থির হ'য়ে ব'সে থাকাই তার ধর্ম্ম, ইতস্ততঃ বিচরণ তার পক্ষে লাভজনক নহে, চাঞ্চল্যে অনেক তত্ত্ব পাশ্ কাটিয়ে চ'লে যায়, সবখানি আয়ত্ত করার পক্ষে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিশেষ বিঘ্নজনক।

স্থির মন অনেক কিছু অবধারণ করে। অজানার আনাগোনা এই মনের পথ দিয়েই হ'য়ে থাকে। বাহিরে যা কিছু প্রকাশ, তার সবটুকু মনের ভিতর দিয়েই হয়, অপ্রকাশকে জান্‌বার জন্য মনের দৌড়াদৌড়ি অস্বাভাবিক, মন যদি হয় নিশ্চেষ্ট, শান্ত, সমাহিত, তবে অজানাই জানা হ'য়ে বেরিয়ে আসে, তাঁকে জান্‌বার জন্য কোন চেষ্টাই ক'র্‌তে হয় না।

মনের বুকে অসীমের পদচিহ্ন অনন্ত অক্ষরে লেখা হ'য়ে যাচ্ছে, যত ভরে' যাচ্ছে, ততই মনের প্রসার হচ্ছে, সুন্দর ঐশ্বর্য্যময় হ'য়ে অনন্তকে আলিঙ্গন ক'র্‌ছে, মনের নিত্য ব্যাপ্তিই তার সার্থকতা, মন দিয়েই ভগবান্ ছড়িয়ে পড়েন, আবার মন দিয়েই তিনি আপনাকে গুটিয়ে লয়েন, মন পথ বিশেষ, ইহা কোন বিশেষ সত্তা নহে।

সত্তা যিনি, তিনিই ঈশ্বর। তিনি আছেন, নিত্য প্রকাশ হচ্ছেন মাত্র। বীজের মধ্যে বৃক্ষের রূপ যেমন নিহিত থাকে, তদ্রূপ যা হবেন সবই এই সত্তার মধ্যে অবস্থিত। যা আছেন, যা হয়েছেন, যা হবেন, সবই আত্মবিধৃত। আপনার ঐশ্বর্য্যেই আপনি সজ্জিত। বাহিরের অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার উপর ইঁহার হওয়া নির্ভর করে না।

অনন্ত হওয়াকে বুকে ক'রে কূটস্থ ভগবান্ সৎরূপে প্রতিভাত। মনের অনধিগম্য, তাই তাঁর নিত্য প্রকাশ মায়া বলে' অনুভূত। পরন্তু মায়া কোন দ্বিতীয় পদার্থ নহে, একই সত্তা অনাদিকাল ধ'রে প্রকাশমান। তিনি আছেন, তাই তিনি সৎ, তিনি প্রকাশ হয়েছেন, হচ্ছেন, তাঁই চিৎ-শক্তি এবং হওয়াতেই তাঁর আনন্দ, তাই তিনি সচ্চিদানন্দময়।

ব্রহ্ম, শক্তি এবং জগৎ এই তিনিই অভিন্ন। ভিন্ন বোধ মনের অক্ষমতা, মনমাত্র সহায় ক'রে যাঁরা সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাঁদের ভাগ্যে ভগবান্‌কে হয় কিছু নয় ব'লে ফিরে আস্‌তে হয়, নয় সকল বাঁধনের পারে তিনি বিরাজ করেন, এই জ্ঞানে বাঁধন ছিঁড়ে জগৎকে মায়া বলে' উপেক্ষা করতে হয়, আমরা মন দিয়ে মনকেই জান্‌তে পারি, জগতের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে জগৎই জানা যায়, ভগবান্‌কে জান্‌তে হ'লে পেতে হ'লে ভগবান্ দিয়ে জান্‌তে হবে পেতে হবে, মানুষের চেষ্টা কোন দিনই সত্যকে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌বে না, বরং সত্যের পথে বহুল বিঘ্ন উপস্থিত ক'র্‌বে।

উৎসর্গমন্ত্রের সাধক জানে, বিশ্বাস করে, সাধক সে নহে, স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ আপনার সত্তা দিয়েই বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করেছেন, আপনার চৈতন্য দিয়েই তা অবগত আছেন, সৃষ্টির স্তরে স্তরে সেই জ্ঞানকেই প্রবাহিত কর্‌বেন, তিনি, তাঁর শক্তি এবং তাঁর আনন্দ যুগপৎ উচ্ছ্বসিত যেখানে, সেইখানেই জ্ঞানপ্রকাশ; এমন যুগ আস্‌ছে প্রতি রক্ত-কণাও আত্মচৈতন্যে বিভোর হবে, আনন্দের প্রকাশস্বরূপ, স্থাবর জঙ্গম

পৃথিবী জাগ্রতে সমাধির আনন্দ উপভোগ ক'র্‌বে।

সে যুগের এখনও ঢের বিলম্ব আছে। বিজ্ঞান যেমন স্থূল যন্ত্রাদি পরিহার ক'রে দিন দিন সূক্ষ্মতর যন্ত্রাদির সাহায্যে পার্থিব কর্ম্মসকল সম্পাদনে তৎপর, তদ্রূপ স্থূল জগতের সূক্ষ্মানুভূতি একদিন বর্ত্তমান পৃথিবীর বহির্বিজ্ঞানকেও চমকিত ক'রে দেবে; তবে প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নহে, বিজ্ঞানও বড় কম অগ্রসর হচ্ছে না।

একটানা ব্রহ্মস্থিতির মধ্যেও যে বস্তুস্বাতন্ত্র্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা খণ্ড-দৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়, ভ্রান্তি নয়। অনন্ত জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন বোধে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, প্রত্যেকটীর মধ্যে অনন্ত জ্ঞানকে উপলব্ধি কর্‌বার জন্য। সচ্চিদানন্দের সাগর, প্রতি বারিবিন্দুর মধ্যেও অনন্ত জ্ঞান শক্তি আনন্দের অবস্থিতি সমান ভাবেই বিরাজ কর্‌ছে, তরঙ্গে তরঙ্গে তা জানা ও ভোগ করা তাঁর লীলা মাত্র।

এই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে জীবন দিয়ে উপভোগ ক'র্‌বার জন্য কেবল কতকগুলি বাক্য কণ্ঠস্থ ক'রে রাখ্‌লেই চল্‌বে না, তপস্যা কর্‌তে হবে, আর সেই তপস্যা মানুষের মন দিয়ে হবে না, ভগবান্‌কে দিয়েই হবে; সুপ্ত ভগবান্‌কে জাগিয়ে তুল্‌তে হ'লে, সাধনার প্রথমেই অহং-জ্ঞানকে দূরীভূত করা চাই, আমি সাধনা কর্‌ছি, আমি ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বো, আমার তপঃপ্রভাবে তিনি আবির্ভূত হবেন, এই মিথ্যা জ্ঞানকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হবে, ভারতের তপোমন্ত্র এই অহঙ্কারের কুহকে শক্তিহীন। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর এইরূপ কঠোর তপস্যা যে নিরর্থক হয়েছে এমন বলা যায় না, ব্যর্থতাও ভগবানের সত্য পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেয়। এতদিন ধরে' ভগবান্‌কে দূরে রেখে, আমরা আপনাকে এত বড় ক'রে তুলেছি, যে আজ আমাদের মধ্যেই অনন্ত ভগবান্ বিরাজ কর্‌ছেন, এ কথাটা অসঙ্গত ব'লে বোধ হচ্ছে না, জীবনের মধ্যে তাঁর বিভূতি সুপ্ত কুণ্ডলিত, এই দৃঢ়বিশ্বাসের মহিমায় আমাদের সবখানি আজ উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল, তাই নূতন সাধকদিগের কণ্ঠে "অহং ব্রহ্ম" মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে দেখে, আমরা আশায় ও উৎসাহে আত্মহারা হয়েছি।

বাঙ্গালীর জীবনে ভগবানের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙ্গালী আপনার মধ্যে ভগবানের স্পর্শ অনুভব করেছে; বাঙ্গালী দিন দিন বুঝ্‌ছে, দেহ, প্রাণ, মন ছাড়া অন্য এক নূতন শক্তি তাদের সবটাকে

নাড়া দিয়ে নূতন ক'রে তুল্‌ছে, বাঙ্গালীর তপস্যা ভাগবতশক্তিকর্ত্তৃক সংসিদ্ধ হবে, হচ্ছে, এমন আশা, এমন অনুভূতিও কেউ কেউ লাভ কর্‌ছেন, সুতরাং নূতন সাধনা যে বাংলাদেশকে ছেয়ে ফেল্‌বে, এ বিষয়ে আর আমাদের কোনই সন্দেহ নেই।

ধর্ম্ম জগৎকে উন্নত ক'রে তোলে, আবার ধর্ম্মই জগতের অধোগতির কারণ হয়, বাঙ্গালীর সাধনা এতদিন ধ'রে তাদের হীন ক'রে দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছিল, বাঙালীর জীবনমন্ত্র ছিল না, ছিল মরণের অন্ধ মন্ত্র, আজ সহসা অন্তরস্থিত আত্মা হুঙ্কার দিয়া সাড়া দিল, সে অমর, সে অনন্তশক্তিশালী! সে ভীমরব কেবল যে একজন, দুইজন, দশজন বাঙালীর হৃদয় মন আলোড়িত করেছে এমন নয়, শত সহস্র লক্ষ বাঙালীর কর্ণে ধ্বনিত হয়েছে, "অহং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্ম", ভগবানের প্রতীকস্বরূপ বাংলার নূতন জাতি মর্ত্ত্যসৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদন কর্‌বে; ভগবানের আনন্দময় ইচ্ছা সর্ব্বাগ্রে বাঙালীর জীবন দিয়ে প্রতিফলিত হবে—বাঙালী আর মর্‌বে না, বাঙালী অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

হিন্দু ধর্ম্ম

ভীষ্মের ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম, শঙ্করের ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম—হিন্দু ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মুক্ত জীবনগতিকে গুটাইয়া গুটাইয়া ক্ষুদ্র করিয়া দেয়, তাহা একেবারেই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্ম শরীরপোষণের খাদ্যাখাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না, সামাজিক আচার আচরণের রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করে না, তিথি নক্ষত্র বাছিয়া ঘরের বাহির হইতে উপদেশ দেয় না, এইগুলি মানুষের রচনা, অসংখ্য বন্ধনের সৃষ্টি ধর্ম্মের সত্য স্পর্শে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, হিন্দুধর্ম্মে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেয়, এই উপায়, হবিষ্যান্ন ভোজনে, নিত্য গঙ্গাস্নানে, হরিনামের মালায়, তিলক নামাবলী ধারণে মিলে না, আপনার মধ্যে ইহার অন্বেষণ করিতে হয়, আপনাকে জানিবার ও পাইবার পথই ধর্ম্ম, এই হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দুস্থানকে অতিক্রম করিয়া সারা পৃথিবীজয়ে ছুটিয়াছে, আচারবদ্ধ ধর্ম্মের গোঁড়া সাজিয়া হরি হরি বলিলে ধর্ম্মলাভ হইবে না, কূপমণ্ডুকের আস্ফালন সঙ্কীর্ণ কূপোদকেই শোভা পায়, অসীম বারিধিবক্ষে সে অচেতন হইয়া পড়ে।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন "No food or drink can taint that noble self, which knows itself". ইহা খাইতে নাই, উহা পান করিতে নাই, এইরূপ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলিলেই কি আত্মদর্শন সম্ভব হইবে? এই সকল অনুশাসনের বিশেষ কোনই মূল্য নাই। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে যাঁহারা অস্ত্র চালাইয়া আসিলেন, তাঁহারা যদি এইরূপ ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হয়তো আরব্য উপসাগর অতিক্রম করিতে হইত না, নাক মুখ টিপিয়া আর কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিলেও প্রাণবায়ু এডেনে গিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত। বাহিরের আচরণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে, আপনার অন্তর অন্বেষণ করিতে হইবে, তা সে যেমন করিয়াই হউক।

ধর্ম্মসাধনা ক্রিয়াবহুল নহে, শাস্ত্রবচনসর্ব্বস্ব নহে, আচার অনুশাসন মাত্র নহে, ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে, জ্ঞান ও ভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য যাহাই কর না কেন, তাহাই ক্রিয়া। শাস্ত্র ভগবানের বাণী, আমাদের অন্তঃকরণের পাতা উল্টাইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, উহা কর্ম্মকেই নিয়মিত করে, আর আচার আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলে, আমাদের আধারকে উপযোগী করিয়া ধরে, ভগবানের অজস্র প্রেম অবধারণের জন্য। ক্রিয়া, শাস্ত্র, আচার সাধনার উৎকৃষ্ট অবলম্বন, যদি ঐগুলি যথার্থ প্রয়োজন সাধনে ব্যবহৃত হয়, নতুবা বন্ধনের উপর বন্ধনেরই সৃষ্টি করে।

আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধন দূরের কথা, ক্রিয়া লইয়াই মানুষ উন্মত্ত হয়, কাহার জপসংখ্যা কত অধিক হইল, কে কত খানি সময় শ্বাসবন্ধ করিয়া স্থির থাকিতে পারে, তিথি অনুযায়ী কে ঠিক ঠিক ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, এবম্বিধ নানাবিধ ক্রিয়াবাহুল্যই যেন ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টি নাই, শাস্ত্রবচন ভূরি ভূরি উদ্ধৃত করিতে পারিলেই অনেকের মনস্তুটি জন্মে, আর আচার সে রন্ধনশালা হইতে শয়নগৃহ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে, সেই সকলের যোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া দিন গুণিয়া যাইতে পারিলেই ধর্ম্মলাভ হয়; হায় রে, মরাজাতির ধর্ম্মও আজ কি কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে!

হিন্দুসমাজে যে সব আচার পদ্ধতি, শাস্ত্র অনুশাসন, ক্রিয়াকর্ম্ম প্রচলিত আছে, এই সকলের আমূল উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কেন না, মানুষের বন্ধন স্থান কাল ও পাত্র ভেদেই ব্যবস্থিত হয়, পরিবর্ত্তনযুগে ঐগুলির আর বিশেষ কোনই মূল্য থাকে না। মানুষ যখন অন্তর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন বাহিরের প্রলোভন হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন হইয়াছিল; আজ আবার অন্তরের মণিকোটায় ছুটিয়াছি, এক্ষণে এই সকল বিপরীত আচার উপদেশ ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রতিপদেই বাধা বলিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্য এখনও যাঁহারা বাহিরের রূপেই আত্মহারা তাঁহাদের পক্ষে সবখানিই মানিয়া চলিতে হইবে। আমরা নূতন যাত্রী যাঁহারা তাঁহাদের আহ্বান করিয়াই বলিতেছি, বাঁধন ছিঁড়িয়া বিঘ্নগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া চল, আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, অন্নের বিচার করিলে চলিবে না, দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে আমাদের বাঁচিতে হইবে, ভাগ্যবলে যখন যাহা মিলে জীবন রক্ষা কর, আর সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য দুইচারিঘণ্টা নাক টিপিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই, অন্তর্দেবতার অবস্থিতি

নিত্য স্মরণ রাখ, শ্বাসে প্রশ্বাসে অমৃত সঞ্চয় করিয়া আধার পরিশুদ্ধ করিয়া তোল, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, বার বার বস্ত্রপরিবর্ত্তনের সময়ও নাই অর্থও নাই, এখন আমাদের জীবন থাকিতে থাকিতে অন্তরপুরুষকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

নূতন সাধকদিগের মনে রাখিতে বলি, আমরা ক্রিয়াহীন নহি, তবে ক্রিয়ার গণ্ডী টানিয়া উহাতে আবদ্ধ হইতে চাহি না; শাস্ত্রবিবর্জ্জিত নহি, ভগবৎজ্ঞানকে চিরজাগ্রত রাখিবার অক্ষয় মন্ত্র অজপা করিয়া রাখিয়াছি; আর আচার, চিত্ত যে আমাদের নির্ম্মল, আত্মা যে নিত্যমুক্ত, এ ধারণা চিরবদ্ধ করিয়া আচারসিদ্ধ হইয়াছি; হিন্দুর জীবনসূত্র ভগবানের সহিত যোগযুক্ত ঘটাইয়া তুলিতে, আমরা ইহার অন্যথা করিব না।

তারপর হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। নদী যখন মজিয়া যায়, তখন মাঝে মাঝে রুদ্ধজল জমিয়া থাকে, নবস্রোত প্রবাহিত হইলে আবার সব এক হইয়া যায়, হিন্দুধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না, হিন্দু ভগবান্‌কে আত্মজীবনে উপলব্ধি করিতে চায়, ইহার জন্যই তাহার তপস্যা, জগতের মানবজাতি মাত্রেই ইহাই প্রার্থনা করে। দেশ কাল ভেদে আচারের পার্থক্য থাকিতে পারে, শাস্ত্রবচন বিভিন্ন ভাষাগত হইতে পারে, মন্দিরের পরিবর্ত্তে কোথাও মস্‌জিদ্ কোথাও গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে; কিন্তু আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলে ভগবৎ-লাভ ঘটে, এ তত্ত্বে অনাস্থা করিতে কেহই পারিবে না, হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র বেদে, উপনিষদে, গীতায়; জগতের কোন্ জাতি ভারতের সে সনাতন পদ্ধতি উপেক্ষা করিবে? এক ধর্ম্মে অনন্তকোটী মানবের দীক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই সম্ভব হইবে, নামভেদে ভাষাভেদে, আচারক্রিয়াভেদে, হিন্দুর সমদৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে না, খোদা বলিলে, গড্ বলিলে, জিহোবা বলিলে, হিন্দুর হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, ধর্ম্মের সীমারেখা নাই, অশুদ্ধ রজঃ তমঃ অধিকারে ভারতের হিন্দুজাতি আত্মদৃষ্টিহীন, তপঃপ্রভাবে যেদিন তাহাদের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেইদিনই দেখিবে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী বিজয়পতাকা হিমালয়শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবার সকল সম্ভাবনীয়তা তাহাদেরই আছে, অধ্যাত্মসাধনায় জগতের সকল জাতির অপেক্ষা তাহারাই সমধিক অগ্রসর হইয়াছে।

হিন্দুজীবনে সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়াছে, তপঃসাধনার যথেষ্ট অনুশীলনের

অভাবে। সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়গত খণ্ড সাধন সহায়ে, যে ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহারই আলোকে তাহারা যতটুকু দেখিতে পায়, তাহাই ধর্ম্মের সবখানি বলিয়া অনুমিত হয়, কাজেই সাধক আপনাপন ইষ্টদেবকেই জগৎপূজ্য এবং ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই এইরূপ প্রচার করিয়া বসে, এইরূপ তুলনামূলক ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক ভাবই অধিক মাত্রায় জাগিয়া উঠে, যথার্থ জ্ঞানপ্রকাশে এই ভুল ধরা পড়িয়া যায়, ভগবানের অনন্ত গুণ সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান ভাবেই অবস্থিত দেখিয়া সিদ্ধযোগী সকল মতই পথ, সকল দেবতাই শ্রেষ্ঠ, বলিয়া প্রচার করেন,—আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃতময় কণ্ঠের এই অমর-বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের জাগরণযুগে ঠাকুরকেই অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপকতা ইহাতে অবরুদ্ধ হইতে পারে। ঠাকুরকে লইয়া সম্প্রদায়সৃষ্টি আমাদের মারাত্মক ভুল হইবে। তাঁহার উদার মহিমামণ্ডিত জীবনসাধনা সঙ্কীর্ণ ও খণ্ডিত করিয়া, ভারতের গতানুগতিক পন্থানুসারে যদি কোনও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্যসাধনের পথে আমরাই পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইব। ঠাকুরের জীবন—মানবজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, এই অনির্ব্বচনীয় মহান্ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের ক্ষুদ্র মন যদি গণ্ডী কাটিয়া বসে, তবে এ অপমান শুধু তাঁর নয়, বিশ্বশিল্পীরও, সেই পরাৎপর পুরুষের অমর স্পর্শ পাইয়াও, আমরা যদি অহং-ঘোরে হতচেতন হই, তবে ভারতের সুদিন আর কোনও যুগে আসিবে না, ইহা ধ্রুব জানিও।

হিন্দুধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া ঠাকুর আসিয়াছিলেন, জগতের মুক্তিবিধান করিতে; জড়প্রতিমার উপাসনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, এবারকার মুক্তি কেবল চেতন পদার্থের নয়, পঞ্চভূতেরও মুক্তি সাধিত হইবে; রুদ্রের অবতার স্বামীজি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জলদগর্জ্জনে মুক্তিবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন; অপদার্থ জীবন আমাদের, অমর অখণ্ড আত্মাকে বুকে করিয়াও স্ফূর্ত্তিহীন, বীর্য্যহীন, ঘোরসঙ্কীর্ণতাপূর্ণ—প্রকৃতির কঠোর পরিহাস বটে!

ভাঙ্গিয়া ফেল জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী, আত্মাকে বিকশিত হইতে দাও! দেহাত্মবোধ চূর্ণ করিয়া ফেল, নশ্বর দেহ আত্মা নহে। যদি আধার শুদ্ধ শক্তিশালী হয়, যদি আত্মার বিমল পুলকে অলৌকিক শক্তিতে ইহা

সুষমামণ্ডিত হয়, তবে দাঁড়াও বিশ্বের বুকে দৃঢ়পদে—পৃথিবী তোমার পদরেণু মাথায় করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

কিন্তু এ জীবন একেবারেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ আধার পাপপূর্ণ সংস্কারজর্জ্জরিত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর আহরণ করিতে হইবে, এ দেহ দেবশক্তি ধারণে একেবারেই অযোগ্য।

আইস অধ্যাত্মযোগসহায়ে আমরা দেবদেহ গড়িয়া তুলি, দিব্য দেব-জীবন লাভ করিয়া, হিন্দুধর্ম্মে জগৎ মাতাইয়া তুলি, ঠাকুরের অমর ভাব আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে—ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত খর-তর রশ্মি বিকীরণ করিতেছে, এই নব কিরণস্নাত হইয়া, হিন্দু, তুমি জাগিয়া উঠ, মহাশক্তি তোমার সহায় হইবেন।

ঈশোপনিষৎ

মূল

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১

জগতের অন্তর্গত জগৎ, এই যাহা কিছু সকলই, ঈশ্বরের আবাসের জন্য (১)। এইরূপে ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কাহারও ধনে লিপ্সু হইও না।

(১) 'বাস্যম্'—এই শব্দটির তিন প্রকার অর্থ সম্ভব। প্রথম, আচ্ছন্ন হইবার জন্য, পরিব্যাপ্তির জন্য; দ্বিতীয় মতে, পরিচ্ছদরূপে পরিধৃত হইবার জন্য; এবং তৃতীয় অর্থে, অধিবাসের জন্য, বাসভবনস্বরূপ। প্রথম অর্থটিই সাধারণে প্রচলিত অর্থ। শঙ্কর এই অর্থগ্রহণপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, একমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতির দ্বারা এই অবস্তু জগৎপ্রপঞ্চের সংজ্ঞান অবলুপ্ত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যায় এই প্রথম চরণটির অর্থ সমগ্র উপনিষদের মূলভাবের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; ঈশোপনিষদের শিক্ষা—একটা সামঞ্জস্য, ব্রহ্ম ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম্ম ও অন্তর্ম্মুক্তি, এক ও বহু, অখণ্ড সৎ ও সর্ব্বভূত, উদাসীন অপৌরুষেয় পরতত্ত্ব এবং লীলাময় গুণান্বিত ভগবান্, বিদ্যা ও অবিদ্যা, প্রকাশ ও শূন্য, মর্ত্ত্য (ও পারলৌকিক) জীবন এবং পরম অমৃতত্ব—এই সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ তত্ত্বের ভিতরে একটি মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। ঋষির দৃষ্টিতে জগতের চিত্রখানি এইরূপ, যেন উহা অন্তর্দ্দেবতার একখানি পরিচ্ছদ কিম্বা ইহা তাঁহার নিবাস-মন্দির। এই শেষোক্ত অর্থটিই উপনিষদের চিন্তার সমধিক অনুকূল।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

ইহজগতে কর্ম্ম করিয়াই (২) শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করা উচিত। তোমার অন্তরে এইরূপই বিহিত, ইহা হইতে অন্যথা কিছু নহে; কর্ম্ম মানুষে সংলিপ্ত হয় না। (৩)

(২) 'কুর্ব্বন্নেব'—এইস্থানে 'এব' শব্দটি কর্ম্মের উপরেই এই জোর দিতেছে, 'কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াই, উহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নহে,'—ইহাই ভাবার্থ।

(৩) শঙ্কর এই শেষ চরণটিকে এইরূপে পাঠ করিয়াছেন,—'এইরূপেই তোমাতে, অন্যথা নহে—কর্ম্ম মানুষে লিপ্ত হয় না।' আচার্য্য প্রথম চরণোক্ত 'কর্ম্মাণি' বলিতে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বুঝিয়াছেন, যাহার সহায়ে অজ্ঞজন পাপকর্ম্ম ও তৎফল, এই সকলের হস্ত এড়াইয়া স্বর্গ উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় 'কর্ম্ম' শব্দটি তদ্বিপরীত অর্থাৎ অশুভ কর্ম্ম এই অর্থেই লইয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, এই মন্ত্র অজ্ঞানীর জন্য অনুগ্রহবচন মাত্র, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কর্ম্ম ও সংসার পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। ভাষ্যের এই উক্তি এবং অর্থগঠন, সমস্তটুকুই কষ্টকল্পিত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে অর্থ দিয়াছি, আমাদের নিকট মনে হয়, ইহাই সরল ও স্পষ্টার্থ।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

সূর্য্যশূন্য (৪) অন্ধতমসাবৃত যে সব লোক সেইখানেই আত্মঘ্নগণ মরণান্তে গমণ করে।

(৪) অসূর্য্য (সূর্য্যহীন) এবং অসুর্য্য (আসুরিক) এই দুইটী পাঠান্তর পাওয়া যায়। উপনিষদের চিন্তাবয়বে এই তৃতীয়মন্ত্র শেষ চারিটি মন্ত্রোক্ত পরিণত ভাবের সূচনাস্বরূপ। এই মন্ত্রেরই ব্যঞ্জনা শেষভাগে পুনরুত্থাপিত হইয়া পরিপাক লাভ করিয়াছে। সূর্য্যসকাশে প্রার্থনামন্ত্রটি চিন্তাসূত্রে সেই পূর্ব্বপ্রসঙ্গটুকুই স্মৃতিপথে পুনরানয়ন করে, সেই সূর্য্যমণ্ডল ও তদীয় অন্ধতমিস্রার কথা, নবম ও দ্বাদশ শ্লোকে উক্ত বিষয়েরই পুনরায় অবতারণা করিতে হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদেরও সহিত সূর্য্য ও তাহার রশ্মিপুঞ্জের এবং জ্যোতির্ম্ময় ভুবনরাজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাই, জ্যোতির্ম্ময় লোকের যাহা বিপরীত তাহা তমসাবৃত ও সূর্য্যপরিশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক, সুতরাং আসুরিক জগৎসমূহের কথা এখানে উদ্দিষ্ট নহে।

অনেজদেকম্ মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪

এক নিশ্চল, যিনি মন হইতেও সমধিক বেগসম্পন্ন, তাঁহাকে দেবগণও ছুটিয়া ধরিতে অসমর্থ, যেহেতু তিনি চিরপূর্ব্বগত। স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াও ইনি দ্রুতধাবনশীল অন্য সকলকে অতিক্রম করেন। ইঁহারই আশ্রয়ে মাতরিশ্বা (৫) অপ্‌সমূহ বিধৃত করিয়াছেন। (৬)

'মাতরিশ্বন্'—বলিতে 'যিনি মাতা বা আধারের ক্রোড়ে আপনাকে সম্প্রসারণ করেন', ইহাই বুঝায়, সে মাতৃবৎ মূলভূত আকাশতত্ত্বই হউক, অথবা পৃথিবীরূপিণী যে ভূতশক্তি বেদে মাতৃসংজ্ঞায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকেই নির্দ্দেশ করা হউক। বেদে বায়ুদেবতারই একটী নাম মাতরিশ্বা, যিনি প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে জড়ের মধ্যে আত্মসঞ্চারপূর্ব্বক বিচিত্র জড়বস্তুপুঞ্জকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। এখানে সেই ভাগবত প্রাণশক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যিনি সকল প্রকার বিশ্বপ্রক্রিয়ার অধিদেবতাস্বরূপ।

(৬) 'অপঃ'—ইহার শুক্লযজুর্ব্বেদানুগত ধ্বনিটুকু স্বীকার করিলে, 'সলিল সব' এই অর্থই পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে, ভিন্নরূপে উচ্চারণপূর্ব্বক একবচনান্ত 'আপঃ' শব্দ লওয়া যাইতে পারে, তাহার অর্থ ক্রিয়া বা কর্ম্ম। শঙ্কর কিন্তু ইহার বহুবচনান্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া, 'কর্ম্মসমূহ' এই অর্থ করিয়াছেন। শব্দটীর প্রকৃত বৈদিক অর্থটুকু বিস্মৃত হওয়ায় উহা চতুর্থ ভূত যে জল তত্ত্ব তাহারই একটী পর্য্যায়মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফলে এই গোলযোগের উৎপত্তি। উক্ত অর্থ এখানে একেবারেই সঙ্গতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু 'অপঃ', অথবা অন্যত্র যেমন উল্লিখিত, সেই সপ্ত নদী, বা পোষণময়ী সেই সপ্ত ধেনু, উহারা জগতের সপ্ত তত্ত্ব এবং তৎক্রিয়ারই বৈদিক প্রতীক। সেই সপ্তকের মধ্যে তিনটি নিম্নের, অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময়; এবং চারিটি উপরের, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, চিন্ময় ও সত্যময়। এই সপ্তপ্রতিষ্ঠানের ধারণাই, প্রাচীন সপ্তলোকরহস্যের ভিত্তিমূল, একটী একটী ভুবনে একটী একটী বিশেষ তত্ত্ব আপন বিচিত্র সামঞ্জস্যে ক্রিয়াশীল। উপনিষদের উক্ত শব্দটির ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

তিনি চল এবং অচল; তিনিই দূরে আবার সন্নিকটে, তিনি এই সকলের ভিতরে আবার এই সকলের বাহিরেও সেই তিনিই বর্ত্তমান।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মদর্শন করেন, এবং আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে প্রত্যক্ষ করেন, অতঃপর তাঁহার আর কিছু হইতে সঙ্কোচ নাই।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ ক. শোকএকত্বমনুপশ্যত ॥ ৭

যাঁহার অন্তরে আত্মাই সর্ব্বভূতরূপে প্রকাশমান (৭), এই বিশেষ জ্ঞানই যিনি পাইয়াছেন, সেই একত্বদর্শীর পক্ষে মোহ এবং শোক কোথায়?

(৭) 'সর্ব্বাণি ভূতানি'—ইহাদের আক্ষরিক অর্থ, 'যাহা কিছু সমুদ্ভূত হইয়াছে,' স্বপ্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার যাহা বিপরীত। প্রচলিত অর্থে 'সর্ব্বজীব' বুঝাইলেও, এখানে 'ভূতানি অভূৎ' এই প্রয়োগে, 'সর্ব্বভূতরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছেন' এইরূপ শব্দগত বিশেষ অর্থব্যঞ্জনাই স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের অন্তরে সেই পরাজ্ঞান প্রকাশের কথাই এখানে অভিপ্রেত, যাহার উদয়ে তাঁহার অন্তঃস্থিত অখণ্ড আত্মা সর্ব্বভূতে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করেন, এবং এইরূপে তিনি, যে নিগূঢ় যোগপ্রক্রিয়া অবলম্বনে এক বহুরূপে জগৎসংসারে আবির্ভূত, সেই চিরন্তন গোপন সৃষ্টিরহস্যটুকু অন্তর দিয়া উপলব্ধি করেন।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম-
স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎশাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

তিনিই পর্য্যগমন করিয়াছেন,—সেই জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, অস্নায়ু, অব্রণ, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ পুরুষ। সেই কবি, সেই মনীষী (৮); সেই পরিভূরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান, স্বয়ম্ভূ আত্মা, অনাদি শাশ্বতকাল অবধি সর্ব্ববস্তুকে স্ব স্ব স্বভাবানুক্রমে যথাবিধি সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

(৮) বৈদিক চিন্তায় কবি, দ্রষ্টা, এবং মনীষী, চিন্তাশীল, উভয়ের মধ্যে একটা অর্থবিশিষ্টতা সুস্পষ্টরূপে পাই। কবি, ভগবানের সেই বুদ্ধির অতীত দিব্যজ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্টি ও পরম জ্যোতিঃ'র সহায়ে সত্যকে দর্শন করে, বস্তুরাজির স্বরূপতত্ত্ব ও রূপরহস্য নিরূপণ করে, সেই সকলের পরস্পরগত নিত্য সম্বন্ধ অবধারণ করে; মনীষী, সেই শ্রমশীল মানসসত্তা, যাহা খণ্ড-বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া, বস্তুসমষ্টির সম্ভাবনীয়তা মন্থনপূর্ব্বক, নিম্ন দিকে, রূপে, কার্য্যে, বাস্তবপ্রকাশে অবতরণ করে, আবার ঊর্দ্ধমুখে উহাদের মূলস্বরূপ সেই আত্মবিধৃত ব্রহ্মসত্তায় অধিরোহণ করে।

ক্রমশঃ

গান

শুধায়ো না কেহ আমারে
ওগো শুধায়ো না কেহ আমারে।
জানি কি না জানি তারে, জানি শুধু অন্তরে।
ভাষায় বুঝাতে নারি, এঁকে দিতে নাহি পারি,
মানসমন্দিরে সে যে কিবা রূপ মরি মরি!
ও রূপ-সাগরে সদা ডুবিতে বাসনা মম,
জাগিতে চাহি না আর, ভুলে যাই অর্থ কাম,
তাহারই মহিমা যত প্রকাশে সংসারে।
তারই কাজে আছি রত, আর কিছু জানিনা রে॥

("উদ্বোধন" নাটক হইতে উদ্ধৃত।)

"ROYAL CLEMENCY"

রয়েল ক্লেমেন্সি

২০এ জানুয়ারী বঙ্গীয় কংগ্রেশ সভার এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—"Resolved that the council of the Provincial Congress Committee respectfully urges that full and liberal effect be given without delay to the Royal proclamation as to amnesty to political prisoners,internees, deportees and detenues of Bengal and such other persons as are Bengalees, but are suffering outside Bengal similar restraint on their liberty" অর্থাৎ—সঙ্কল্প এই, প্রাদেশিক কংগ্রেশ কমিটি সম্মানপুরঃসর জোর করিয়াই চাহিতেছেন, যে, সম্রাটের করুণাবার্ত্তাকে অবিলম্বে এবং পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করা হউক, বাংলার রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণ, নির্ব্বাসিত ও অবরুদ্ধগণ এবং যাঁহারা বাঙ্গালী হইলেও বাংলার বহির্দ্দেশে উক্তপ্রকার স্বাধীনতাহানির ফলে এক্ষণে ক্লেশভোগ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করুক।

২৩এ ডিসেম্বর রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলে, উহা পাঠ করিয়া, এতদ্বিষয় লইয়া যে আবার আন্দোলন আলোচনা করিতে হইবে, এমন ধারণা আমাদের ছিল না, আমরা নিঃসন্দেহে মনে করিয়াছিলাম, এইবার রাজনীতিঘটিত সকল প্রকার বন্দীই মুক্তি পাইবেন, কিন্তু কার্য্যকালে পূর্ণমাত্রায় আমাদের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, আমাদের ও রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের, উভয়ের দিক হইতেই ইহার সুবিধা ও অন্তরায়ের কারণগুলি বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন হইয়াছে।

দেশের রুদ্ধকণ্ঠে আজ যে বেদনার গান অস্ফুট ও অনুচ্চস্বরে শ্রুত

হইতেছে, যথাসময়ে উহা রাজশক্তির কর্ণগোচর না হইলে প্রতিকারের অভাবে দিন দিন ইহার সুর দেশব্যাপী হইয়া পড়িবে। কর্ত্তব্যের কঠোর অঙ্গুলী-সঙ্কেত অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে বল দান করুন, মনুষ্যত্বের যোগ্য মর্য্যাদা রাখিয়া দেশের কথা উঁচু গলায় যেন আমরা চিরদিন বলিতে পারি।

রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের অসুবিধার কথা আমরা যেটুকু জানিতে ও বুঝিতে পারি তাহা অতি সামান্য, অতএব উহার কথা পরে বলিব, দেশের দিক হইতে আমাদের সমস্ত কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে হইবে।

আমরা সহস্রবার স্বীকার করিয়াছি, বাংলায় বিপ্লবপন্থীর দল বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শত বৎসরের অধিককাল ইংরাজ-গুরুর আসনতলে উপবেশন করিয়া, জগদিতিহাসে স্বাধীনতার উন্মাদিনী কাহিনী পাঠে, পরাধীন জাতির জীবনে এক নূতন আশা নূতন উৎসাহের ঢেউ উঠিয়াছিল, মেকলে প্রমুখ ইংরাজমনীষীগণের মুখেও স্পষ্টাক্ষরে ইহার পক্ষে সহানুভূতিসূচক অনেক মন্তব্য সেই নূতন ভাবের পরিপোষণ করিয়াছে; তাঁহারা সরল ভাষায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে ইংরাজ-শাসন সার্থক করিতে হইলে, ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তেই ন্যস্ত করিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীজাতি যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া উঠিবে, ইহা বড় অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের পর হইতে ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের মুখে এক বিপরীতবাণী বাঙ্গালীজাতির কর্ণগোচর হইল, এমন কি ১৯১৬ সালে বিদায় অভ্যর্থনায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়া গেলেন, ভারতবর্ষে স্বাধিকারলাভের দিন যে কত দূরগত, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না—ভারতের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতার মুখে এতদ্‌সম্বন্ধে কোন আশার বাণী না পাইয়া, দেশ যে কিরূপ ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বঙ্গভঙ্গের পর হইতে রাজশক্তির দিক দিয়া একটাও আশার বিদ্যুৎ জাতির জীবনে মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠে নাই, গভীর নৈরাশ্যে আত্ম-হারা হইয়া তাহারা যে বিপথগামী হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? অভিমান, অনাদরে গর্জ্জিয়া উঠে, আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষায় বাঙ্গালীজাতি বিশেষরূপে পারদর্শী হইয়া উঠিলেও, ইংরাজরাজের নিকট অবজ্ঞাত উপেক্ষিত হইয়া, বিপ্লববাদকেই বরণ করিয়া লইল, ১৯০৫ সাল

হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত যে উৎকট লীলা বাংলার ইতিহাসে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা আর মুছিবার নহে, সুতরাং সে সকল কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আশা ও উৎকট বাসনাভঙ্গে রোষের উৎপত্তি। প্রতিহিংসাই তার অভিব্যক্তি। বাংলার বিপ্লববাদ প্রতিবিধিৎসারই চরম বিকাশ। ইহা পাশ্চাত্যের আরোপিত গুণ, হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক, সুতরাং গাত্রমলার মত ইহা পরিবর্জ্জিত হইল। কাকতালীর মত ইংরাজের কঠোর রাজদণ্ড ও ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের আশাবাণী বাংলার অশান্তি উপদ্রবের পরিসমাপ্তি আনয়ন করিয়াছে, এমন কথা অনেকের মুখেই শুনা যায়, অবশ্য ভাগবত বিধানের কোনটাই বৃথা নয়, সেই দিক দিয়া এই সকলেরও প্রয়োজন স্বীকার না করা ধৃষ্টতা, তবে বাঙ্গালীজাতির অন্তরপরিবর্ত্তনের মুখ্য কারণ তাহাদেরই তপঃশক্তি, এ বিষয় লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি, এক্ষেত্রে তর্কের কথা উত্থাপন করিব না।

সমস্যা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরের ঘটনায় নয়, তা সে রাউলাট আইনই হউক, আর বাংলায় অশান্তি উপদ্রবই হউক। সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছিল, মানুষের মনে। জাতির মনেও বটে, এবং তাহার ছায়া শাসক-জাতির মনেও অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিতেছিল। জাতির যে অংশ অতিষ্ঠ হইয়া, জীবন মরণের খেলায় মত্ত হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের শক্তি অসাধারণ, কেননা যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই তো সবখানি নয়, এক টুক্‌রা মেঘ যে আকাশজোড়া মেঘের রাশি টানিয়া আনে! আমরা এই বিপুল শক্তির সবখানিকে সমুচ্চের পথে মোড় ফিরাইতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইতেছিলাম না; বাহিরের বাধা যতই প্রবল হউক, অন্তরের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, বিরোধী কর্ম্ম ক্ষণেক স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, পরে সুযোগ পাইলে, উহার বেগ চতুর্গুণ হইয়া প্রকাশ পায়। আয়র্লণ্ডের অবস্থা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা চাহিতেছিলাম অন্তরগত পরিবর্ত্তন।

কিন্তু এই অন্তরের পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে, উভয় পক্ষের মধ্যে যে কটু সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে, উহা আমূল ঘুচাইয়া, সম্বন্ধের সত্যরূপটিকে যতখানি পারা যায় প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইবে। রাজশক্তি প্রবল বলিয়া ক্ষতির মাত্রাটা এ দিকেই অধিক জানে, প্রজার জীবন দিয়া তাহার

প্রতিশোধ কামনা যদি চিরজাগ্রত থাকে, তাহা হইলে শাসন চলিতে পারে, পরন্তু শান্তির আশা সুদূরপরাহত হইয়াই থাকিবে। একদিক দিয়া শচীন্দ্রের অপমৃত্যু যেমন মর্ম্মান্তিক, শোচনীয়, উহার আর প্রতিকার নাই, অন্যদিকে তদ্রূপ নিরপরাধা মিস্ কেনেডির নির্ম্মম হত্যা লোমহর্ষণকারী ও বীভৎস, উহারও প্রতিবিধান নাই, এরূপক্ষেত্রে, রাজশক্তির নিকট হইতেই আমরা একটু অনুগ্রহলাভের আশা করিতেছিলাম, কেননা রাজদণ্ড শাসন করিবে ইহা অবধারিত, কিন্তু শাসনেই যে শান্তিস্থাপন হয় এমন কোন কথা নাই। আমরা চাহিতেছি না বিপ্লব অশান্তি উপদ্রব, আমরা চাহিতেছি শান্তি ও মিলন। নবযুগের নূতন আশায় জগতের সকল সভ্যজাতিই যেমন উন্মাদ হইয়াছে, ভারতের এই অতি প্রাচীন জাতিও তদ্রূপ নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ অবস্থায় রাজশক্তিরই সহায়তা চাহিতেছি, রাজানুকূল্য ও বিশ্বাসকেই জাগাইয়া তুলিতে চাহি, আমরাও ইহার যোগ্য প্রতিদান দিব, হিন্দুচরিত্র অকৃতজ্ঞ নহে, অনুদার নহে, একথা এই য়ুরোপের মহাযুদ্ধে সুপ্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং নূতন করিয়া কিছু বলিতে হইবে না।

সৌভাগ্য—আমাদের প্রার্থনার সকল কথাই রাজাজ্ঞায় প্রকাশ পাইয়াছে। ২৩এ ডিসেম্বরে যে উদার সরল রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে—উহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইলে রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা এক হইয়া যাইবে। উভয়ের মন হইতে বিরোধের সকল চিহ্ন মুছিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন বেশে আসিয়া দাঁড়াইবার এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশবাণী স্বয়ং বিধাতাই যেন সম্রাটের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন—তাঁর আশাবাণী সফল করিয়া তুলিবার জন্য রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের দায়িত্বের মাত্রা যত অধিক হউক, আমাদেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না, সম্রাটের ঘোষণা পরিপূর্ণ মাত্রায় দেশবাসীকে ভোগ করিতে হইবে।

এই রাজাজ্ঞা প্রচারের পর হইতে প্রতিদিনই আমরা রাজনীতিক বন্দীগণের মুক্তিসংবাদ পাঠ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুক্তিদানের মাত্রা যেন কোন কৃপণের হস্ত হইতে নিঃসরিত হইতেছে। দানের যে বিপুল পুলক, উহার সচ্ছন্দ প্রবল গতিবেগ দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারিলে যেরূপ সুফল ফলিত, এইরূপ নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া বিন্দু বিন্দু কৃপা বরিষণে সেরূপ সুফল ফলিবে না, হয়তো ধীরে

ধীরে সকল বন্দীই মুক্তি পাইবেন, কিন্তু মুক্তিপ্রদানের প্রথা অন্যরূপ হইলে রাজভক্তির রেখা জনসাধারণের অন্তরে সুচিত্রিত হইয়া থাকিবার অবসর পাইত। অবশ্য একেবারেই সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্ত করিতে হইলে, রাজকর্তৃপক্ষগণের যে বাঁধাধরা পদ্ধতি আছে, তাহা হয়তো মান্য করা চলে না, তবে প্রজাসাধারণের মন প্রিয়জনবিরহে এমনই কাতর হইয়া আছে, যে রাজাজ্ঞাপ্রচারের পর মাসাধিককাল অতিবাহিত হইল, ইহার মধ্যেও তাহাদের প্রিয়জন মুক্ত হইল না, অধীর হইবার কথা নহে কি?

তারপর আজ পর্য্যন্ত যাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তরীণে আটক ছিলেন, ৬ই জানুয়ারী শান্তিপত্রে যদি স্বাক্ষর হইয়া থাকে, তবে ঐদিন হইতে ছয়মাস পরে উঁহারা তো মুক্তি পাইতেনই, চারি পাঁচ বৎসর যাঁহারা দুঃখভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আরও না হয় ছয় মাস আবদ্ধ থাকিতেন, ইঁহাদের মুক্তিতে রাজানুগ্রহের মর্য্যাদা প্রদর্শিত হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, আলিপুরের বোমার মামলার আসামী শ্রীমান্ বারীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিপ্লবপন্থী নেতা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এইরূপ হইলে রাজানুগ্রহ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়। যখন করুণার দান সম্রাটের হৃদয় হইতে উৎসৃত হইয়াছে, তখন এ দান অকাতরে বিতরিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা "অমৃতবাজারের" লেখা দেখিয়া বুঝিলাম—বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে, যাঁহারা ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়িয়াছিলেন, ইঁহাদের মুক্তি দাবী করিবার ন্যায্য অধিকার স্বভাবতঃই আমরা করিতে পারি, কিন্তু "Those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past," তাঁহাদের মুক্তির উপায় কি হইতেছে?

সম্রাটের ঘোষণানুযায়ী রাজনীতিক কোন অপরাধীই আর কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না, অবশ্য যাঁহারা ভবিষ্যতেও রাজবিধি মান্য করিতে অস্বীকৃত হইবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এরূপ বাতুল কয়জন আছে?

আমরা অতঃপর সকল প্রকার রাজনীতিক বন্দীগণেরই মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি—ভবিষ্যতে বিপ্লববাদে যোগদান কেহ করিবেন না, এরূপ স্বীকারোক্তির পক্ষে আমরা ভিন্নমত নহি, কিন্তু শুনিতে পাই, সংবাদপত্রে অথবা

CAL CENTRAL LIBRARY

অন্য কোন সাময়িক পত্রাদিতেও লিখিতে পাইবে না, রাজনীতিক সংশ্রবে যোগদান করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের জন্য অনেককেই বলা হইতেছে, যাঁহারা ইহাতে অসম্মত হইতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি স্থগিত থাকিতেছে, কথাটা সত্য হইলে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখকর কি হইতে পারে? মানুষের প্রতিভাপ্রকাশের পথই হইতেছে সাহিত্য—তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া, গভর্ণমেণ্ট যদি কাহাকেও মুক্তি দিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি যে ইহাতে অস্বীকৃত হইবেন—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, তারপর বৈধী রাজনীতি আলোচনা করিবার শক্তি যদি কাহারও জীবনে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা রুদ্ধ করিবার অধিকার মানুষের নাই, এরূপ অমর্য্যাদাকর আদেশপালনে কোন মানুষই সম্মত হইবেন না; তাহা হইলে ইঁহাদিগকে কি এই রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে?—দেশ-নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্যদৃষ্টি এই দিকে প্রসারিত হইলে আমরা সুখী হইব।

এইবার সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার পথে, রাজকর্ত্তৃপক্ষ-গণের কি প্রবল বাধা থাকিতে পারে, তাহা আলোচনা করা যাউক। সম্রাট্ বলিয়াছেন—"My Royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment is compatible with public safety. অর্থাৎ আমার রাজকরুণা রাজনৈতিক অপরাধীগণের উপর পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করা হউক, অবশ্য সর্ব্বসাধারণের নিরুদ্বিগ্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া।

এক্ষণে বিপ্লববাদীগণের মুক্তিতে দেশে আবার অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি হইলে, বিপদের কথা হইবে, এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের দায়িত্ব বড় অল্প নহে। খুব সম্ভব মুক্তিদানে যে কৃপণতা দেখা যাইতেছে—ইহাই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

দেশের দিক হইতে এরূপ না ঘটিবার যথেষ্ট কারণ দেখান হইয়াছে—এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট যখন রাউলাট আইন তিন বৎসরের জন্য হস্তগত করিয়া রাখিলেন, তখন এমন উপদ্রবের সম্ভাবনা বুঝিলেই, তাহার প্রতিকার করিবার পথে তখন তো আর কেহ বাধা দিবে না। এরূপ অবস্থায় সম্রাটের বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য করিয়া তুলিবার একটা প্রচেষ্টা করিয়া দেখিতে আপত্তি কি? মহামান্য রোণাল্ডসে বাহাদুর এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রাজাজ্ঞায়, এমন কোনরূপ রাজনীতিক বন্দীই নাই, যাঁহার উপর তাঁহার

করুণাবর্ষণ না হইতে পারে, প্রতিদিনই আমরা মুক্তিসংবাদ পাইতেছি, সুতরাং উপস্থিত এতদ্বিষয়ে অধিক কথা বাহুল্য মনে করি, এই কৃপাবৃষ্টি বন্ধ হইলে, আমরা সঠিক বুঝিব, কোন্ দুর্ভাগ্য রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইল, এবং তখনই আমাদের মনের সকল কথা ব্যক্ত করিব।

পরিশেষে, আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি—সম্রাটের পবিত্র বাণী সফল হইবার দিন যদি আজিও না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা প্রজার মধ্যে যে মিলনসম্ভাবনা দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছিলাম—উহা স্বপ্ন ও মিথ্যায় পরিণত হইবে। কেননা রাজনীতিক সকল বন্দী মুক্তি না পাইলে, দেশের বুকে এখনও যে উত্তেজনা ও অশুদ্ধ রজঃশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িবার আবার সুযোগ পাইবে। এরূপ অবস্থায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণ করা, কতখানি সুবিধার হইবে, তাহা গভীর বিবেচনার বিষয়! ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মের গতিই বড় মন্থর ও বিলম্বিত, আজিকার এই শুভ সুযোগ সময়মত সুসিদ্ধ না হইলে, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ফাঁকটুকু, উহা আরও বাড়িয়া যাইবে। আয়র্লণ্ডে আজ হোমরুল দিবার প্রস্তাব যেমন আইরিস্-প্রজা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, আজিকার শাসনসংস্কার মর্লি মিণ্টোর সময়ে প্রদত্ত হইলে যেরূপ সুফল ফলিত আজ উহা যেমন দেশবাসীর তদ্রূপ মনোনয়নে অসমর্থ, সেইরূপ এই রয়েল ক্লেমেন্সিও বুঝি বাংলার অশান্তি-অপনয়নের অমোঘ অস্ত্র হইলেও সময়মত ব্যবহারের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়, আমরা সকল কথাই খুলিয়া বলিলাম—এক্ষণে আমাদের গোটাদুই কথা বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব।

যাঁহারা আজ নির্ব্বাসনে, কারাগৃহে, অরণ্যে পর্ব্বতে সঞ্চরণ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধান করা, তবে উপায়ভেদে তাঁহাদের এরূপ দুরবস্থা। সম্রাটের অনুজ্ঞামতে এই সকল স্বদেশপ্রেমিকের মুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিলম্বে যে একেবারেই বিপদের সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে, সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারের পরও আমরা মাখনলালের শোচনীয় মর্ম্মান্তিক আত্মহত্যার বিবরণ অবগত হইয়া বিষণ্ণ হইলাম, রাজানুগ্রহ যদি এই সকল দুর্ব্বলচিত্ত যুবকগণের প্রাণরক্ষায় অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা বুঝিব—ভগবানের বাণী মানুষের কাণে আসিয়া পৌঁছিলেও, মানুষ এখনও এতখানি শুদ্ধ হইয়া উঠে নাই, যে

অবিকৃত আকারে তাহার প্রতিবর্ণ মানিয়া চলে, বাংলার মর্ম্মবেদনা মর্ম্মেই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও আমরা নিরাশ হই নাই, এখনও আমরা বাংলার সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির আশায় বসিয়া আছি, সত্যই যদি বিধাতার এই-রূপ মঙ্গল ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া জাতির জীবনে পুলকহিল্লোল নাচাইয়া না তুলে, তাহা হইলে জানিও, আমাদের তপঃশক্তির সাহায্যেই সকলকে মুক্ত করিতে হইবে, মনে রাখিও, একটি দেশপ্রেমিকের করুণ ক্রন্দন আমাদের হৃদয়ের সবখানি যেন দ্রব করিয়া রাখে, বাংলার অখণ্ড আত্মজ্ঞানকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি, তাহা হইলে আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ হইবে। অবশ্যই বিশ্বমানবের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনাই আমাদের জীবনের মূলশক্তি হইবে, অত্যাচার ও উপদ্রবের প্রতিকার কেবল রাজশক্তির উপরই ন্যস্ত থাকিবে না, দেশের সবল হস্তও সেথায় সহায়তা করিবে, একথাও বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভাব-শিল্প

চিত্রের যেমন একটা পৃষ্ঠভূমি থাকে, সেইটিই চিত্রটিকে মূল্যদান করে, নতুবা শুধু কতকগুলি বর্ণ ও রেখার সমষ্টি লইয়া আলেখ্য সৃষ্টি হয় না, তেমনি মানুষের জীবনপ্রকাশেরও একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেই পৃষ্ঠভূমির উপরে দাঁড়াইয়াই প্রকাশটুকুর সাফল্য, নতুবা তাহা কতিপয় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কার্য্য, ঘটনা ও মনোভাবের সারি সারি সন্নিবেশমাত্র, উহাদের নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট মূল্য নাই, অর্থ নাই, শোভা সৌষ্ঠব সার্থকতা নাই। সার্থকতা ভিতরে, সেই অন্তঃভূমিকার উপরে। মানুষের কাজের, কথার, মতামতের মূল্য কি, যদি উহাদের পিছনে ভাব না থাকে, ভাবহীন ভাষা শুধুই জড় শব্দস্তূপ, ভাবের সম্পর্কশূন্য চিন্তা শুধু গুরুভার বোঝা, কার্য্য অসার অভিনয় মাত্র, তোতার মুখরতা যেমন নিরর্থক, শুধু কর্ণ-তৃপ্তিকর, তাহার নৃত্যভঙ্গী যেমন শুধু ক্ষণিক নয়নরঞ্জক, ইহাও তেমনি, ভাবের অভাবে সমগ্র জীবনযজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়, যেমন লবণের অভাবে সমস্ত ব্যঞ্জনটুকু বিস্বাদ ও ব্যর্থ।

* * *

ভাব, ভাষা, প্রাণ, কার্য্য, প্রজ্ঞা, প্রেম, এই সকলই মানুষের অপরিহার্য্য, কিন্তু ভাবই অন্য সমস্ত গুণের উৎস। সিদ্ধভাবের বার্ত্তাবহ সিদ্ধভাষা, ভাবেরই প্রকাশ ক্ষুরধার বাণীমন্ত্রে; ভাব গতিশীল প্রাণের তরঙ্গ-ভঙ্গে, প্রজ্ঞা ভাবের চক্ষুস্বরূপ, প্রেম ভাবেরই হৃৎপিণ্ড, উহার মূল রক্তাধার, অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ, ভাবই মহনীয়, উহাই মানুষের সবখানি, অন্য সব উহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মাত্র। জীবনকে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্য চেষ্টা অবান্তর, ভাবকে ধরিয়াই কার্য্য আরম্ভ কর, অগ্রে অন্তঃপরিবর্ত্তন তারপর বহির্জীবন, অগ্রে ভাব তারপর ভাষা, অগ্রে প্রাণ তারপর কর্ম্ম, অগ্রে অন্তর তারপর বাহির; ইহার বিপরীত পদ্ধতি, সত্যের, প্রকৃতির বিরুদ্ধক্রম, তাহাতে সাফল্য লাভ সুদূরপরাহত, উহা বাম মার্গ, উহা ভ্রান্ত পথ, ওপথে পরমোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃলাভ অসম্ভব।

* * *

উল্টা দিক হইতেও যে জগতে কার্য্য ঘটে না এমন নয়। যাঁহারা বাহিরের অতিমাত্র ভক্ত, তাঁহারা অন্তরের দিকে স্বভাবতঃ একটু অন্ধ, অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা বাহিরের প্রত্যক্ষ লইয়াই বিভোর, রূপ-সমুদ্রেই তাঁহারা আকণ্ঠনিমগ্ন; প্রাণ, সত্ত্ব, স্বরূপ—এসব তাঁহাদের কাছে চিন্তার তত্ত্বমাত্র, এ সকলের সজীব ও বস্তুতন্ত্র জীবনমূল্য কিছুই নাই, এগুলি শুধু নামস্তূপ, শব্দসমষ্টি; যন্ত্র গঠন করিয়াই ইঁহারা সকল কার্য্য উদ্ধার করিতে যত্নশীল, কারণ যন্ত্র তত্ত্ব নয়, প্রত্যক্ষ, স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য, নিরেট সামগ্রী, যাহাকে ধরাছোঁয়া নাড়াচাড়া যায়, কিন্তু ঐসব মস্তিষ্কের অলস খেয়াল, স্বপ্নপিণ্ড, উহার দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য উদ্ধার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? যন্ত্র যতই মনোরম ও সুচারুরূপে কার্য্যকর হউক, উহা তো প্রাণহীন, যন্ত্রের দ্বারা জীবনের বিস্তর প্রয়োজন সম্পন্ন হইলেও, যন্ত্র মানুষকে জীবনদান করিতে অক্ষম, কিন্তু মানুষের ভিতরে কে একজন নিত্যযুগ ধরিয়া আছেন, যিনি প্রাণেরই ভিখারী, তিনি চাহেন প্রাণ, ভাব, হৃদয়; যন্ত্র নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, সম্পদ্ নয়, এ সকল তো বাহ্য সহায় জড়বস্তুর সমষ্টি, প্রাণের মূল্যেই ইহাদের মূল্য, অন্তরের প্রদত্ত আলো ও রঙেই ইহারা রঞ্জিত ও উজ্জ্বল। চরমে এই প্রত্যক্ষবাদীদেরও বাহির হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্তঃ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

* * *

কিন্তু অন্তরের পথই সত্যপথ। অন্তর দিয়া যাহা না পাই, তাহাকে পাওয়াই হয় না। অন্তরের বল যেখানে নাই, সেখানে সকল বলই নিষ্ফল। সত্য ও পূর্ণ মানুষটি আমাদের অন্তরেই নিত্যকাল বিদ্যমান, দেবতা ভিতরে, বাহিরে নয়, দেবতা ধ্যানের সামগ্রী; বাহিরে যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বহিরঙ্গন, তাহা দেবমন্দিরের ছায়ামাত্র; এ ছদ্মবেশ, এখানে অন্তর্দ্দেবতাকে আবিষ্কার করিতে হইলে, অন্তরেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রাণ পাইব অন্তরে, সেই অন্তঃস্পর্শ প্রাণসমুদ্রে অবগাহন করিয়াই কলসে কলসে অমৃতরস উত্তোলন করিতে পারিব, বাহিরে তাহার আহরণপরায়ণ হইলে শুধু উচ্ছিষ্ট ও অশুচি পানীয়ই মিলিবে, উহা উঞ্ছবৃত্তি, উহা বর্জ্জনীয়, যে অমৃত পানে মানুষ অমর হইবে, তাহা অন্তর্দ্দেবতারই করকমল হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

বিশ্বের যে সত্য পরিচয় তাহাও অন্তর দিয়াই অনুভবগম্য।

* * *

ভিতর হইতেই বাহিরে প্রকাশ, সত্যকে নিপুণশিল্পের রেখাপাতে কথায় কর্ম্মে, আচরণে মূর্ত্তিদান করিতে হইবে, শিল্প চাই, নৈপুণ্য চাই, প্রকাশের জন্য সিদ্ধ কৌশল চাই, নতুবা সত্যও জড় ও পঙ্গুবৎ ব্যর্থ হইয়া রহিবে। জীবন প্রকাশও একটি শিল্প, বিশ্বশিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্প, মানুষ তাঁহার শিল্পশক্তির পরাকাষ্ঠা। অন্তরের সত্যকেই সুন্দর করিয়া পরিস্ফুট করা মানুষের লক্ষ্য, যাহা ভিতরে প্রচ্ছন্ন, তাহাকেই বাহিরে সূর্য্যালোকে প্রকট করিয়া তোলা তাহার কর্ম্মরহস্য, সৃষ্টি অন্তঃপ্রতিভায় বহিঃস্ফূর্ত্তি, ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার উল্লাসই সকল শিল্পের প্রস্রবণ। জীবনশিল্পের সত্যসাফল্য সেই দিন পরিপূর্ণ মাত্রায় মিলিবে, যেদিন এই অসীম পুলকোল্লাসে মানুষ কাণায় কাণায় ভরপুর হইয়া উঠিবে।

* * *

রূপের পর রূপ, চিত্রের পর চিত্র, কত বিচিত্র হিরণ্ময় রেখায় ভিতরের মহাশিল্পী আপনার অন্তঃসত্যকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তবু অরূপের অসীম রূপের কতটুকু আজ পর্য্যন্ত বিকাশলাভ করিয়াছে, অনন্তের কয়টি রহস্য মানুষের অন্তর দিয়া বাহিরে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে? কত আদর্শের আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিল, কত নব নব ভাবের স্বর্ণচিত্র অঙ্কন করিয়া কত জাতি জগৎ-মঞ্চে আবির্ভূত হইয়া আবার অন্তর্দ্ধান করিল, সেই অনন্তশিল্পীর সৃষ্টিশিল্পের আজও শেষ নাই, ছেদ নাই, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে নিত্য নূতন রহস্য উন্মোচন করিয়া আপনি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর, আপনার জন্যই আপনার রূপসৃষ্টি, আপনার আদর্শ আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া আপনি তাহার রস গ্রহণ করিতেছেন, আদি নাই, অন্ত নাই, ভগবানের সৃজনচাতুর্য্য অফুরন্ত।

* * *

এই অসীম রহস্য-সমুদ্রের তুমি, আমি, সে, এক একটি ঢেউ, অনন্তদেবের তুলিকাপ্রসূত একটী একটী ভাবমূর্ত্তি, একটী একটী সত্যের বিগ্রহ। অখণ্ড খণ্ড হইয়াছেন, অজানা আপনাকে জানিতেছেন, অসীম আপনার সীমা নিরূপণ করিতেছেন, ইহাই তো প্রতিভা, কবি যেমন ছন্দোবন্ধে সহস্র কাব্যে আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপবদ্ধ করিয়া আবার অতিক্রম

করিতেছেন, নব নব ভাবে ছন্দে অশ্রান্ত অনর্গল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই তাঁহার উল্লাস; কর্ম্মী যেমন সহস্র কর্ম্মে আপনার শক্তিকে বাস্তব করিয়া তুলিতেছেন, তবু অতৃপ্তচিত্তে আরও সহস্র সহস্র নূতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনার উদ্যত, স্রষ্টারও তাই। অসংখ্য জগতে, অসংখ্য জীবে, আত্মদান করিয়াও ভগবানের তৃপ্তি নাই, আপনার অনন্ত গুণ, অনন্ত সত্যকে অবিরল আকারগত করিয়াও তাঁহার অক্ষয়-ভাণ্ডার নিঃশেষ নহে; তোমার আমার প্রত্যেকেরই অন্তরে এক একটি অন্তঃসত্য প্রচ্ছন্ন, উহাকেই দিনে দিনে মূর্ত্তিময় করিয়া তুলিতেছি, ইহাই আমাদের জীবনপ্রবাহ, মৃত্যুও ইহার শেষ পূর্ণচ্ছেদ পরিসমাপ্ত করে না, মৃত্যু পরিবর্ত্তন মাত্র, অনন্ত জন্ম মরণের মধ্য দিয়া আমরা অভিনয় করিয়া চলিয়াছি, স্ব স্ব অন্তরসত্য, অন্তরভাবকেই পূর্ণ প্রকাশ করিবার জন্য।

* * * *

ঘটনা শুধু ঘটনাই নয়, প্রতি ঘটনার পৃষ্ঠভূমিকায় অসীম রহস্য অর্দ্ধস্ফুট, অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন। জীবনের ঘটনাগুলি পশ্চাতের সূক্ষ্মচিন্তার স্থূলপ্রতিরূপ, আবার এই সূক্ষ্মচিন্তাগুলিও কোথা হইতে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসে? উহাই সেই অচিন্ত্যলোক, সেই উৎস, সেই কারণ, যাহাকে ভাবজগৎ বলিতে পারি, সেখানে সকল ভাব স্ব স্ব সত্যস্বরূপে অবস্থিত, সেখানে সত্য হইতে সত্যে উহাদের গতিভঙ্গী, সেখানে মিথ্যার কল্পনার অনৃতের ছায়ালেশ পর্য্যন্ত নাই, উহাই মহর্লোক, সেই দিব্যভুবন যাহা বহিঃপ্রত্যক্ষ না হইলেও পরম সত্য, বাহিরের সমস্ত বস্তুরূপ যাহার ছায়ামূর্ত্তি, মায়াবিলাস মাত্র। উহা শরীরের চেয়ে সত্য, মনের চেয়েও সত্য, মনের যে গভীরতর মগ্নভাব উহা তাহার চেয়েও উচ্চতর সত্য—সেই তুরীয়ের আভাসেই মনের বিকাশ, এই সূক্ষ্মমনেরই বিকৃত কঠিনমূর্ত্তি স্থূলজগৎ। পরিদৃশ্যমান এই বাহ্যসৃষ্টি, ইহা ছায়ারও প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনির সুদূরাহত প্রতিধ্বনি মাত্র, তবু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, অন্তরের অন্তরে সেই যে অখণ্ড পূর্ণসত্য, জগৎ তাহারই ভগ্নাংশ, অসংখ্য ভগ্নাংশ রাশীকৃত করিলেও সেই পূর্ণের পূর্ণত্ব সমভাবেই অনায়ত্ত রহিয়া যায়। বাহ্যজগৎ বর্ত্তমানের সত্যকে একদিকে অতীতের মিথ্যায় পরিণত করিতেছে, আবার অন্যদিকে ভবিষ্যতের অনাগত ছায়াসত্যকে জীবনদান পূর্ব্বক কায়াময় করিয়া তুলিতেছে, পুনরায় ছায়াময় করিবার জন্যই—বাহিরের সমগ্র বিশ্বচিত্র, এই

আলোছায়ার রঙ্গকৌতুক, এ কৌতুক যাঁহার, তিনি পরম সত্য বলিয়া, তাঁহার এই মায়াবিলাস নিরর্থক ভোজবাজী মাত্র নয়, ভগবান্ সত্য, তাঁহার লীলাকৌতুকও তাই ব্যর্থ নয়, ভাগবত করচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, সৃষ্টিও সত্য, সুন্দর এবং আনন্দময়।

* * *

এই অপরিমেয় রহস্যময় অন্তর্ভূমিকার উপরে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হও, তবেই তোমার জীবনচিত্র সত্য হইবে, পুণ্যময় হইবে, নিত্য নব নব সুষমামণ্ডিত হইবে। যত নিবিড়ভাবে জীবন্তভাবে আপনার অন্তরসত্যকে অনুভব করিতে পারিবে, চিন্তারেখাগুলি ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, বাহিরের কর্ম্মরূপ ততই স্নিগ্ধ করুণ ও ভাবব্যঞ্জক হইবে, জীবনের ঘটনাপুঞ্জ ততই সরল, অনিন্দ্য, মঙ্গলাবহ হইবে, রূপে রসে বর্ণে ছন্দে ততই অন্তরপুরুষ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেন। এই অন্তঃসাধনায় উদ্বুদ্ধ হও, নূতন কর্ম্মজগৎ তোমারই অন্তরের শুভেচ্ছামণ্ডিত হইয়া তোমার পুরোভাগে প্রকাশ পাইবে; মানুষ, জাতি, সংঘ, যতই ভিতর হইতে স্বচ্ছ ও মুক্ত হইয়া উঠিবে, ততই তাহার জীবন-প্রকাশ সত্য, বিরাট্ ও মহিমাসমুজ্জ্বল হইবে; বাংলার নূতনজাতি আজ এই সত্যপথের সন্ধান পাইয়াছে, অন্তরের আনন্দ দিয়া সে নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিবে, অন্তরের রসাভিষেকে তার প্রতি পর্ব্ব হইবে সরস, সজীব জ্যোতির্ম্ময়। এই নূতন সৃষ্টির পথে আজও যে কণ্টক যে অন্তরায় বিদ্যমান, তাহার মূল আমাদের অন্তরেই, ভিতরে এখনও যেটুকু জড়িমা ও অস্পষ্টতা উহা তাহারই অমঙ্গলময় বাহ্যরূপ, অন্তরেই অগ্রে উহা উন্মূলিত কর, বাহিরের সকল বাধা আপনি তিরোধান করিবে। বাঙ্গালী আজ নূতন পথের যাত্রী, নূতন মন্ত্রের সাধক, বাংলায় নূতন শক্তির মঙ্গল মধুর নৃত্য অচিরেই আরম্ভ হইবে; মৃত্যু নয় অমৃত, পরাভব নয় অনন্ত বিজয়, ধ্বংস নয় নির্ম্মাণ—হে বাঙ্গালী! নবযুগের ইহাই হউক তোমার কর্ম্মপ্রবর্ত্তক জপমন্ত্র, ভাবশক্তিই জগৎ গঠন করে, মন্ত্র অব্যর্থ, দিনে দিনে ইহাকেই মূর্ত্ত করিয়া তোল।

যোগ-শক্তি

মানবাত্মার অন্তরে যে মঙ্গল-ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, উহার প্রকাশ বাহিরের সংঘাতে প্রতিহত হইলেও, উহার জয় অবশ্যম্ভাবী। বাহিরের নিত্য পরিবর্ত্তন অন্তরের সংগ্রামে, বাহিরকে একেবারে জয় করিয়াই অন্তরের ইষণা আপনাকে প্রকাশ করিবে, নূতন ও পুরাতনের রণভেরী এই অন্তর্যুদ্ধেরই দ্যোতক।

কথাটা হেঁয়ালির মত হইল। আরও ভাল করিয়া বলিতে হইবে। বাহিরের পক্ষ আমাদের দেহ প্রাণ আর মন। অন্তরের সবখানি শক্তি আমাদের অবিদিত। তবে ইহার ধারাল শরসন্ধান অব্যর্থ আঘাতে আঘাতে মনকে বিদ্ধ করিতেছে, মনকে জয় করাই ইহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মন তো এত সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। প্রাণের অফুরন্ত শক্তি ইহার সপক্ষে অনাগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, দেহ প্রাণেরই অনুগত, সুতরাং দেহ প্রাণ মনের উপর নূতনের পরিপূর্ণ অধিকারবিস্তার সময়-সাপেক্ষ তো বটেই, অধিকন্তু কঠোরসাধনসাপেক্ষ।

এই সাধনা কি? হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজযোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি ত্রিমার্গ যোগের কথা ভারতের হিন্দু অনবগত নহে। যোগই ভারতের সাধনা। এক হঠযোগেই ভারতের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অণিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধাই সাহায্যে কি অভাবনীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালে কল্পিত উপকথা বলিয়াই মনে হয়। যোগাবলম্বী সাধকগণ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। বহুশত বৎসর দৈবদুর্বিপাকে ভারতের অবস্থাবিবর্ত্তনহেতু এই যোগ-শিক্ষার প্রভাব বিনষ্টপ্রায়, যেটুকু আছে উহা মিথ্যাদৃষ্ট, যোগ-বিজ্ঞানের ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া অপূর্ণ যোগশিক্ষা কার্য্যকরী হইয়া উঠে না।

পরম্পরাগত যোগতত্ত্ব অবিকৃত নহে। মানুষের জীবনে যে যোগশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, উহার পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। এই যোগশক্তিসহায়েই জাতীয় জীবনের সকল দিকই উন্নত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান যুগে, ভারতের

কর্ম্মক্ষেত্রে যে সব নূতন নূতন কর্ম্মসৃষ্টি দেখা যাইতেছে, ঐ সকল প্রচ্ছন্ন যোগশক্তিরই বাহ্য লীলা, এই সুপ্ত যোগৈশ্বর্য্যের বিভূতিরূপে আমরা রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরায়ণ হইলে যোগ আমাদের আয়ত্ত হইবে না, ইউরোপ মূলশক্তির সন্ধানে উদাসীন ছিল, তাই ঐশ্বর্য্য ভোগে তাহার আত্মশক্তির দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। অচিরেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া উহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ও লঘুচিত্ত হইয়া পড়িবে, ইহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা গিয়াছে; তবে ইউরোপের মনীষা একেবারেই নিস্তেজ নহে, আত্মরক্ষার জন্য বিরল কেহ কেহ আজ যোগের পথে অগ্রসর, পাশ্চাত্যের ইহাই আশার কথা। প্রাচ্যের চীন জাপান ও মোস্‌লেম সম্প্রদায় রাষ্ট্রচর্চ্চায় উদ্‌ভ্রান্ত, ভারতের ভাগ্যবিধাতা একনিষ্ঠচিত্তে এই যোগশক্তির পুনরুদ্বোধনকল্পে তপোমগ্ন, বাঙালীজাতিকে এই যোগের পথই অবলম্বন করিতে হইবে, যোগের সাহায্যেই তাহার চরিত্র, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। এই জন্য বাঙালীর সাধনা আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে নহে, সমাজসংস্কারে নহে, দরিদ্র নারায়ণের সেবায় নহে, বাঙালীর সিদ্ধি আসিবে যোগে, বাঙালীর আত্মা জাগ্রত হইবে ইহার সাধনায়।

এই যোগ যখন ব্যষ্টি জীবন লইয়া আপনাকে পূর্ণাঙ্গ করিতেছিল তখন ইহার যে রূপ ও আকার ছিল, এক্ষণে সমষ্টিসাধনায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরাতন মন লইয়া উহা আর চিনিবার উপায় নাই। তখন যোগ ব্যষ্টিজীবনের মধ্যেই অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিত, বর্ত্তমান যুগে এই যোগে এক একটা জাতি নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিবে।

প্রাচীন যোগপদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করিলে, সিদ্ধিলাভ দূরের কথা, মানবজীবনের যে মহান্ উদ্দেশ্যে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে। অধুনা আমরা যে পূর্ণযোগের কথা উল্লেখ করিয়া আসিতেছি, উহা সমষ্টিগত সাধনার জন্য, মানবাত্মার অখণ্ডতা যদি সত্য হয়, তবে যোগের দ্বারা ব্যষ্টিবদ্ধ সিদ্ধি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যোগ আজ বিশেষ বিশেষ আধারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেও, ব্যষ্টির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিকেও পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

ব্যষ্টির সিদ্ধি সমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে তখনই, যখন মানুষের মধ্যে আত্মার অখণ্ড জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে; এই যোগ অবধারণ করিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট অনুশীলন চাই, অন্ধভক্তের অপেক্ষা বিচার-

বুদ্ধিপরায়ণ চতুর লোককেই অধিক পছন্দ করি।

বুদ্ধি যোগগ্রহণের পরম সহায়ক, এবং আততায়ীও বটে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়াই যোগকে প্রথম আয়ত্ত করা চাই। এই যোগ গৃহীত হইলে, যোগ-প্রভাবেই বুদ্ধির অহং দূর হইয়া যাইবে। সর্ব্বপ্রথমে যোগ কি তাহা বুদ্ধি দিয়াই বুঝিতে হইবে, তার পর যোগের সাধনভাগ অভ্যাসের দ্বারা সংসাধিত হইবে।

এমন হইতে পারে কোন বৃহৎ অট্টালিকার একটী দ্বার মুক্ত হইলে, অট্টালিকাস্থিত সকল প্রকোষ্ঠে বিচরণ করা যায়, তবে সেই কক্ষগুলির সকল দ্বার মুক্ত করিয়া রাখা চাই, ভিতর হইতে কোনও কক্ষের দ্বার যদি রুদ্ধ থাকে তবে বিচরণকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ কোন ক্ষেত্রে মানবাত্মার জাগরণ ঘটিলে সকল মানবেরই অন্তর জাগিয়া উঠিবে, কিন্তু এই জাগরণের গতি যদি অস্বীকৃত হয়, তবে কতকদূর দিয়া ইহাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। মানবের অখণ্ড আত্মা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে, কিন্তু উৎসর্গের অভাবে, একের সিদ্ধি অপরের আধারে প্রবর্ত্তিত হইতে বিলম্ব ঘটে। এই যে কোন কোন নূতন ভাব, মণ্ডলী, সম্প্রদায়, জাতি বিশেষে প্রবাহিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, ইহার কারণই হইতেছে এই, অহঙ্কারের দৃঢ় অর্গল যতদূর মুক্ত থাকে, ততদূর ইহা প্রবেশ করে, সিদ্ধির প্রভাব অনুসারে ইহার ব্যাপ্তি, অহঙ্কারেরও প্রচুর শক্তি আছে, খণ্ডজ্ঞানকে পরাজয় করিবার মত সামর্থ্যের অভাবে ইহা প্রতিহত হইয়া কোথাও ফিরিয়া আইসে, কোথাও বা সমধিক শক্তি আহরণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে।

আজ পর্য্যন্ত মানবাত্মার জাগরণে বিশেষ মণ্ডলী, সম্প্রদায়, বড় জোর এক একটা জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন শক্তির অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার প্রভাবে সমগ্র মানবজাতি মহান্ ঐক্যে, অন্তরগত মিলনে আপনাদের অখণ্ড শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, সেই গুলিই ভবিষ্যতের বিরাট্ ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি।

আমরা বাংলাদেশে এই শক্তির দিব্য খেলাই পরিলক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। পুরাতন কর্ম্মপ্রভাবগুলিকে খর্ব্ব করিয়া, স্থানে স্থানে নূতন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এক একটী তপস্বীকে ঘিরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সৃষ্টিও আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আদর্শ যতই উচ্চ হউক, বিরাট্ হউক, তাহার সূচনা অতি ক্ষুদ্র আকারেই দেখা দেয়, বিপুল বৃক্ষের

অঙ্কুর অবস্থা তৃণাঙ্কুর হইতে বৃহৎ হয় না, প্রকৃতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাংলাদেশে যোগ-শক্তি উৎকৃষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে, যাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি আছে, তিনিই ইহা অনায়াসে দর্শন করিয়া আশান্বিত হইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অনির্ব্বচনীয় যোগশক্তি বর্ত্তমান মানব আধারের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। শরীর প্রাণ ও মনের যে বদ্ধমূল সংস্কার, উহাদের মধ্যে যে 'অহং'এর প্রভাব, ঐ গুলির সহিত সংগ্রামই যোগের সাধনা। এই সংগ্রাম যার যত অবিরাম চলিয়াছে, সিদ্ধির পথে সে তত দ্রুত ধাবমান।

যোগী মাত্রেই এই সংগ্রামনিরত। যাঁহার জীবন যত অধিক দ্বন্দ্বময়, যোগশক্তি সেইখানে ততই অধিক শক্তিময়ী। এইরূপ সাধনায় অধিকতর অগ্রসর যাঁহারা, অথবা যোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এইরূপ আত্মার সহিত যাঁহারা একাত্ম হইতে পারেন, তাঁহাদের সংগ্রামের মাত্রা ক্রমেই অল্প হইয়া উঠে, সাধনা সেইখানে সহজ, আত্মোৎসর্গের মহিমা সেখানে উজ্জ্বলতর।

যোগশক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ্ নহে, ইহা বিশ্বের সবখানিকে পূর্ণ করিয়া নিত্যকাল অবস্থান করিতেছে, আধারানুযায়ী ইহা ফলপ্রসূ হয়। একবার যোগ গৃহীত হইলে, কিছুতেই প্রত্যব্যয় হইবে না, প্রকাশের তারতম্য হইতে পারে, পরন্তু সিদ্ধি একদিন আসিবেই, তা সে এই জীবনে অথবা পরবর্ত্তী জীবনে। এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, কালও যেমন অনন্ত, আমার আত্মাও তদ্রূপ নিত্য অবিনশ্বর, দেহগত পরিবর্ত্তনে অন্তরের দীক্ষা ব্যর্থ হইবার নহে।

যোগ গ্রহণ করাই শক্ত কথা। শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে তুরীয় শক্তি অবস্থিত থাকিয়া অলক্ষ্যে জীবন লইয়া নাড়া চাড়া দিতেছে, উহাকে মনের উপরেই নামাইয়া আনিতে হইবে। মনের অর্দ্ধেক খানা নীচে যেমন ঝুলিয়া আছে, অপরার্দ্ধটা তদ্রূপ হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঊর্দ্ধাংশ দিয়া তুরীয়ের স্পর্শই হইতেছে উহার লক্ষ্য, যোগী হউন আর নাই হউন, জীবনের মধ্যে সমুচ্চের দৈবী-স্পর্শ যে না মিলে এরূপ নহে, তবে নীচুর টানে উপরটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত স্পর্শশক্তিহীন, ভগবানের ছোঁয়া আমলে আসে না, একবার ইহা অনুভূত হইলে মনের এই ভাগটা আরও ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া উঠিবে, জীবনে নূতন স্পর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, মনের অবিশ্রাম চাওয়াই হইতেছে

সাধনা; মন্ত্র যার অজপা, জীবন যার তপস্যা, সিদ্ধি তার করগত।

মন দিয়া উচ্চতম প্রেরণা লাভ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় এরূপ নহে। সমুচ্চের আনন্দময় সত্তা দিয়া যখন মনের সবখানি ভরিয়া যাইবে, প্রাণ যখন ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, শরীরে অপূর্ব্ব শ্রী স্বাস্থ্য লাবণ্য যখন রেখায় রেখায় চিত্রিত হইবে, তখনই জানিবে, তোমার সিদ্ধি আসিয়াছে। সাধনা ব্যষ্টিগত হইলে ইহা যেরূপ অবিলম্বে হওয়ার সম্ভাবনা, সমষ্টিগত সাধনা তার চেয়ে দীর্ঘতরকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। ব্যষ্টির সিদ্ধি অল্পকাল-স্থায়ী, কেননা, আত্মা প্রকৃতপক্ষে খণ্ড নহেন, খণ্ডভাবে ভাগবত বিভূতি স্বপ্নের মত প্রকাশ পায়, স্বপ্নের মত তিরোহিত হয়, জাতিগত সিদ্ধিই দীর্ঘকালস্থায়ী, যুগ যুগ ধরিয়া ইহা অবস্থান করে। ভারতের সত্যযুগ জাতিগত সাধনার এক একটী পর্য্যায় বিশেষ।

এই যোগ বুঝিবার এবং সাধনার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। অগাধ বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সাহস যাহার আছে, তাহার পক্ষেই ইহা সম্ভব। শিক্ষার উপায় সদ্‌গুরুসঙ্গ, এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই বলিলেই চলে। আর সাধনা যে কি, তাহা যোগ গ্রহণ করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়।

সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালী এই যোগগ্রহণের অধিকারী হইয়াছে। অন্ততঃ আমাদের এইরূপ ধারণা। বাংলাদেশ নিঃসঙ্কোচে অবহিতচিত্তে বিধাতার সকল সঙ্কেত মানিয়া আসিয়াছে, বাহির হইতে বাঙালীজাতিকে অনাচারী বলিয়া বোধ হইলেও, নূতনকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার মত ইহাদেরই সামর্থ্য জন্মিয়াছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনায় বাঙালীর জীবন সংস্কার-মুক্ত। অদ্বৈত বেদান্তের অমর শক্তি বাঙালী এইবার আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীর প্রাণ ও মনকে নূতন করিয়া, দৈবী জীবন লাভ করিবার পথে বাঙালীর বড় আর বিঘ্ন বিপত্তি নাই। বুকে পেরেক ফুঁড়িয়া দিলেও, উহা উপড়াইয়া ফেলিতে বাঙালী বড় দ্বিধা বোধ করে না, আজ যে ব্রাহ্ম, কাল সে বৈষ্ণব সাজিতেছে, আজ যে পরম বৈষ্ণব, কাল সে শাক্ত গুরুর পদতলে বসিয়া কারণানন্দে বিভোর, এই সকল চপল চিত্তের লক্ষণ নহে, বাঙালীর অন্তরাত্মা সত্য সত্যই পিপাসিত, জলের বিচার তাহার আর নাই, ভগবানের দয়া এইখানেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, বাঙালী যোগের দ্বারাই জগতের নূতন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। যোগ আজ বাঙালী জাতিরই জীবনে বিশেষভাবে জাগ্রত হইলেও, কালে সমগ্র মানব-সমষ্টিকেই ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে। মানবের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি কিছুতে সম্ভব হয়, তবে এই যোগের দ্বারাই হইবে। বাঙালী তোমরা যোগসিদ্ধ হও।

ঈষণা

১। ভগবানের পরিপূর্ণ অনুমোদন লইয়াই জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অন্তরাত্মাই ভগবান্। তাঁহার আদেশ অনুভব কর।

২। আমি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুগত হইব, এই সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠা কর; মন, প্রাণ, শরীর পর্য্যন্ত এই সংকল্পে পরিপূর্ণ হউক, তুমি হও সংকল্পময়, ইচ্ছাশক্তির জাগ্রত মূর্ত্তি, কালীর বিগ্রহ।

৩। গুরুশক্তি বিশ্বশক্তিরই বিশেষ রূপ। জগতের সকল শক্তিই কালী, কিন্তু কালীবিশেষ আছে, এই কালীবিশেষকে আশ্রয় করিয়াই সাধনার দীক্ষা ও সার্থকতা।

৪। যোগ-শক্তি সর্ব্বগত, অনন্ত ভগবান্ আমাদের ভিতরে, ভগবানের গোপন স্পর্শে সেই যোগ-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে, সুপ্ত দিব্যপ্রতিভা অন্তরে বাহিরে জ্বলিয়া উঠিবে। মুক্তহৃদয় হও, সেই নিভৃত স্পর্শ অচিরে অনুভব করিবে।

৫। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, ইহা প্রথম মন্ত্র মাত্র। এখানেও আমি করি, এই খণ্ড অহংবোধ বর্ত্তমান। মন, প্রাণ হইতে এই শেষ "অহং" টুকুও মুছিয়া ফেল, তখনই অখণ্ড ভগবানের বিজ্ঞানময় খেলা আরম্ভ হইবে।

৬। তুমি একটী শক্তিকেন্দ্র, আমি একটী শক্তিকেন্দ্র, ভগবান্ সকল শক্তির অধীশ্বর, মূল চক্রপতি—যত অহং-মুক্ত হইবে, ততই কেন্দ্রে কেন্দ্রে তিনি আপনাকে ফুটাইয়া তুলিবেন।

ঈশোপনিষৎ

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে; গভীরতম অন্ধতমে তাহারা, যাহারা মাত্র বিদ্যার উপাসক।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া হন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০

বিদ্যার দ্বারা যাহা আগমন করে তাহা অন্যই (৯) বলিয়া উক্ত; অবিদ্যার দ্বারা যাহা, তাহাও অন্যই; সেই ধীরগণ, যাঁহারা আমাদিগের সমীপে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি।

(৯) 'অন্যদেব'—'এব' শব্দ 'অন্যৎ' শব্দের উপর এইরূপ জোর দিতেছে, 'একেবারেই অন্য, 'অর্থাৎ পূর্ব্বমন্ত্রে যে পরিণামের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নতর পরিণামের পথেই উপনীত করে।' পরবর্ত্তী মন্ত্রে আমরা 'অন্যৎ' শব্দের এই ব্যাখ্যান পাই। প্রচলিত যে ভাষ্য, 'বিদ্যার এক পৃথক ফল, অবিদ্যার অন্য পৃথক ফল,' এ অতি সুলভ ও তরল ব্যাখ্যা বহুল আড়ম্বর সহকারে উপস্থাপন করা হইলেও, তাহাতে না কোনও নূতন চিন্তাসংযোগ সিদ্ধ হয়, না ভাব-পারম্পর্য্যের পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা রক্ষা পায়।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১

যিনি তাঁহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের অখণ্ডতায় অবগত, অবিদ্যার দ্বারা তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২

যাহারা অসম্ভূতির, শূন্যের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে; গভীরতর অন্ধতমে তাহারা, যাহারা সম্ভূতির, প্রকাশের উপাসক।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

প্রকাশের দ্বারা যাহা আগমন করে, তাহা অন্যই বলিয়া কীর্ত্তিত, শূন্যের দ্বারাও যাহা, তাহাও অন্যই; সেই ধীরগণ, যাঁহারা আমাদিগের সমীপে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ১৪

যিনি তাঁহাকে প্রকাশ ও শূন্যরূপে উভয়ের সামঞ্জস্যে অবগত, শূন্যের দ্বারা তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, আর প্রকাশের দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করেন।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত; উহা উন্মোচন কর, হে পূষন্, (১০) সত্যধর্ম্মের জন্য, দৃষ্টির জন্য।

(১০) বেদের অধ্যাত্ম অর্থে, সবিতৃমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য সেই দিব্যজ্ঞানমূর্ত্তি কবি, যিনি মন হইতে উচ্চতর, সর্ব্ববস্তুর স্বয়ংপ্রকাশ সত্য স্বরূপ। তাঁহার মুখ্য বিভূতি আত্ম-অবভাসিকা প্রজ্ঞা, উহারই বৈদিক সংজ্ঞা হইতেছে দৃষ্টি। সত্যং ঋতং বৃহৎ সূর্য্যের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র। তিনি পূষন্, পরিপোষণকর্ত্তা, কেননা তিনি মানুষের সঙ্কীর্ণ তমসাচ্ছন্ন সত্তাকে বিকশিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত চিৎসাগরে উন্মোচন করিয়া দেন। তিনি একর্ষি, অখণ্ড একের দ্রষ্টা, আত্মবিৎ, মানবাত্মাকে তিনিই সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টির পথে পরিচালিত করেন। তিনি যম, সংযমনকর্ত্তা, অনুশাসক, যেহেতু তিনি মানবের কার্য্য এবং জীবনবিকাশকে প্রত্যক্ষভাবে সত্যধর্ম্ম অনুসারে,

অতএব যাথাতথ্যতঃ, স্বভাবের যথাতত্ত্বানুক্রমে নিয়ন্ত্রিত করেন। সূর্য্য পরমেশ্বরেরই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতি, তাঁহারই নিগূঢ় হইতে সঞ্জাত, সূর্য্য আপনার মধ্যে সেই পরমপুরুষকেই প্রকাশ করেন, যাঁহার স্বরূপ হইতে সর্ব্বভূতের উদ্ভব। সূর্য্যের রশ্মিপুঞ্জ, বৃহৎ সত্য হইতে সঞ্জাত সেই জ্যোতির্ম্ময় চিন্তাসমষ্টি, যাহারা ভেদাত্মক মানসতত্ত্বে অবতরণফলে তির্য্যক্, বিকৃত, ভগ্নাবয়ব ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; উহারাই সেই হিরণ্ময় আচ্ছাদনপাত্র, যাহার দ্বারা সত্যের মুখ অবগুণ্ঠিত। উহাদিগকে সত্যশৃঙ্খলা ও সম্বন্ধসূত্রে ব্যূহবদ্ধ করিয়া অখণ্ড সত্যপ্রকাশের ক্রোড়ে একত্র সংহত করিবার জন্যই ঋষি সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই অন্তঃসন্নিবেশের ফলেই জগদাত্মা পরাৎপরপুরুষের ভিতরে সর্ব্বভূতের ঐক্যানুভূতি ফুটিয়া উঠে।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

হে পরিপোষক, হে একমাত্র দ্রষ্টা, হে সংযমনকারী, হে জ্যোতিঃপ্রকাশক সূর্য্য, হে প্রজাপতির বিভূতি, তোমার রশ্মিজাল সুবিন্যস্ত কর, তোমার আলোকপুঞ্জ একত্র সংহত কর, তোমার অতি কল্যাণময় রূপ, সেই জ্যোতিঃ; তাহাই তোমাতে প্রত্যক্ষ করি। ঐ ঐ যে পুরুষ, সেইই আমি।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ॥ ১৭

সর্ব্বভূতের প্রাণবায়ু (১১) এক অমৃতময় জীবন, কিন্তু এই শরীর ভস্মাবশেষে পরিণত হইবে। ওঁ! হে ইচ্ছাশক্তি (১২), স্মরণ কর, যাহা কৃত তাহা স্মরণ কর! হে ক্রতো, স্মরণ কর, যাহা কৃত তাহা স্মরণ কর।

(১১) বায়ু, অন্যত্র যাহা মাতরিশ্বা বলিয়া উক্ত, বিশ্বের জীবনীশক্তি। সূর্য্যের আলোকপ্রভায় উহা জগতের একটি অমৃতময় সত্যতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, জন্ম মৃত্যু দেহবদ্ধ জীবন এ সকল উহারই বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রকাশ মাত্র।

(১২) বৈদিক 'ক্রতু' শব্দে কখনও কর্ম্মকেই বুঝায়, কখনও উহার পশ্চাতে যে কার্য্যকরী শক্তি লীলাশীল, মানসচেতনায় যাহা ইচ্ছারূপে প্রতিভাত, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিই এই শক্তি। অগ্নি স্বয়ং দিব্যশক্তি,

যিনি জড়ের ভিতরে প্রথমে উত্তাপ, আলোক, জড়শক্তিরূপে আবির্ভূত, অতঃপর মানুষের বিভিন্ন চেতনাস্তরে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ক্রম-বিকাশসূত্রে তাহাকে সমুচ্চের সত্য ও আনন্দে উপনীত করেন।

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঽস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিম্ বিধেম॥ ১৮

হে দেব অগ্নি, সমুদয় সৃষ্টবস্তু বিদিত হইয়া আমাদিগকে সুপথে সেই আনন্দে উপনীত কর; আমাদের নিকট হইতে পাপের (১৩) কুটিল আকর্ষণ দূর করিয়া দাও। তোমার সমীপে ভূয়িষ্ঠ প্রণতিবচন বিধিপূর্ব্বক নিবেদন করি।

(১৩) এই মন্ত্রটি আদ্যোপান্ত বেদ হইতে উদ্ধৃত, 'এনঃ' বা পাপ সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা এই, যাহা অন্তর্বৃত্তিগুলিকে উত্তেজনাদানে সুপথ হইতে চ্যুত করে। আছে একটী সরল মার্গ, আলোক ও সত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিবার মুক্ত পথ, ঋজুঃ পন্থাঃ, ঋতস্য পন্থাঃ, অনন্ত চেতনাস্তরের উপর দিয়া যাহা বিতানি পৃষ্ঠানি, অনন্ত ভূমিকার অভিমুখে লইয়া যায়, উহারই সাহায্যে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি স্বাভাবিক বিধানক্রমে আমাদিগকে পরিপূর্ণতার সন্নিহিত করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, পাপ এই অন্তর্ধর্ম্মকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে, দুরিতানি বৃজিনানি, সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে, বক্র তির্য্যক্ রেখা ধরিয়াই চলিতে বাধ্য করে।

(১৪) "বিধেম" শব্দ যজ্ঞের সুব্যবস্থা, নৈবেদ্যসামগ্রীর সুবিন্যাস, এবং সাধারণতঃ যজ্ঞের উৎসর্গক্রিয়াটিকেই বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত। বৈদিক "নমস", অন্তরে বাহিরে প্রণতি, উহা আমাদের অন্তঃস্থিত, জগতের অন্তঃস্থিত ভগবৎসত্তার সমীপে উৎসর্গের প্রতীকচিহ্ন। এখানে পূজার নৈবেদ্য হইতেছে পরিপূর্ণ উৎসর্গ, ভাগবত ইচ্ছাশক্তি, অগ্নিদেবের নিকট মানুষের অহঙ্কারান্ধ নিম্নপ্রকৃতির অন্তর্গত সকল বৃত্তির আত্মনিবেদন, এইরূপে উক্ত দেবতা সকল অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া মানবাত্মাকে সত্যের মধ্য দিয়া 'রায়ে', অর্থাৎ আনন্দের অভিমুখে লইয়া চলিবেন। লক্ষ্য সেই ভূমানন্দ, সেই শুদ্ধ প্রেম ও পুলকহিল্লোলে বিভোর সিদ্ধ অবস্থা, বৈদিক যুগের দীক্ষিত সাধককুল যাহাকে বিশ্বগত ভগবৎ-সত্তার ভিত্তিমূল এবং মানবাধারে দিব্যজীবন লাভের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিতেন। অহঙ্কারে বিকৃত হইয়া এই প্রেম ও আনন্দই নিম্নতর লোকসমূহে বাসনাকামনারূপে প্রকাশমান।

গান

এখনও আসিতে কেন দেরী!
মেলিয়া যুগল আঁখি, এস হে তোমারে হেরি।
কি আর রেখেছ বাকি, নিয়েছ সকলি কেড়ে,
বাসনা আসক্তি আশা, সকলি গিয়েছে পুড়ে,
এবার এস ধীরে ধীরে, (আমার) প্রাণের বংশীধারী॥
হৃদয় করেছি শূন্য, গেছে পাপ গেছে পুণ্য,
ঐশ্বর্য্য গিয়েছে চলি, ঘুচেছে সকল দৈন্য,
আসিয়া করহে পূর্ণ, হৃদয় তোমারি।
গোপন পিরীতি আর নাহি চাই, নাহি চাই,
সকলে করহে ধন্য, মহারাসে মিলি তাই,
ব্রজের রাধা বহু হ'য়ে, দাঁড়ায়েছে সারি সারি॥
যেদিকে ফিরাব আঁখি, তোমারে হেরিতে চাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে ব'স, হেরিয়া প্রাণ জুড়াই,
এস এস প্রাণ বঁধু, বিরহে রহিতে নারি॥

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
২৯এ মাঘ, ১৩২৬

কৈফিয়ৎ

কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু জানাইয়াছেন, বাংলাদেশ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ইহার গতিস্থির না হইলে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভীষণ অন্ধকারময় হইয়া পড়িবে। অনতিবিলম্বে প্রতীকার হওয়া উচিত।

কিন্তু সত্যই যদি এরূপ হয়, প্রতিবিধান করিবে কে? আত্ম-নির্ভরশূন্য বাঙালী চিরকালই কি পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে? ভগবানের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করাকেও আমরা তামসিক উদাসীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিব। ভগবান্ তো চাহেন না মানুষকে পঙ্গু করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে, তিনি চাহেন অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইতে। আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াই বাঙালী স্ব স্ব পথ নির্দ্দেশ করিবে। বাঙালীর যে তপস্যা, আপনার মধ্যেই ভগবান্‌কে দর্শন করা, একথা ভুলিলেই আমাদের সকল দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে।

বাঙালীর জাগরণ সাহিত্যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে, ধর্ম্মসাধনায়, সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের বিভিন্নপ্রদেশবাসী বাঙালীর জীবন পরিচয় বিশেষভাবে পাইয়াছিল বিপ্লববাদে। এইখানেই বাঙালী প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। প্রাণের খেলা মর্ত্ত্যের বুকে বিজলীর মত মানুষের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। শোণিততরঙ্গের বিমোহিনী মায়া অলস জীবনেও শক্তি সঞ্চার করে। য়ুরোপের রণরঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানবের উন্মাদ নর্ত্তন বীভৎস হইলেও, বিপুল-আনন্দ ও উৎসাহের উৎস সেখানে নিত্য মুক্ত ছিল, মায়ার বন্ধন মানুষকে দুর্ব্বল ও হীন করিয়া ফেলে নাই, জয়-পরাজয়ের মধ্যে মনের বিকাশ সেথায় তাই সফল হইয়াছে, পৃথিবীর পর্ব্বতপ্রমাণ অশুদ্ধতা সার্ব্বজনীন সত্যকে

আবরণ দিয়া রাখিলেও আজিকার অস্ফুট বেণুরব জগতের আকাশ বাতাস একদিন মুখরিত করিবে, মানবজাতি সে আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চিরদিন বসিয়া থাকিবে না।

বাঙালীর রক্তপিপাসা আজ প্রশমিত, উত্তেজনার আগুন নিষ্প্রভ। ইহা অবনতির লক্ষণ নয়, বিমূঢ়তার পরিচয় নয়, বাঙালীর চরিত্র য়ুরোপের অন্ধ প্রবৃত্তির অনুগত নহে, বাংলার বিপ্লববাদ বাহ্যদৃষ্টিতে বাহিরের ধ্বংসে নিয়োজিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হইলেও, ইহা সত্য নহে, বাঙালী আত্মজীবনের কলুষ ধৌত করিতেছিল, কুরুক্ষেত্রের হিংসাবৃত্তি সিপাহী বিদ্রোহেও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, বাঙালীর জীবনে যোগ-শক্তির ক্রীড়া চলিয়াছে, অতীত সংস্কার ও অন্ধশক্তির নিরসন করাই যোগের উদ্দেশ্য, শুদ্ধ ও তপঃপরায়ণ জীবনেই দৈবীপ্রভাব প্রকাশ হইবে, বাঙালীর সমষ্টিজীবন লইয়া কেবল বাংলার স্বার্থে বাঙালী জাগিবে না, অখণ্ড মানবাত্মার কল্যাণোদ্দেশ্যেই এবার তার বিরাট্ জাগরণ সম্ভব হইবে। বাঙালীর জীবন লইয়া কোনও মানুষের প্রচেষ্টা চলিতেছে না, স্বয়ং ভগবান্ বাঙালীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, বাংলার বিপ্লববাদ আত্মনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে, সাধনার সে পর্য্যায় পরিসমাপ্ত, বাঙালী এখন তপো-নিরত। এই তপস্যা অল্পসংখ্যক জীবনের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিলেও, ইহা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া সকল বাঙালীকে অগ্নিশুদ্ধ করিবে, যোগীর সত্যদৃষ্টি তাই পুলকোজ্জ্বল, নবীন আশায় বিস্ফারিত, বাঙালীর ভবিষ্যৎ বিপুল বিরাট্, পৃথিবীর কেন্দ্রশক্তি বাংলার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে।

বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ যে সংঘর্ষ, উহাও সংস্কারক্ষয়ের সাধনা মাত্র। ধীর ও চরমপন্থীর মধ্যে আত্মকলহ উভয়কেই পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে, রাষ্ট্রসাধনায় প্রজাশক্তির অধিকার দিন দিন বাড়িয়া চলিবে, বাংলায় আজ এমন একটী ঘটনারও আবির্ভাব হয় নাই, যাহা আমাদের উন্নতির পরি-পন্থী। যুদ্ধকালে, বাংলার নূতন দলের এই দীর্ঘ অবরোধ আত্মজ্ঞানকেই অধিকতর প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে। ভাবপ্রবণ কর্ম্মচঞ্চল বাঙালী আঘাতে অবসন্ন হইয়াছিল, আজ কর্ম্মক্ষেত্র আবর্জ্জনামুক্ত, তপস্বীর অনাহত শক্তিই দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছে, উপরের দর্শন ভীতিপ্রদ হইলেও অন্তরাত্মা সাধারণ কর্ম্মজীবনের তলে তলে যে বিপুল ওজস্ সঞ্চয় করিতেছে, উহার মহিমা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কর্ম্মই যাঁহাদের জীবনী-শক্তি তাঁহারা কেবল কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অবধারণ করেন, বাহিরের আড়ম্বরে আত্মহারা হন, অথবা আপনাদিগকে পথভ্রষ্ট মনে করিয়া ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। ভারতে কর্ম্ম-অবতারণার ছেদ নাই, দুর্ভিক্ষ, ঝঞ্ঝা, বন্যা, রাজনীতিক আন্দোলন, এ সকল থাকিতেও মানুষের অন্তরাত্মা প্রকৃতপক্ষে প্রসন্ন নহেন, তাহার কারণ, বাঙ্গালীর জীবন বাহিরের প্রভাবে প্রফুল্ল হইতে পারে না, অন্তরের অমৃত-ধারা নিঃসৃত না হইলে সত্য কর্ম্ম প্রকাশ হইবে না। লোকচক্ষুর অগোচরে আজ মুষ্টিমেয় সাধক তপঃক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া যে আশাবাণী বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিয়াছে, তাহা অমোঘ ও অব্যর্থ ভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে, যোগশক্তি নিষ্ফল হইবার নহে।

বাণিজ্যক্ষেত্রেও আমরা জাগরণের নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিতেছি, বাঙালী উঞ্ছ দাসত্ববৃত্তি হইতে আজ মুক্তিপ্রার্থী। অসংখ্য যৌথ কারবারের সৃষ্টি ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহার সবগুলির সাফল্য আশা না করিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে সত্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইহার মধ্যে অনুভূত হইবে। ভিন্ন জনের ভিন্ন মত থাকিতে বহুজন মিলিয়া কার্য্য করা সম্ভব নহে, ইহা বুঝিয়া বাঙালীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সুযোগ আসিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাপন অক্ষমতা অনুভব করিয়া, শত শত দক্ষ কর্ম্মীর সৃষ্টি হইবে। আশার আলো বাংলার আকাশ ছাইয়া দিয়াছে, আশার গান গাহিতে দোষ কি?

তবুও বাঙালী আলো চায়, পথ চায়, সত্য নির্দ্দেশ চায়। আশার পুলক-হিল্লোল তাহাদের ঘিরিয়া থাকিলেও, চিত্ত তাহাদের ম্লান বিষণ্ণ। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যাঁহাদের প্রতিভা আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু করিতেছেন, কিন্তু কর্ম্ম করার মধ্যে এমন কিছুর অভাব আছে, যাহা না থাকিলে কর্ম্মের যে আনন্দ তাহা উপভোগ হয় না, আনন্দস্পর্শ না মিলিলে, মানুষের চিত্ত পূর্ণ হয় না, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-শক্তি ছুটিয়া বেড়ায় না, "প্রবর্ত্তক" একভাবে দেশের কোন কাজেই প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে নাই, অন্যভাবে সকলের মধ্যেই আপনাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে চায়। "প্রবর্ত্তক" ভাবের ঘরে আগুন জ্বালাইতে চায়; মানুষের ভাবশুদ্ধি না আসিলে, কর্ম্মসিদ্ধি আসিবে—না, শত শত বৎসরে বাঙালীর কর্ম্ম একেবারেই যে শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না,

আমরা একথা বলি না। দেশের বহুলোকই কেবল কর্ম্মকেই পুরোভাগে স্থাপন করিয়া সিদ্ধির পথে যাত্রা করিয়াছে, আমরা মুষ্টিমেয় সাধক অন্তরের দিকেই অভিযান করিয়াছি, বাহিরের ঘটনারাজির আভ্যন্তরিক ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছি, ব্যষ্টি সাধকজীবনের সরল প্রকাশ যেদিন সমষ্টিগত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, "প্রবর্ত্তকের" আদর্শ সেই দিনই সার্থক হইবে, এই সাফল্যের দিন কবে আসিবে তাহার হিসাব আমরা রাখি না, রাখিবার প্রয়োজনও নাই, তবে এ যে আসিবে ইহা অবধারিত। মানুষের সাধারণ জীবনের আমরা অন্তরায় নহি, অধিকন্তু আমাদের জীবন-স্রোত সাধারণ জীবনস্রোতে ভাসাইয়া দিতেই চাই, সাধারণকে অসাধারণের পথে মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য। এতখানি শক্তি বাহিরের কর্ম্মে অর্জ্জিত হইবে না, বরং অপচয় হইবে, অন্তরের বলকে অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে মুষ্টিমেয় সাধকের আত্মনিয়োগে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, সেইজন্য বাহ্যতঃ ভারতের তথাকথিত সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতেই আমাদিগকে সরাইয়া রাখিয়াছি। বাঙালী কর্ম্মনির্দ্দেশ যদি বাহিরের দিক হইতে প্রার্থনা করে, তবে তাহাদের জীবন পরের অঙ্গুলিসঙ্কেতে উঠিবে পড়িবে, বাঙালী আবার প্রবঞ্চিত হইবে, আপনার পথকে চিনিয়া সত্য পথে চলিতে অসমর্থ হইবে। বাঙালীর অন্তরপুরুষকে জাগাইয়া তোল, দেখিবে, পথ সম্মুখে প্রসারিত, আর জাতীয় জীবনের অগ্রদূত সিদ্ধপতাকা হস্তে আগুয়ান, আপনাকে জানার কথা যদি হেঁয়ালি হয়, বাঙালী যতদিন এইদিকে উদাসীন থাকিবে, "প্রবর্ত্তক" এই হেঁয়ালির কথাই নানা ছন্দে গাহিয়া যাইবে—উপস্থিত অন্য গান তো গাহিবার তার সময় আসে নাই।

যৌথ কারবার

দেশে স্বাধীন উপজীবিকা সংগ্রহের উদ্যম দেখা দিয়াছে। অভাবের আধিক্যে এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় অল্প শিক্ষা ও অল্প মূলধনে বাণিজ্য করা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর উপার্জ্জন করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন, তারপর কেবল অর্থ-সামর্থ্য থাকিলেই চলিবে না, বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যবসা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা চাই।

* * *

সর্ব্বপ্রথমেই ঋণ করিয়া ব্যবসা স্থাপন আশাপ্রদ নহে। প্রথমতঃ সহজে কেহ টাকা ধার দিতে চাহে না, বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়া যদিও কোথাও কোথাও ঋণ মিলে, কিন্তু উপার্জ্জনের হার শতকরা দুই টাকা আড়াই টাকার অধিক থাকে না, টাকার সুদ ও আসবাবপত্র খাতে খরচ করিয়া ব্যবসায়ীর যে সামান্য উপার্জ্জন হয়, তাহাতে একটা সংসার চলে না। বরং টাকা সুদে খাটাইয়া মহাজন অল্প পরিশ্রমে অধিক উপার্জ্জন করে।

* * *

এরূপ অবস্থায় অধিক অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা একেবারেই পরিহার করিতে হয়। হাজার, পনেরশো টাকা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া কারবার করা স্বাধীন উপজীবিকার একপ্রকার উপায় বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি এইরূপ ব্যবসায়ে মাসিক ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হয়, এবং ইহার জন্য আপনাকে এতখানি পরিব্যাপ্ত রাখিতে হয়, যে বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারেই অনুপযোগী। জীবনভোর ত্রিশ পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জনের জন্য আত্মবিকাশের অবসর নষ্ট করিলে স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু দেশ প্রতিভা-শূন্য হইয়া পড়িবে।

* * *

এইজন্যই আমরা বাংলার ছোট খাট কারবারগুলি দিন দিন ভিন্ন

প্রদেশবাসীর করতলগত হইতেছে দেখিতে পাই। বাংলাদেশে মুটে, মাঝি, চাষী, এমন কি অন্ত্যজশ্রেণীর কর্ম্মগুলিও বাঙালীজাতির হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা উন্নতির লক্ষণ হইলে কথা থাকিত না, সভ্যতার চাকচিক্যে আমরা উদ্ভ্রান্ত হইয়াছি, ঘরে আমাদের অন্ন নাই। বাংলার শ্রমজীবী, কতক ম্যালেরিয়ায় বিসূচিকায় মরিয়াছে, কতক সভ্য সাজিয়া অফিসে কেরাণী হইয়াছে, আর কতক চটকলে ছাপাখানায় ভদ্রবেশে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপায় করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে।

* * *

উচ্চ শিক্ষা মানুষের মনে অনেক বড় আশার সৃষ্টি করে। বুদ্ধিও কিছু মার্জ্জিত হয়। বিশ পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে হইলে চিত্ত-প্রসাদ থাকে না। অথচ এই সকল শিক্ষিত বাঙালীর উপার্জ্জনের সকল পথই একরকম বন্ধ বলিলেও চলে। আমাদের গোড়ার গলদ, আগাও অনিশ্চিত, এরূপ অবস্থায় দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে।

* * *

বড় বড় চাকুরীগুলির সংখ্যা যত, শিক্ষার দৌড় তদপেক্ষা ঢের বেশি। কাজেই শিক্ষান্তে উমেদারি করিয়া বড় চাকুরী লাভে বিফলমনোরথ হইলে, বাণিজ্যক্ষেত্রে উঁকি ঝুঁকি মারিতে হয়, মূলধন নাই, অতএব ওকালতি, দালালী, জীবনবীমার ক্যানভাসারী প্রভৃতি ফাঁকির ব্যবসায়ে দুপয়সা রোজগারের পথ আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল, প্রথম প্রথম এক্ষেত্রে থাকিয়া অনেকেই কিছু করিয়াছেন, উপস্থিত অর্থসামর্থ্যের প্রতিযোগিতাও এখানে বাড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও, বড় ডিস্‌পেন্‌সারি না করিলে ও জুড়ি গাড়ি চালাইতে না পারিলে, কেহ তাহার খোঁজ লয় না। এই সকল উপজীবিকাতেও পুঁজির দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

দরিদ্রের সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া, উচ্চ আকাঙ্খায় বুক ভরাইয়া, তোমরা আজ করিবে কি? চাকুরী মিলিলে দিন গুজরাণের একপ্রকার উপায় হয় বটে—স্কুলের মাষ্টারী, প্রাইভেট টুইশনী, কলেজের প্রফেসারি, ষ্টেটের ম্যানেজারি, সে সকল স্থানও আজ ভর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। অধুনা অনেকে অর্ডার সাপ্লায়ারী করিতে ছুটিয়াছেন, সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষগণের মনস্তুষ্টির

জন্য দুপয়সা অগ্রিম ব্যয় করিতে হয়, কপর্দ্দকহীন তুমি, তপ্ত নিঃশ্বাসে তোমার বুক পুড়িয়া যাইতেছে! জুয়াচুরী ব্যবসা বাকী ছিল, যুদ্ধের বাজারে তাহাও অনেকে অবলম্বন করিয়া ধনবান্ হইয়াছেন, সে ব্যবসাতেও আজ মূলধনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, শেয়ার মার্কেটে, লোহার বাজারে, জমী খরিদে, তুলার খেলায়, লক্ষপতি কোটিপতির আবির্ভাব হইয়াছে, "রুপেয়া-মে রুপেয়া পঁচত্যা হ্যায়," তোমাদের আজ "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

* * *

বাংলা মূলধন সংগ্রহের উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রাচ্যের যৌথ কারবারের যে নীতি, বাঙালীজাতির মধ্যে তাহা দিন দিন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পাঁচলক্ষ হইতে পাঁচ কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছে। অনেকগুলি যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিস্তৃত আকারে পরিচালিত করিতে হইলে অসংখ্য কোটী টাকার প্রয়োজন, সে অর্থ সমগ্র জাতির নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

* * *

য়ুরোপে একটী যৌথ কারবার সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইলে, উহারই মূলধন লইয়া কত নূতন কারবারের যে সৃষ্টি হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিলাতের পাঁচ কোটী টাকার মূলধনে, ভারতে একটী চটকলের বনিয়াদ গাড়া হয়। ভারতবাসীর নিকটে উহার অংশ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত চলিতে থাকে, প্রতি একশত টাকা করিয়া ঐ পাঁচ কোটী টাকা উঠাইয়া লওয়া হয়, পাঁচ লক্ষ অংশীর মধ্যে, এক লক্ষ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ যাহার খরিদ থাকে, সমগ্র ব্যবসা তাহারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, এবং অংশীদারেরা ঠিকমত লভ্যাংশ পান বলিয়া তাঁহাদের আপত্তি করিবার কিছু থাকে না, ইংরাজ ব্যবসায়ী ঐ এক মূলধনে অসংখ্য কল কারখানা চালাইয়া থাকে। ইহাদের সহিত সম-প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে, এরূপ ব্যবসাই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে, বাঙালী আজ একথা অবধারণ করিয়াছে।

* * *

স্বাধীন জাতির মধ্যে যেরূপ স্বজাতিপ্রীতি আছে, পরাজিত আমরা, আমা-

দের মধ্যে তাহার যথেষ্ট অভাব। এই নূতন প্রথায় চলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, পরিচালকবর্গের মধ্যে অসাধারণ ত্যাগ সহিষ্ণুতা সততা ও পারদর্শিতা থাকা চাই। বাংলাদেশে অনেকগুলি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই যে সফল হইয়াছে, এরূপ নহে, তাহার কারণই হইতেছে নানাজনের স্বার্থ পরিচালকবর্গের নিজেদেরই স্বার্থ বলিয়া দৃঢ় ধারণার অভাব। নিজের মূলধনে কারবার করিলে, সেই ব্যবসায়ের উপর ব্যবসায়ীর যেরূপ মমতা থাকে, বন্ধুজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে যে কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের স্বভাবদোষে, তাহা নিজের বলিয়া পরিশ্রম করিতে পারি, যদি উপার্জ্জিত সকল অর্থই আমাকে পুষ্ট করে, কিন্তু যৌথ কারবার তো এরূপ নহে, উপার্জ্জন সকলকে ভাগ করিয়া দিতে হয়, এবং আমার কর্ত্তৃত্বকাল ফুরাইলে, অধিকাংশ লোকের মত হইলে, অপর একজন কর্ত্তা হইবে, এরূপ অবস্থায় আমাদের চরিত্র এখনও এতটা দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠে নাই, যে দেশের ও জাতির মুখ চাহিয়া, যতটুকু দায়িত্ব আমার স্কন্ধে আরোপিত হয়, কড়ায় গণ্ডায় তাহার সকলটুকু নিঃস্বার্থ ও নির্ব্বিকার চিত্তে পরিপূরণ করি।

* * * *

বাংলাদেশে আজ যে সকল যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তাহার সবই যে সার্থক হইবে, এমন নাও হইতে পারে, কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, এবং মূলধন নিজেই সংগ্রহ করিয়া, বাজারে লভ্যাংশ দিয়া অধিক মূলধন সংগ্রহের জন্য অংশ বিক্রয় করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য লাভের আশা করিতে পারি, কেননা নানাজনের নানামত সেথায় টিকিবে না, পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে বিশ হাজার অংশ যদি অভিজ্ঞব্যক্তির হয়, তাহা হইলে ত্রিশ হাজার অংশীদারের ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে বিশ হাজার অংশের অধিকারী এক ব্যক্তির মত বড় হইয়া উঠিবে, তা এই বিশ হাজার অংশ একজনের অথবা বিশ হাজার লোকের হউক, মতের মিল থাকিলেই, উহা একটী মতের মত কার্য্য করিবে। তবে সর্ব্বত্রই পরিচালকবর্গের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সততা অতুলনীয় হওয়া চাই। নতুবা বহুজনের মাথা ভাঙ্গিয়া একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, একজন বা দশজন ইহাতে

লাভবান্ হইতে পারেন, কিন্তু দেশের মধ্যে অসংখ্য বাণিজ্যবিস্তারের পথ ইহাতে বন্ধ হইয়া যাইবে।

* * *

যে ক্ষেত্রে দুইজন মিলিয়া বিশ হাজার টাকায় কারবার করিতেছেন, কারবারটিকে বাড়াইতে হইলে, আরও অধিক টাকার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, ধরা যাউক, এই কারবারীদ্বয়ের একলক্ষ টাকা হইলে, মনোমত করিয়া কারবারকে বড় করিয়া তোলা যায়। ইহারা পরামর্শ করিয়া, একসহস্র অংশে, একশত টাকা করিয়া, অংশ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ হাজার টাকা মূলধন দুইজনের, কারবারটী তাঁহাদেরই, সুতরাং দুইশত শেয়ারের মত অভিন্ন রহিল, বাকী আট শত জন ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষ অংশ খরিদ করিয়া বসিল। ব্যবসা সম্বন্ধে অংশীদারগণের মতামত গ্রহণ কালে, এই দুইশত অংশের মত এক রকম হইল, আর আট শত খানার মত আট শো রকম হইল, অথবা দশ পাঁচজন একমত হইলেন, কাজেই, কারবার যাঁহাদের তাঁহাদেরই রহিল। এক্ষণে ইঁহারা যদি স্বার্থপর না হয়েন, তবে কারবারের লভ্যাংশ যথারীতি অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন, তাহা না হইলে, ধীরে ধীরে অংশীদারগণ মনঃক্ষুণ্ণ ও প্রবঞ্চিত হইয়া, দশ বিশ টাকায় প্রতি অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন, প্রথমোক্ত দুইজন এই অংশ নানা নামে খরিদ করিয়া, নিজেদের ব্যবসাটীকে ইচ্ছামত বাড়াইয়া লইবেন। দেশের চরিত্র ঠিকভাবে গড়িয়া না উঠিলে, আজিকার যৌথকারবারগুলি ভবিষ্যতে লোকের চক্ষুশূল হইয়া উঠিবে। একেবারেই যে কিছু হইবে না, আমরা এরূপ বলি না, দেশের মধ্যে শত শত জন ব্যবসায়ী এইরূপে ধনবান্ হইয়া উঠিতে পারেন। মূলধন সংগ্রহের ইহা একপ্রকার উপায় মাত্র।

* * *

মানুষ ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে কি না, তাহা আমরা বলি না। তবে মূলধনের অভাব পূরণ করিতে হইলে, এই একপ্রকার সুবিধা আছে। একশত টাকার অংশ গ্রহণ করিলে অংশীদারগণের তবুও স্বার্থ কিছু অধিক থাকে; যেখানে অংশের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা, এই পাঁচ টাকা অংশ খরিদ করা একটা হুজুগ মাত্র, কিন্তু পাঁচ হাজার অংশ বিক্রয় করিতে পারিলেই, একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা অনায়াসেই চলিতে পারে, যখন অন্য উপায় আর নাই,

তখন এই উপায়ই এক্ষণে প্রশস্ত। অংশীদারগণ পাঁচ টাকা দিয়া যদি দেশে একটী একটী ব্যবসা গড়িয়া দিতে পারেন, ইহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি আছে?

* * *

এইরূপ প্রথা একেবারেই আমাদের নহে। ভারতের বাণিজ্যনীতি এরূপভাবে চলিত না। ভারতবর্ষকে কোনও দিনই বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কালে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে উপায় ঘরের অথবা পরের, সে বিচার করিলে চলিবে না। তবে আজ স্বাধীন উপজীবিকা সংস্থানের জন্য যে উৎসাহ দেখা দিয়াছে, উহার জন্য এই বিধি আদৌ উপযোগী নহে। এই যৌথ কারবারের ক্ষেত্রেও সাধারণের পক্ষে প্রকারান্তরে সেই চাকুরীর কথাই আসিয়া পড়িতেছে। তবে ক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত এবং ভঙ্গীরও তারতম্য আছে।

* * *

জাতি যখন জাগে, তখন চারিদিকেই কলরব শোনা যায়। অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য মানুষ নানাক্ষেত্রে নানাকর্ম্মে রত হয়। বাংলায় যে ভাবে বাণিজ্য বিস্তারের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহার গতি অবাধ হউক, ইহার প্রতিরোধী হইবার ইচ্ছাও নাই সামর্থ্যও নাই। তবে নূতন জাতির জীবন এইভাবে চলিলে, নির্ম্মাণ সুচারু ও পরিপূর্ণ মাত্রায় হইবে না। জীবনের উদ্দেশ্য কেবল বাণিজ্যবিস্তারে অথবা প্রভূত ধনোপার্জ্জনে সুসিদ্ধ হইবে না; জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—সাধনায়, এই সাধনার প্রতি উদাসীন হইয়া যে কোন ক্ষেত্রেই আমরা অগ্রসর হই না, ভারতবর্ষকে সে পথ হইতে একদিন ফিরিতেই হইবে।

* * *

সাধারণ জীবনের গতি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকেই ছুটিয়া চলিবে। বাহিরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া ধরাও সাধনার একটা দিক, কিন্তু মূলশক্তি মানুষের অন্তরে, এই অন্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একদল লোককেই আমরা চিরদিন আহ্বান করিয়া আসিতেছি। অন্তর যদি উন্নত না হয়, তবে বহির্ম্মুখী জাতির যে সংগ্রহ যে অভিজ্ঞতা তাহা ব্যর্থ হইবে।

* * *

এই অন্তরকে শুদ্ধ ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য, যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন আমরা বলি না। আমরা ইচ্ছা করিলেও নীরব হইয়া থাকিতে পারি না, গতিই শক্তির ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম হইতে কোনও চেতন জীব বঞ্চিত নহে, আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে, তবে সে কর্ম্ম নূতন ভাবে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত হইবে।

* * *

নবতন্ত্রের প্রত্যেকেই হইবেন স্বাধীন, স্বাবলম্বী। পার্থিব জীবন-যাত্রায় অর্থই হইতেছে ভাগবতশক্তির প্রতীক। উহাও আমরা উপেক্ষা করিব না, সমবায় শক্তির দ্যোতক, উহাও চাই। তবে আগাগোড়া শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া আমরা গ্রহণ করিব। ইহাতে যত বিলম্বই হউক, ধৈর্য্য আমাদের অসীম, জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

* * *

আমার হৃদয় তোমার হৃদয়কে যদি না পায়, তোমার সামর্থ্য তোমার সম্পদ্ আমার অস্পৃশ্য, অসিদ্ধ অর্থ আমাদের যতখানি উন্নত করিয়া তোলে, তাহার পতনও হয় ভয়ঙ্কর ভীষণ। গোড়া হইতে ভারতের যে নির্ম্মাণ, তাহা হইবে অধিকৃত অটল, পৃথিবীর প্রতিহিংসা সেথায় ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িবে।

* * *

আমি দাঁড়াইয়াছি—আমার দেশের জন্য, জাতির জন্য, আমার অন্তর-দেবতার জন্য। অসংখ্য মানবের মধ্যে কে আজ আপনার সবখানি উৎসর্গ করিয়া আমার বাহুযুগলে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চার করিবে, এস আমরা দুইজনে এক হইয়া যাই—অনন্ত কোটী মানব কর্ম্মসাফল্যের জন্য তাহাদের খণ্ড খণ্ড শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে একত্র করিয়া উঠিয়া দাঁড়াক্, আর আইস আমরা সহস্র জন আমাদের সব দিয়া একটী কেন্দ্রশক্তি নির্ম্মাণ করি। মত যেথানে অভেদ, হৃদয় যেথানে অভিন্ন, আত্মার যেথানে মিলন, পৃথিবীর পূর্ণ আদর্শ, দলের পর দল ছড়াইয়া, সহস্রদলে সেথায় ফুটিয়া উঠিবে। কর্ম্মসিদ্ধিই জীবনের মূলমন্ত্র নহে, মিলনই জাতির কেন্দ্রশক্তি।

* * *

আমাদের বাণিজ্যক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন, সবাই স্বাবলম্বী। অর্থের হিসাব রাখিয়া কাহারও বেতন নির্দ্ধারণ করিতে হয় না, কার্য্য হিসাবে

খরচের মাত্রা স্থির করিয়া দেওয়া হয় না, সেখানে তার সবখানি দেওয়া, সে দেওয়ার অধিকার তার যতটুকুই থাক; পাওয়ার মাত্রা দেওয়াতেই ভরিয়া যায়, চাওয়া চাওয়ীর কলরব সেথায় শোনা যায় না। সংখ্যায় দীন বটে, কিন্তু জনে জনে অনুরাগের সম্রাট্, হৃদয়ের মেশামিশিতে অসীমের আভাস সেথায় ক্রীড়ারত, ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে মিলনের অপার্থিব শক্তিই ফুটিয়া উঠুক।

* * *

ভাবের কথায় উদরপূরণ হয় কি? ভাব যেখানে স্বপ্ন, প্রহেলিকা, সেইখানেই এই প্রলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। ভাবের সত্যমূর্ত্তি ঘন হইয়া উঠিয়াছে যেখানে, জীবন সেখানে দিন দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে—প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইব না, আপনাদের মধ্যে স্বরাজ স্থাপন করিব, বিরোধ আমরা করিব না, বিরোধের পাপচিত্র আপনার জ্বালায় আপনি পুড়িয়া মরিবে, সমবায় মিলন হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হউক, ভারতে তাহারই চিত্র উজ্জ্বল করি আঁকিয়া তোল, জগতের শির সেইখানেই নমিত হইবে।

মিলননীতি

কর্ম্মের সমবায়ে মিলন, না মিলনের ফলে কর্ম্ম, এরূপ একটা প্রশ্ন আজ নবীন বাংলার যুবকমণ্ডলীর বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা আশার কথা। প্রবল কর্ম্মস্রোতে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া দীর্ঘকাল ভাসিয়া আসিবার পর, আজ স্বতঃই তাহার অন্তশ্চেতনায় নিছক কর্ম্মের উপর একটা হতাস্থা জন্মিয়াছে, ইহা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিবেগেও জাতি আরও কতকদূর অগ্রসর হইতে পারিবে।

এ প্রশ্ন যেন কতক এইরূপ, অগ্রে শরীর না অগ্রে প্রাণ, রূপ না ভাব, অন্তর না বাহির, কোন্‌টি অগ্রে কোন্‌টি পশ্চাতে, জাতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন কি, তাহার অন্তরপরিবর্ত্তন, না কাজের ডাক, অসংখ্য plan, Schemeএর ছকাছকি?

দৃষ্টিভেদের কথা, যাহার যেমন ভাব, তেমনি লাভ, ইহার মূলে আছে একটা মৌলিক তপোভঙ্গীর পার্থক্য, অন্তরাত্মার শ্রদ্ধার তারতম্য। শ্রদ্ধাময়োঽয়ম্ পুরুষঃ—পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার ভিতরে যেরূপ শ্রদ্ধাশক্তির বীজ নিহিত, তাহার জীবনে সেইরূপ ভাবের তপঃপ্রকাশই সম্ভবপর হইবে, জীবনপ্রকাশ হইতেছে এই অন্তঃশ্রদ্ধার বহির্বিকাশ। কথা হইতেছে, তোমার ভিতরের মূলভাব, সেই চিদ্‌ঘন নিবিড় ইচ্ছাশক্তি কোন্ ধরণের স্বভাব লইয়া গঠিত, কি তাহার গভীর ও নিগূঢ় মর্ম্মপ্রেরণাটুকু? ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে—পূর্ব্বকথিত সকল প্রশ্নের সদুত্তর।

স্বভাবের ধ্বংস নাই, স্বভাব অবিনশ্বর, কারণ অখণ্ড মানবাত্মা আপনার চেতনার উপর তপঃপ্রয়োগ করিয়া এই স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, স্বরূপসত্ত্বের সেই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জীবের বিশেষ বিশেষ চরিত্রবিকাশ, কেহ অধ্যাত্মমুখী, কেহ জড়বাদী, কেহ ভাবুক, কবি, দার্শনিক, কেহ কঠোর কর্ম্মজগতের মানুষ, শুধু ব্যষ্টিচরিত্র নয়, এক একটা জাতির চরিত্র যেন এরূপ বিশেষ এক একটা ছাঁচে ঢালিয়াই বিধাতা প্রেরণা

করিয়াছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, হিন্দুর সহিত জগতের অন্যান্য জাতির প্রতিভা-বিচার-কালে এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিতে হইবে।

হিন্দুর স্বভাব অন্তর্মুখী, ভাব, অধ্যাত্ম, অন্তর্বিজ্ঞান—ইহাই তাহার সত্তার সবচেয়ে সন্নিহিত পরিচিত বস্তু, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কাছে স্থূল, প্রত্যক্ষ, বস্তুতন্ত্র কর্ম্মশক্তি যেরূপ নিকটতর, সমধিক সহজ ও সমাদরের সামগ্রী। মানুষ কি করিবে, এইরূপ স্বভাবশক্তি লইয়াই আমরা প্রেরিত, আমরা অন্তরবাদী, উহারা কর্ম্মপ্রিয়।

হিন্দু জানে, বিশ্বাস করে, তাহার মূল দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার জাতীয় প্রজ্ঞা-শক্তি এই শ্রদ্ধা দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্তর দিয়াই বাহিরকে আয়ত্ত করিতে হইবে, অন্তঃশুদ্ধি ও অন্তঃপরিবর্ত্তনের উপরেই জাতির কর্ম্মধারার নির্ব্বাচন ও অনুবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে আপনাকে, আপনার স্বরূপসত্তাকে জানা ও পাওয়া, সেই আত্মজ্ঞান ও আত্মানুভব দিয়াই নূতন কর্ম্মসৃষ্টি সার্থক হইবে, নতুবা শুধু ব্যর্থ উত্তেজনাশক্তির অপচয়মাত্র ঘটিবে, এই কথাই হিন্দুর নিজস্ব প্রতিভার বাণী—এ অন্তরবাণী উপেক্ষা করা অপেক্ষা তাহার মরণ সহস্রগুণ শ্রেয়ঃ।

যোগশক্তির সাহায্যে জীবন গঠন করিবার আদেশ জাতির হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথমে এই সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় আদেশমন্ত্র জাগ্রত ও মূর্ত্ত করিয়া আপনার ভিতরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, বাংলার হৃদয়ক্ষেত্র ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল, প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালী অসংখ্য ভাববিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া আজ একটা আত্ম-প্রতিষ্ঠার অবস্থা লাভ করিয়াছে, এই ভাব আজ মুষ্টিমেয় কতকগুলি সাধকের ভিতরেই সন্নিবদ্ধ হইলেও, আত্মপ্রতিষ্ঠা ধ্রুব ও অটল হইবে, যেদিন যোগ-সাধনায় সমগ্র বাঙ্গালীজাতি সিদ্ধিলাভ করিবে।

যোগশক্তি মিলনেরই শক্তি। আত্মা এক ও অভিন্ন, মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরে অন্তরে একটা অবিচ্ছেদ্য মিলনসূত্র বর্ত্তমান, সেই ঐক্য, সেই মূল জীবন-রাগিণী সকলের হৃদয়যন্ত্রে একদিন সুরসপ্তমে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, আজ তাহা অসংখ্য অন্ধসংস্কার-সমাচ্ছন্ন বলিয়া স্পষ্টরূপে অনুভূত না হইলেও, উহা মিথ্যা হইবার নয়, মানবজাতি একদিন এই মহান্ ঐক্য ও মিলনের সামঞ্জস্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উদাত্তকণ্ঠে কোটী কোটী হৃদয় মিলাইয়া সেই অখণ্ড সত্তার বন্দনাগান গাহিবে, সেই ঋষির স্বর্ণযুগ, মানবাত্মার

মিলন মহিমায় সেদিন সারা সৃষ্টিসংসার মধুময় হইয়া উঠিবে।

হিন্দুর অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধা তাহাকে এই মূল জীবনসঙ্গীতটুকুই তন্ময় হইয়া সাধনা করিতে নির্দ্দেশ করিতেছে, আত্মা সর্ব্বগত, আজ বিধাতা পৃথিবীর যেখানে যতটুকু শান্তি ও কল্যাণ-ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, হিন্দু সে সমস্তের সঙ্গে আত্মহৃদয় মিলাইতে প্রস্তুত; বিশ্বমানবের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হউক, ইহাই তাহার অন্তরের ইচ্ছা, এ ইচ্ছা ব্যর্থ হইতে পারে না, কাল স্বয়ং একদিন তাহার সার্থকতা লইয়া আসিবে।

কালপুরুষের মঙ্গলহস্ত এই মহোদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই সকল জাতির জীবন স্পর্শ করিয়াছে, সে স্পর্শে মানবসমষ্টির কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যুদ্বেগে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, এই সব যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্বেষ, জিঘাংসা, এ সকল সত্য জীবন-রাগিণী ভাঁজিবার অগ্রে পূর্ব্বরাগ আলাপ প্রয়াস, সুরের পরিবর্ত্তে আজ ঘোরতর বিশৃঙ্খল ও বেসুরা ধ্বনিই প্রথম নির্গত, অশুদ্ধ হৃদয়তন্ত্রী অভ্রান্ত-রূপে বাজিয়া উঠিবার পূর্ব্বে অনেক সাংঘাতিক ভ্রম ভ্রান্তি অন্তরদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সত্তা অবিনশ্বর, মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানব-জাতি আজ অমৃতত্বের যাত্রী, আত্মার জাগরণ ঘটিলে, তাহার দীপ্ত মধুর স্পর্শে স্বয়ং মৃত্যুও সেদিন অমর হইয়া উঠিবে।

প্রকৃতির অন্তরে যত কিছু অশুদ্ধ সংস্কারপুঞ্জ গোপনে অবস্থিত, সত্য-প্রকাশ ঘটিবার পূর্ব্বে সেই সকলের আমূল নিষ্কাশন হওয়া চাই। বিধাতা আজ মানবজাতির শুদ্ধিবিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, যে-জাতি যেমন যেমন যতশীঘ্র শুদ্ধ হইবে, ভবিষ্য মহাযুগের জন্য সেই সেই জাতি তেমনি তেমনি উপযোগী হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীজাতির কেন্দ্রশক্তি সর্ব্ব-প্রথমে জাতিগত ভাবে যোগানুষ্ঠানে মনঃসন্নিবেশ করিয়াছে, মানুষের মনে যে গতিপরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়, তাহা ভিতরের ইচ্ছাপরিবর্ত্তনেরই অনিবার্য্য নিদর্শন, বাঙ্গালীর অন্তর্দ্দেবতা আজ জীবনভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্যই একনিষ্ঠভাবে তপস্যারত।

ভারতের কর্ম্ম হইবে অন্তরমিলনেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ। ইউরোপ কর্ম্মশীল, ঘোর বস্তুনিষ্ঠ হইলেও, তাহার এই কর্ম্মনিষ্ঠা শুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে প্রতিমুহূর্ত্তে কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে পরিভ্রষ্ট হইতেছে, কর্ম্ম তো জীবনেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ, জীবন যদি স্থায়ী অচল সত্যভিত্তি স্পর্শ করিয়া না থাকে তবে তাহার চঞ্চল বহিঃপ্রকাশ যে বালুকার উপর উত্তোলিত রাজপ্রাসাদের

মত নিয়ত টলমল করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

পাশ্চাত্যকর্ত্তৃক ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপের কর্ম্মচ্ছায়া বহুল পরিমাণে এই দেশের জীবনের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষ চিন্তায়, কর্ম্মে, রাষ্ট্রজীবনে, শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ইউরোপের কর্ম্মনীতিগুলির অনুকরণনিরত, নীতিপরিবর্ত্তন দোষাবহ নহে, পরন্তু উহা জীবনেরই লক্ষণচিহ্ন, যুগপ্রবাহের সঙ্গে মানুষকে হয় অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পিছাইয়া পড়িতে হইবে, এই প্রবল জীবনস্রোতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার একেবারেই উপায় নাই, ভারতবাসী বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীজাতি আপনার জীবনে এই যুগপ্রভাব পরিপূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ইহা তাহার প্রচুর জীবনীশক্তিরই সুস্পষ্ট পরিচয়, বাহির তো শুধু বাহিরই নয়, অখণ্ড আত্মদেবতা আত্মপর শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে বহুবেশে যুগবার্ত্তা প্রেরণ করেন, চারিদিক হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃতরস সঞ্চয় করিয়াই আমরা পরিপূর্ণ অমর জীবনলাভে সফলকাম হইব।

চাই তপঃশুদ্ধ প্রতিভার আলোকে অবিচ্ছেদ আত্মদৃষ্টি, কোন্ কর্ম্মনীতি সত্য জীবনপ্রকাশের অনুকূল, কোন্‌টি প্রতিকূল, তাহা বাহির হইতে নির্দ্ধারিত হইবে না, অন্তরের প্রজ্ঞাশক্তির উপর ধ্যান দিয়াই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে জাতির ভবিষ্য কর্ম্মধারাটি, কেবল এইখানেই নিশ্চিন্ত অনুকরণ ঘোরতর মারাত্মক। মানুষ একটা জীবন্ত জীব, জাতি এইরূপ জীবনবান্ অসংখ্য ব্যষ্টিরই সমষ্টি; মূল শ্রদ্ধাচ্যুত হইলে জীবনের ধ্বংস অনিবার্য্য, ভারতের প্রতি ব্যষ্টিজীবন যেমন হইবে তপোময়, তপঃশক্তির সাহায্যে শুদ্ধি মুক্তি অর্জ্জন করিবে, মহাজাতির সমষ্টিসাধনাও সেই তপোদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, তাহার জীবন যখন বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিবে, তখন দেখা যাইবে, মূলকেন্দ্রগত বিন্দু অপরাধের ফলে জীবনপ্রকাশ শত যোজন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ইহা যে হইবে না, তাহা অবধারিত। জাতীয় আত্মা জাগরণোন্মুখ, আত্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরনির্দ্দেশ ক্রমেই স্ফুট ও জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে, দেশ আজ যতই বহির্ম্মুখী হউক, সিদ্ধি যখন সে পথে অলভ্য, তখন দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে, ভারতের বর্ত্তমান কর্ম্মসাধনা যতদিন না অন্তরমিলনের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, ততদিন তাহার স্বস্তি নাই, কল্যাণ নাই, সত্যসাধনার অভাবে সিদ্ধিও অপ্রাপ্য, মিলনপ্রয়োজন যেমন

যেমন অন্তর হইতে উদ্ভূত হইবে, গতির পথ ততই সরল ও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সমস্তই নির্ভর করিতেছে ব্যষ্টিসাধকের অন্তঃসাধনার উপরে, ব্যষ্টির শুদ্ধি ও সিদ্ধি সমষ্টিগত হইয়াই জাতির মুক্তি ও ভুক্তি সন্নিকট করিয়া তুলিবে। নূতন যুগের হিন্দুজাতির যোগসাধনা আত্মসিদ্ধিমূলক একেবারেই নহে, সাধনা ও সিদ্ধি সমষ্টির জন্য, একথা আজ গোড়া হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, অন্তরাত্মার এই স্বীকারমন্ত্র ব্যর্থ হইবার নয়। সমবায় নয়—মিলন, ঐক্য, তপঃশুদ্ধ অসংখ্য সাধকের অর্ঘও মিলনের ফলে যে মহাশক্তির সৃষ্টি হইবে, তাহাই দেশে নূতন কর্মচক্র নির্মাণ করিয়া তুলিবে।

আর্ট

আর্ট মাত্রেই ভাবব্যঞ্জনামূলক। সৃষ্টি নয়, অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা, প্রকাশ। সৃষ্টি কথাটা ভুল অর্থেই প্রয়োগ করা হয়, জগতে কিছুই আনকোরা নূতন সৃষ্টি নয়, সমস্তই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, সমস্তই প্রকাশ। সমুদয় বস্তুই বিশ্বশিল্পীর কল্পপটে পূর্ব্ব হইতে সংস্থিত। চারুকলার ধর্ম্ম প্রকাশ করা, যাহা সম্মুখে পরিদৃশ্যমান, অথবা যাহা এককালে ব্যক্ত ছিল, কিম্বা যাহা অতঃপর বিকশিত হইয়া উঠিবে, আর্ট ইহার যে কোনটির উপর ইচ্ছামত আলোকপাত করিতে পারে। এমনও হইতে পারে, কোনও লোক-প্রিয় আর্টিষ্টের চিত্রপটে মুখমণ্ডলের একটী বিশেষ ছাঁচ, একটী বিশিষ্ট গঠনভঙ্গী প্রস্ফুট হইয়া উঠিল, এবং এক পুরুষেরও অনধিক জীবনকাল যাইতে না যাইতে দেশের প্রচলিত মুখাবয়ব এবং আকৃতির ছাঁচ সেই নূতন আদর্শানুরূপ আপনার অভিনব স্বরূপ গড়িয়া তুলিল। এই সব ছিল আদর্শছাঁচে, কারণজগতের গর্ভক্রোড়ে, যাহার সহিত আমাদের তুরীয় আত্মার নিত্যসংযোগস্পর্শ ভিতরে আছে—ঐগুলি সূক্ষ্ম মানসক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং আমাদের চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। সেই চিন্তাকেই আমরা স্থূলে ফুটাইয়া তুলি, সেইখানে তাহারা রূপ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, দেশ-ব্যাপী আন্দোলনতরঙ্গরূপে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, কাব্যে শিল্পকলায়, জ্ঞান বিজ্ঞানে, জীবন্ত নরনারীরূপে। মানুষ তাহার জগৎ রচনা করিয়া লয়, কেননা সে সেই মানসযন্ত্র, যাহার মধ্য দিয়া ভগবান্ আত্মস্বরূপে যাহা পূর্ব্বসংকল্পিত ছিল, তাহাকেই প্রকাশ করেন। এই অর্থে আর্ট অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিতে পারে। যাহা ছিল, কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে, যাহা আছে তাহাকে আমাদের জন্য স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া ধরিতে পারে, যাহা অনাগত, উত্তরকালে ঘটিবে, তাহারও পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। সে যাহা হউক, আর্টের স্বাভাবিক অধিকার হইতেছে অপেক্ষাকৃত লঘুভাবগর্ভ এবং অল্পতপঃসাধ্য দ্যোতনা ফুটাইয়া তোলা।

এক্ষেত্রেও তিনটি জিনিষের অভিব্যঞ্জনা নির্ব্বাচিত বস্তুটির ভিতরে পরিস্ফুরণ করিবার আছে, বস্তুটির কারণাংশ, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ ; তাহার সূক্ষ্ম মানসাংশ, অর্থাৎ উহার চলন্ত কল্পনা, পরিবর্ত্তনশীল ভাব, আবেগপুঞ্জ ; অথবা তাহার স্থূলভাগ, বাহ্য প্রকাশ, আনুষঙ্গিক সংঘটন বা গতিভঙ্গী, যেমন যেমন আমাদের বাহ্যচক্ষু সেই সকল দর্শন করে। ভারতীয় শিল্পকলা প্রথম দুইটি পর্য্যায়ে আত্মসন্নিবেশ করিয়াছে, ইউরোপীয় আর্ট নিয়তর পর্য্যায়দ্বয়ের প্রতিই সমধিক মনোযোগী। উভয়ে সাক্ষাৎ আর্টের মধ্য-পর্য্যায়ে, কল্পনা ও আবেগময় স্তরে ; কিন্তু প্রত্যেকটীই সঙ্গে লইয়া আসে স্ব স্ব দৃষ্টিধারা, নিয়মসংস্কার, বিশিষ্ট তপঃপ্রয়োগ, এবং অন্তরপুরুষের মূল স্বভাবসঞ্জাত স্বতন্ত্র গতিবৈচিত্র্য, নিম্নে পৃথিবীর অভিমুখে কিম্বা সমুচ্চে স্বর্গের দিকে, এইরূপে সমক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেও, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চারুকলা সমভাবেই ভিন্নমুখী এবং বিসদৃশ রহিয়া যাইতেছে।

রূপসৃষ্টিকালে উভয়গত প্রশ্ন কতকটা এইরূপ, চক্ষু যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহারই প্রতিরূপ রচনা করিব, না অন্তরাত্মা যাহা সন্দর্শন করিতেছে, তাহাই গড়িয়া তুলিব ? নিকৃষ্টশ্রেণীর ইউরোপীয় আর্ট, বাহ্যচক্ষু যাহা দেখে, তাহারই প্রতিচ্ছবি তুলিয়া পরিতুষ্ট। সে ইহারই নাম দেয় আর্টের বস্তুতান্ত্রিকতা, প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুবর্ত্তন—যেন প্রকৃতি সেইটুকুই, যতটুকু জড় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই প্রতিরূপ অবশ্য একেবারে যথাযথ নকল নয়, পরন্তু পট, তুলিকা, রং, এই সকলের সীমাবন্ধনের ভিতরে যতটুকু অনুকরণ সম্ভব ইহা ততটুকুই। ব্যবহার্য্য উপকরণগুলি আদর্শানুরূপ অনুকৃতি রচনার পক্ষে যে পরিমাণে উপযোগী, তদনুগত নকলই গড়িয়া তোলা যায়, হুবহু অবিকল অনুবর্ত্তন ক্বচিৎ সম্ভবপর। এই ধরণের আর্টের হয়তো একদিন উপযোগীতা ছিল, কিন্তু এখন যখন আমরা ফটোগ্রাফ পাইয়াছি, এবং তাহার ভিতরে ইচ্ছামত রং ফলাইতেও পারিতেছি, তখন এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পের স্বতন্ত্রক্ষেত্র ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, এ আশঙ্কা প্রচুর।

উচ্চতর ইউরোপীয় আর্ট রূপসৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠাস্বরূপ গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য মহত্তর, রূপের নয়, হৃদয়াবেগের অনুকরণই তাহার আদর্শ। আর্টিষ্ট, বস্তুর শুধু স্থূলমূর্ত্তিটিকেই দর্শন ও পটের উপর অঙ্কন করিতে সচেষ্ট নহেন, বাহ্যশরীর ভস্মুহূর্ত্তের মত যতখানি ভাবাবেগ প্রকাশ করিতে সক্ষম, তিনি সেই সকলই বর্ণে রেখায় ধরিতে প্রয়াসী। এই ভাবোচ্ছ্বাস

অনেক সময়ে অনেকখানিই বাহিরে ফুটিতে পারে। কোনও কোনও প্রবল আবেগময় মুহূর্ত্তে কিম্বা গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠানকালে আমাদের মানসস্বরূপ বহুল পরিমাণে মুখে, চোখে, আকারে, ইঙ্গিতে, গতি ও স্থিতির ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শিল্পী এইগুলির নকল করেন। তিনি তখন আমাদিগকে কেবল একটা বাহ্যবস্তু তুলিয়া দেখাইতেছেন না, পরন্তু সেই বস্তুটির একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের অন্তরজীবন চিত্রপটের উপর স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। স্বাভাবিক মেজাজের একটা ছাপও প্রায় মুখাবয়বে অঙ্কিত রহিয়া যায়, চরিত্রের কোনও কোনও বিশিষ্ট লক্ষণও আকারে ইঙ্গিতে চেহারায় অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, চিত্রকর এই অলক্ষ্য প্রভাবগুলিও চিত্রপটে সঞ্চারিত করেন। নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা 'নাটুকে' ধরণের না হইলে, এই শ্রেণীর আর্ট শক্তিপূর্ণ, সফল এবং নাট্যকলার মত জীবন্ত ভাবদ্যোতক হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কলার সীমাগণ্ডীও গুরুতর। যতটুকু অন্তরসত্য বাহ্যরূপে প্রকাশিত, ততটুকু মাত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে এই আর্ট সক্ষম। তাহার অভিব্যঞ্জনাটুকু আদিম ও অকৃত্রিম নয়, দৃষ্টিভঙ্গী পরোক্ষলব্ধ, এবং সেই বাহ্যপ্রমাণের সীমা ছাড়াইয়া অধিকদূর অগ্রসর হওয়াও তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত।

কল্পনামূলক ইউরোপীয় আর্ট ইহার চেয়ে উচ্চতর স্তরে সমারূঢ়। পাশ্চাত্য ধারণানুসারে কল্পনা সৃজনকরীশক্তি, উহা ভাবপ্রকাশক নয়। অভিপ্রায় এই, কল্পনাকুশল শিল্পী আপনার নিজস্ব কিছু ধ্যেয় সামগ্রীটির ভিতরে অধ্যারোপ করেন, একটা স্বপ্নলেখা, যাহা তাঁহার মনের উপর দিয়া সহসা চমকিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা একটা ভাব যাহা তাঁহার মানসক্ষেত্র অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। হয় তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে অঙ্কনীয় বিষয়টির ভিতরে উহা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেন, অথবা আপনার স্বপ্নলেখা বা পরিকল্পনাটিকে বর্ণে ও রেখায় আকারগত করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বস্তুটিকে মাত্র নিমিত্তরূপে ব্যবহার করেন। আর্টিষ্ট তখন প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই ব্যক্ত করিতেছেন, বস্তুটিকে নয়। এই অহংছায়াচ্ছন্ন আর্টও অনেক সময়ে খুব উচ্চদরের হইতে পারে, ইউরোপের কয়েকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি এই ধরণের রচনা। অধিকতর বিরলক্ষেত্রে চিত্রকর তাঁহার কল্পনাসমুজ্জ্বল সহানুভূতিবলে রূপের অন্তরে যে বস্তুস্বরূপটি প্রচ্ছন্ন, তাহারই একটা অস্ফুট রশ্মিলেখা ধরিয়া ফেলেন। তাঁহার কল্পনা সাধারণতঃ

উহা লইয়াই ক্রীড়ামত্ত হইয়া পড়ে, এবং এইরূপে দর্শনটিকে সর্ব্বাবয়বে সত্য হইয়া উঠিতে বাধা দেয়, কিন্তু তাঁহার হস্তে অতি উৎকৃষ্ট ধরণের সজীব, চিত্তাকর্ষক, এবং সুষমামণ্ডিত কলাসৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে।

উপরোক্ত সকলশ্রেণীর আর্টেই ইউরোপীয় শিল্পী বাহিরের গণ্ডীবদ্ধ, চিত্তে বস্তুরাজির যে প্রকৃতির দেওয়া নিরেট বাস্তব ভৌতিক মূর্ত্তিপিণ্ড, তাহারই প্রতিরূপ গড়িতে গিয়া তিনি সেই স্থূল প্রয়োজনের শৃঙ্খলে আপনাকে বন্ধনগ্রস্ত করিয়াছেন। তিনি বাহ্যরূপের অনুগত ক্রীতদাস, আর এইরূপ দাসখতবদ্ধ বলিয়া অন্তরের একটা উদার অধ্যাত্মমুক্তি তাঁহার মিলে নাই, তাই তিনি সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত, কেননা একমাত্র অন্তরের এই মুক্তিই অধ্যাত্মদৃষ্টির অধিকার দান করে, একটি অন্যটির যেন প্রথমসূত্রস্বরূপ। বস্তুর অন্তঃস্বরূপ প্রকাশে উদ্যত হইলেই, পাশ্চাত্য শিল্পী প্রায়শঃ সৃষ্টি করিয়া বসেন একটা রূপক, এইরূপ সত্যের উলঙ্গস্বরূপ হইতে রূপকে না নামিয়া তাঁহার উপায় নাই। অধুনাতন কালে ইউরোপের নবপ্রবর্ত্তিত Impressionist School এই রূপের নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন, যে বস্তুর মধ্যে মানুষ দেখে না তাহার সুগোল, নিরেট, স্থূল জড়মূর্ত্তিটি, যাহা দেখে তাহা সমধিক দুর্লভ অন্য এক জিনিষ। বাস্তবিক তাঁহারা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতেছেন, বস্তুর অন্তরে প্রচ্ছন্ন একটা গূঢ় সত্যের অভিমুখে, চক্ষু প্রত্যক্ষ করিবার বহু পূর্ব্বে অন্তর যাহা প্রত্যক্ষ করে, এমন একটি গভীর কিছু দেখিবার এবং ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই তাঁহাদের মধ্যে খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথ অনবগত, কল্পনার গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে অসমর্থ, ফলে অদ্ভুত বিস্ময়রসের উদ্দীপক একটা উদ্ভট কিছু গড়িয়া তোলা হয় মাত্র, তবে ক্বচিৎ কোনও প্রত্যাদিষ্ট ভাবশিল্পীর চক্ষু অনাবৃত সত্য-দর্শনটির নিগূঢ় সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় কলাসাধক বিপরীত প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিতেন। তিনি বস্তুস্বরূপটিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া দেখেন, কিম্বা ধ্যানযোগে অনুধ্যেয় বিষয়টির সহিত অধ্যাত্ম ঐক্য অনুভব করেন, ধ্যানবলে বস্তুটি যে অন্তরসত্যের দোত্যনা করিতেছে তাহার দিব্যপ্রকাশ তাঁহার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই অনুভবলব্ধ অন্তরভাব তাঁহাকে স্থূলে চিত্রপটের উপর অবতারণা করিতে হইবে, কিন্তু এই প্রকাশের সুষ্ঠু উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি তাঁহার

বুদ্ধিশক্তি কিম্বা কলানৈপুণ্য মাত্র ব্যবহার না করিয়া নিজের তপোদীপ্ত চিদ্‌ঘন ইচ্ছাশক্তির হস্তেই আপন লেখনী ও তুলিকাটি সমর্পণ করেন। শিল্পসৃষ্টির যে রীতিনীতি নিয়মপদ্ধতি তাহা নিপুণ হস্তে বিধিমত প্রয়োগ করিলেও, উহারই উপর তাঁহার একান্ত নির্ভরতা নয়। শিল্পী যে শরীরটি অঙ্কন করেন, তাহা এমন শরীরই, যাহার সর্ব্বাবয়ব দিয়া বস্তুস্বরূপটিরই অভিব্যঞ্জনা ফুটিতেছে, বস্তুতন্ত্র জগতের স্থূল মাংস-পিণ্ড বহুল পরিমাণে সেই অন্তরসত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া ইহা হুবহু তাহাই নয়। বস্তুর সূক্ষ্মভাগে যখন তিনি অবতরণ করিয়াছেন এবং কল্পনা, রসোচ্ছ্বাস, কিম্বা চলন্ত হৃদয়ভাবগুলি প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনও তিনি এই একই নীতি সঙ্গে লইয়াছেন। বাস্তবশরীর যেটুকু হৃদয়ানুভূতি প্রকাশক্ষম, সেইটুকু লইয়াই তিনি পরিতুষ্ট নহেন, সূক্ষ্মদৃষ্টির আলো ফেলিয়া কিম্বা সেই বিশেষ আবেগতরঙ্গের উপরে ধ্যান দিয়া তিনি উহার পরিপূর্ণ গভীরতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন এবং উহারই পূর্ণপ্রকাশোপ-যোগী ছাঁচে শরীরটিকে গড়িয়া লয়েন। ভারতীয় চিত্রশিল্পী অন্তঃস্বরূপটি দর্শন করেন এবং উহাই অঙ্কন করেন, অথবা হৃদয় ও মানস-কমল দর্শন করেন এবং তাহাই চিত্রগত করেন। তিনি শরীরও প্রত্যক্ষ করেন এবং ইচ্ছা হইলে তাহাও অঙ্কন করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন না।

পরিচয়

সে এসেছিল। আগে তো চেনা শুনা ছিল না। একদিন এই ফাগুন মাসের ভোর রাতে ঘুমচোখে চেয়ে দেখি, সে দাঁড়িয়ে, সাদরে আসন বিছিয়ে বস্‌তে দিলুম।

ঘরখানি আমার ছোট, তার থাকার বড় অসুবিধা হ'ল। রাঙচিতা বেড়ার মাঝখান দিয়ে, ঐ যে সুরকির রাঙা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, খানিকদূর গিয়ে, শিব মন্দিরের পাশে যে ছোট বাড়ীটী আছে, সেইখানে তারে রেখে এলুম।

তার কত কথা, আমার বুকে কিন্তু একটা আঁকরও কাটে না, আমার গানেই আমি বিভোর, অন্যের আলাপ ভাল লাগ্‌বে কেন? তবু সে ডাকে, যাই, কথা বুঝি না, তার মুখ পানে চেয়ে থাকি, এমনি করে' দেড় মাস কেটে গেল।

অনেক দিন আর যাই নি। সেও আর বড় ডাকে না। সে চাঁদ, আমি জোনাকী, তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক, আঁধার ঘরে টিপ্ টিপ্ করে' জ্বলি, তৈজসপত্র ঝিক্‌মিক্ করে' ওঠে, সে আমার বড় আনন্দ।

আবার ডাক্ এলো। এবার অনেকদিন পরে। ছুটে গেলুম তার কাছে —মুখপানে চেয়ে দেখি, সে হাস্‌ছে—আর বল্‌ছে—"আমি যে যাব!"

কোথায় গো? তোমার অন্য কোথাও যাবার যায়গা আছে নাকি? সে হেসে বল্লে—'হাঁ—এখানে শুধু তোমায় দেখ্‌তে এসেছিলুম।' আমার বুকের পাঁজরা যেন খসে গেল, আসি আর নাই আসি, বুক যেন আমার ভরাট হ'য়ে উঠ্‌ছিল। চোখ্ দিয়ে আমার জল এল। সে কাছে এসে মিষ্টি করে' বল্‌লে, যাবার সময় আস্‌বে তো?

কেন গা? আমার সঙ্গে তোমার এত পিরীত কিসের? আসি নাই আসি তোমার তাতে কি? বুকের মধ্যে ভারি যন্ত্রণা হ'তে লাগ্‌লো, দম্‌কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে, ছুটে বাড়ী এলুম, সে রাত্রে কেবল কান্না

আর কান্না--ঘুমের নামগন্ধ নেই।

রাত অনেক। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে—জোছনার বান ডেকেছে, গলাক্রপোয় পৃথিবীর বুক ছেয়ে গেছে—ক'এর্ গলা পেলুম—সে আমায় ডাক্‌ছে।

কেন? তিনি যে যাবেন—তোমায় একটিবার দেখ্‌তে চান! বুক আমার ধরাস্ ধরাস্ কর্ত্তে' উঠ্‌লো। ক'কে পেছনে ফেলে দৌড়ে গেলুম নদীর ধারে।

জলের ঢেউয়ে রাশি রাশি মণিমুক্তা ঠিক্‌রে পড়্‌ছে, সাদা পাল তুলে তালে তালে নাচ্‌ছে একখানা ভাউলে, ঘাটে বাঁধা, যেন এখুনি আমার প্রাণের তার কেটে সে ছুটে যাবে কোন্ অসীমের পানে কে জানে! তীরে দাঁড়িয়ে সেই অপরিচিত অতিথি, মাথা হেঁট করে' সাম্‌নে গেলুম, জীবন যেন মুচ্‌ড়ে কে ভেঙ্গে দিতে লাগ্‌লো, চোখের জলে বুক ভেসে গেল—কি যেন ছিল, সব যেন নিয়ে যায়! "তবে আসি", কি করুণা-বিজড়িত স্নেহমাখা বাণী—তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রেমে অনুরাগে চোখের পাতা নুয়ে পড়েছে, পা দুখানা জড়িয়ে মাটীর উপর বসে পড়্‌লুম, সে আমার হাত দুখানা নিয়ে বুকের কাছে টেনে নিলে—ওগো তুমি কে?

পৃথিবী পায়ের তলা থেকে সরে গেছে—কেবল কাণের ভিতর দিয়ে মরমে একটা কথা পৌঁছলো—আবার দেখা হবে!

বুক ভরা আঁধার নিয়ে বসে আছি—যে এসেছিল—সে চলে গেছে—রেখে গেছে একটা আকর্ষণ, পাকে পাকে জীবন নিংড়ে আমায় নিঃস্ব কর্ত্তে' দিয়েছে।

* * *

মিথ্যা নয় তার কথা। আবার তারে ফিরে পেয়েছি—কেমন করে' —সে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব—জীবন আমার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে দিনের জ্যোৎস্না আজিকার জীবনে সত্য হয়ে, অমর হয়ে ফুটে উঠেছে—আমায় তোমরা চিন্‌বে কি?

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৬

উৎসর্গ-শক্তি

নূতন সৃষ্টির মূলেই একটা গলদ রহিয়া যাইবে, যদি প্রতি ব্যষ্টিজীবন শুদ্ধ ও সত্য হইয়া না উঠে। বহু আত্মার ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব্ব রসায়ণযোগে একত্র মিশিয়াই সমষ্টিশক্তি, বিরাট্ অট্টালিকার প্রত্যেকখানি ইষ্টক যদি সুগঠিত না হয়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হয় না; সংঘসৃষ্টি ব্যর্থ হইবে, যদি সমষ্টিগত প্রতি সাধক অন্তরে অন্তরে সংঘের প্রেরণাশক্তি পরিপূর্ণমাত্রায় লাভ না করে।

মূলশক্তি কৃপণ কিম্বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সূর্য্যকিরণ যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়, শক্তি সর্ব্বত্রগামী, সকলের উপরে সমভাবেই অজস্রধারে প্রেরণাবৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আপনাকে অর্গলরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার অন্তর দিব্য আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কিরূপে? শক্তিরাণীর মুক্তহস্তে এই যে কৃপাবৃষ্টি, তাহার জীবনে উহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ।

উৎসর্গ শুধুই একটা কথার কথা মাত্র নহে, উহাই বেদ, উহাই শক্তি। একটা বাণী লইয়া কি করিয়া জীবন অতিপাত করা যায়, এমন সংশয় যাহার হৃদয়ে, তাহার কাছে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠে নাই। সাধনার সমগ্র মর্ম্মরহস্য একটী কথা, একটী বাণী, একটী সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, একটী অনাহত বীজধ্বনি, একটী প্রণবমন্ত্রই যথেষ্ট, হিন্দুসাধক জানে, বিশ্বাসে অগ্নিময় হইয়া উহাই সকল সংস্কার ভস্মীভূত করিবে, সিদ্ধির পুলকোজ্জ্বল মহিমায় জীবন সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

বাণীকেই মূর্ত্ত করিয়া তোল, যোগ শুধু বুদ্ধিগৃহীত করিয়া রাখিলে জীবনে শক্তিসঞ্চার করিবে না, বুদ্ধি সাগ্রহে অনেক শিকড় প্রতিষ্ঠা করে, আবার পরক্ষণে উপাড়িয়া ফেলে, মন্ত্র জীবনময় ছড়াইয়া পড়িতে দাও, মহাশক্তিকে আধারে প্রবেশ করিবার জন্য মাত্র অনুমতিটুকু প্রদান কর, পাদপ্রতিষ্ঠা করিবার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ স্থান পাইলেও, যোগশক্তি অন্তরে অন্তরে মূর্ত্তিময়ী হইয়া উঠিবে।

শক্তির দর্শন চাই। অহঙ্কারই তাহার অন্তরায়, শক্তি বিশ্বব্যাপ্ত হইলেও, অনন্ত বিশ্বের সীমা পরিমাণ মানবদৃষ্টির গোচর নয়, মানুষ আজ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের যেটুকু অবধারণা করিতে পারে, উহাই শেষ নয়, বিজ্ঞানের সীমান্তরেখা দিন দিন পৃথিবী ছাড়িয়া লোক লোকান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে, আজিকার অনন্ত কল্পনা কাল সসীম হইয়া পড়িবে, অনন্ত কোথায়, উদাসনেত্রে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিলে অনন্তশক্তির সন্ধান মিলিবে না, বিশ্বশক্তির নিগূঢ় অন্তরস্পর্শ পাইতে হইলে মানুষকে সান্তের শরণ গ্রহণ করিতে হয়, মানুষের দুর্জ্জয় অহঙ্কার মানুষের চরণে আপন উন্নতশির নমিত করিতে দেয় না, কিন্তু অহংকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া মহাভাব জীবনগত করিতে হইলে মানবাত্মার স্পর্শ চাই, মানবাত্মার স্পর্শেই মানবাত্মা জাগিয়া উঠে, অনন্তকে একটা ছেদের মধ্যে দিয়াই দর্শন ও স্পর্শন করিতে হয়, উৎসর্গ সিদ্ধ হইলে সান্তই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় অনন্তস্বরূপ প্রকাশ করেন।

ভাব নিরেট জমাট হইলে, অস্পষ্ট ধূঁয়ার মত আজ যাহা শুধুই স্বপ্নবৎ, তাহা জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে, সাধনার অভাবেই আজ অন্তরপুরুষ সুপ্ত মায়াচ্ছন্ন, উৎসর্গমন্ত্রের ঐ অনাহত প্রণবটুকু—উহারই ভিতরে অনন্ত জগদ্‌রহস্য প্রচ্ছন্ন, একনিষ্ঠচিত্তে উহাকে দৃঢ়বিশ্বাসে বুকে জড়াইয়া ধর, অন্তর দিয়া অন্তর স্পর্শ করা যায়, উৎসর্গপ্রভাবে ধীরে ধীরে গুরুশক্তির গভীর শ্রদ্ধামূর্ত্তিটি সমস্ত অন্তরখানি ছাইয়া ফেলিবে, এ স্পর্শ, এ দর্শন, এ অনুভব অতি সত্য, বস্তুতন্ত্র, প্রকট, আপনার ভিতরে এই Soul-force এই তপঃশক্তি, ভগবানের এই দিব্য ইচ্ছা নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হইলে, তবে তো জীবনের গতিনির্দ্দেশ প্রভাতসূর্য্যের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মানুষ বড় তরলচিত্ত, আনন্দের ভোগের জন্য জীবন, এই শাস্ত্রমন্ত্র শুনিয়াই ভোগের উদ্দেশে লালায়িত হইয়া ছুটে, আত্মতৃপ্তির জন্য আপনার চারিদিকে লালসার তীব্র হুতাশন জ্বালিয়া দেয়, সাধনার নামে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে

উৎকট গরলকুণ্ড সৃষ্টি করে, কর্ম্মসূত্র দীর্ঘতর হইয়া তাহাকে আষ্টেপিষ্টে জড়াইয়া ধরে, কালকূটের দহনজ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ এমনি করিয়াই জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিতেছে।

সর্ব্বানন্দে জীবন ভরাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার পথ নিগ্রহ নয়; ইন্দ্রিয়ের, প্রবৃত্তির, অশুদ্ধ লালসার তাড়নায় প্রাকৃত জীবনের অনুবর্ত্তন করিলেও আনন্দ-সমুদ্র শুধু ঘোলাইয়াই উঠিবে, আত্মার আপন ভোগারতি আত্মার ভিতর হইতেই সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, সকল প্রেরণাই সত্য, ভোগ মানুষের নয়, দেবতার আনন্দবিধানের জন্য, কিন্তু এ সিদ্ধভোগের জন্য মানুষকে যে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয়, তাহার পূর্ণানুষ্ঠান না করিয়া অমৃত-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলে, ধারণসামর্থ্যের অভাবে অমৃতও গরলে পরিণত হইবে, সে হলাহলে চিরজীবন জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে।

মানুষ অমৃতের পুত্র, আনন্দস্বর্গ মর্ত্ত্যের বুকে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াই লইতে হইবে, প্রবৃত্তির তুমুল ঝটিকাবর্ত্ত মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও যোগী অবিচল আত্মপ্রতিষ্ঠার উপরে ভর দিয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিবে, তারস্বরে উৎসর্গমন্ত্র উচ্চারণ করিবে, প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য সহিয়া সহিয়া উমানাথ শঙ্করের মত বিশ্বজয়ী শক্তির আধার হইয়া উঠিবে, তপঃরত সাধকের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার অবসর নাই, দশেন্দ্রিয় দশদিকে মুক্ত রাখিয়াও তাঁহার জীবন সংযমভ্রষ্ট হয় না, ধমনীর সমস্ত রক্তস্রোতঃ উজানপথে ধাবমান, ইন্দ্রিয়দ্বার আপনি ঊর্দ্ধমুখী; নিগ্রহ নাই, কষ্টক্লিষ্ট সংযমের প্রচেষ্টাও নাই, কিন্তু কোথা হইতে একটা অপার্থিব দৈববিধান আত্মসমর্পণ-যোগীর প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত অধিকৃত করিয়া ফেলে, যোগশক্তি যাঁহার জীবনে সত্য সত্যই প্রকট, তাঁহার সমস্ত জীবনতন্ত্র একটি মহনীয় দিব্য নিয়মের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ লীলাক্ষেত্রস্বরূপ।

হীন উঞ্ছবৃত্তির জন্য মানুষের জীবন নয়; যে ভোগ স্বর্গের, মানুষ যতদিন না আত্মহৃদয়ের সম্রাট্ হইয়া উঠিতেছে, ততদিন সে ভোগে তাহার অধিকার নাই, মানুষকে অগ্রে আত্মজয়ী হইতে হইবে, এই রক্তমাংসের উপরে তুরীয়ের যে ক্ষীণ ছায়াটুকু আসিয়া পড়িয়াছে, প্রাকৃত মানুষ সেই ছায়াটিকে কচলাইয়াই অমৃতের আস্বাদন পাইতে চায়, সে জানে না অমৃতস্বাদ পাইতে হইলে অমৃতের আধার লইয়া উঠিতে হইবে, এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা দিব্যভোগ অসম্ভব, এই সকলকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে

হইবে। মর্ত্ত্যের এই আনন্দকানন, ইহাকে তুরীয়ের উল্টা পৃষ্ঠচ্ছবি বলিয়াই জানিও, সলিলবক্ষে যেমন তটশোভী তরুকুলের বিপরীত প্রতিরূপ পড়িয়া থাকে; মর্ত্ত্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গের অপভ্রংশ মাত্র, যতদিন না যোগলব্ধ তৃতীয় দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, সেই তৃতীয় নেত্র জীবনে পরিস্ফুট হউক, দেবধর্ম্মে সমস্ত জীবনপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক, তখন অন্তরের স্বর্গরাজ্য বাহিরেও বিকশিত হইবে, পৃথিবীরও সেদিন মুক্তি আসিবে, দেবচরিত্র অসংখ্য মানবের তপস্যায় প্রত্যেক ধূলিরেণুটী পর্য্যন্ত চৈতন্য ও আনন্দে ঢল ঢল হইয়া জাগিয়া উঠিবে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত অখণ্ড অমৃত-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে মানুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে আসিবে, মানুষ বিশ্বচরাচরের সাথে একহৃদয় হইয়া সেই দিনই মহানন্দে যোগযুক্ত ভোগ আরম্ভ করিবে।

পাওয়াপাওয়ি

একটা নূতন কথা। পাওয়াপাওয়ি। তুমি আমায় পাবে, আমি তোমায় পাবো। কর্ম্মতৎপর ব্যক্তির কাছে কথাটা নেহাৎ ছেলেমানুষী। কিন্তু আমরা দেখ্‌ছি, বাংলাদেশে একদল লোক এমন জন্মেছে, যারা এই কথাটা হেঁসে উড়িয়ে দিতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে পাওয়াপাওয়ির ভাব দৃঢ় হ'য়ে না উঠ্‌লে তারা কিছু কর্‌তে রাজী নেই।

* * *

কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমায় আমায় মেশামিশি হ'লেই, যে পাওয়াপায়ির হাঙ্গাম মিটে যায়, তাও নহে, এ এক নূতন ব্যাপার, নূতন চোখ্‌ না ফুট্‌লে পাওয়া গেল কি না জানা যায় না। আপনাকে ভাল করে' পেতে হবে, তবে তোমায় পাব।

* * *

আপনাকে পাওয়া মানেই আপনাকে জানা। কে আমি, এই শরীর, না মন, না আত্মা? শরীর আর মনের সন্ধান না হয় করা যায়। আত্মা আবার কি? কথাটা একেবারেই যে কাল্পনিক নয়, এ কথাও হলপ করে' বলা যায় না। বিশ্বাসই আত্মাকে পাবার ও জান্‌বার প্রথম উপায়। একেবারেই যা জানি না মানি না, তাকে বিশ্বাস করিই বা কেমন করে'? আচ্ছা দেখার দিক্‌ দিয়েই সাধনা আরম্ভ কর্‌লে কি হয়?

* * *

শরীর তো আছে—আর শরীরই যে আমার সবখানি এমন নয়, মনের কথা মন দিয়েই জান্‌তে পারি, কিন্তু যা মনে করি, তা তো সব হ'য়ে ওঠে না, মনের অতীত আর কিছু শক্তি আছে নিশ্চয়, কি সে শক্তি, তাকেই আত্মা বলে' মান্‌তে দোষ কি? আমার শরীর মনের অতীত যে বিশেষ সত্তা, তাই না হয় আমি হলুম, তারপর?

* * *

গোলযোগ তো এইখানেই। তর্কের খাতিরে শুধু মেনে নিলেই তো

হবে না। আমি যে শরীর নই, প্রাণ নই, কিছু স্বতন্ত্র সত্তা, এই বোধকে পাকা করে' তুল্‌তে হবে, তা হ'লেই, সাধনার কথা এসে পড়্‌বে। আমি আত্মা, আমি অক্ষর অবিনশ্বর সত্তা, এই জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিত্যস্মরণে সিদ্ধ হবে। আত্মাকে চিন্তা কর্‌লেই ধ্যান আস্‌বে। তা হ'লেই আরও বিপদ্, এই কর্ম্মের যুগে আবার ধ্যান আসন! সর্ব্বনাশ—আত্মাকে তো পাওয়া নয়—এ যে পঙ্গুত্বের সাধনা!

* * *

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান" "নগর ফিরি মনে করি প্রদক্ষিণি শ্যামা মারে" "আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মারে" প্রভৃতি। এই মা—শ্যামা, শরীর মন ছাড়া আর কিছু, ঘুরিয়ে আত্মশক্তিকেও বলা যেতে পারে, জীবাধারে কালী তো কুণ্ডলিনীশক্তি, উপনিষদের ভাষায় "যন্মনসা ন মনুতে—যেনাহুর্-র্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম—" মনের দ্বারা যিনি চিন্তনীয় নহেন, মনই যাঁর বিষয়, ব্রহ্ম সেই। এই আত্মশক্তিই তো মন প্রাণ চিত্ত বুদ্ধি শরীরের ঈশ্বর। সুতরাং ভ্রমণে, শয়নে, ভোজনে ধ্যানের বিষয় যদি এই হয় আপত্তি কি?

* * *

ঠাকুর একটা বড় কথা বলে' গেছেন। ভাবে থাক্‌তে। "ও তোর যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়" ভাবের মাত্রা যত অধিক হ'বে লাভের অংশ ততই বেড়ে যাবে, ষোল আনা ভাবে পরিপূর্ণ লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবে থাকার জন্যই হাজার রকম সাধন ভজন প্রবর্ত্তিত আছে।

* * *

বাঙ্গালীর জীবনে আত্মজ্ঞান ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য স্বতন্ত্র করে' সাধন ভজনের প্রয়োজন আছে কি? যদি এমন মনে হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যাত্ম জীবনসাধনার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। গৌরাঙ্গের তপস্যা, বিজয়কৃষ্ণের সাধনা, ঠাকুর পরমহংসের অনুভূতি, যদি তাঁদের জীবনবিকাশের জন্যই হয়, তবে ঐ সকল মহাত্মাগণের চরিত কীর্ত্তন করে' আমাদের লাভ কি? আমরা ঘোরতর অবিশ্বাসী, মহাপুরুষগণের অযাচিত দান অহঙ্কারের লৌহ-কবাটে ঠেকে চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—আমাদের বিশ্বাস মুখে, কাজেই দৈবীসহায় লাভে একেবারেই বঞ্চিত।

* * *

উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষালাভের পর আত্মাকে প্রসারিত করে' ধরেছি, অখণ্ড আত্মবিস্তারে দিন দিন অতীতের সকল তপঃশক্তি অর্জ্জিত হচ্ছে, চেষ্টায় নয়, বিশ্বাসে; আসন প্রাণায়ামে নয়, অধ্যাত্ম চিন্তায়। সহস্র বন্ধন ও কর্ম্মের মধ্যেই বিশ্বাস আমার অচলপ্রতিষ্ঠ, ধ্যান অপ্রতিহত, জগৎপ্রাণ সমীরণের মত শ্বাসে প্রশ্বাসে বিশ্বের সঞ্চিত তপঃশক্তি আয়ত্ত করে' ছুটে চলেছে—আধার দিন দিন উপযোগী হ'য়ে উঠ্‌ছে, প্রতিদিনের নব নব প্রেরণা অবধারণের জন্য—সাধনার যে সকল প্রচলিত ক্রম বা বিধি আছে—সেগুলির প্রয়োজন আত্মপ্রকাশের পথে স্বতঃঅভ্যুদিত হবে, সাধনার ফলে আমার জীবন কোন দিনই দেবায়তন হয়ে উঠ্‌বে না—একথা আজ সকলেরই জানা উচিত।

* * *

তবে এগুলি কি? শাস্ত্রকথিত যমনিয়ম, অষ্টাঙ্গযোগ সাধনপ্রণালী একেবারেই কি অলীক—একথা আমরা বলি না, বরং এইসকল যোগপন্থায় মানুষের মন সবল ও সুস্থ হ'য়ে ওঠে, উচ্চধারণায় সমর্থ হয়। তবে আত্মাকে খণ্ড করে' দেখাই যাদের সাধনা তাদের পক্ষে এই সব প্রযুজ্য। আমার আত্মার পরিধি কেবল আমাকেই স্পর্শ করে' নেই, আমি বিশ্বাস করি, ধারণা কর্‌তে পারি, "সূত্রে মণিগণাইব", বহুর মধ্যেই আমি আছি, এবং বহুও আমার মধ্যেই আছেন, সাধনা আমার এইরূপ, সিদ্ধি আস্‌তে যত বিলম্বই হোক্, এ সত্য এ বৃহৎ ধারণা আমার বুকে যে জন্মের মত কে এঁকে দিয়েছে।

* * *

আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি, বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের অমর স্পর্শ—শুধু তাঁদের নাম কীর্ত্তনেই আত্মার তৃপ্তি হয় না, এই বুক দিয়ে তাঁদের ছোঁয়া পেতে চাই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাগানেই বিভোর হই না, তাঁর অমর প্রেমের আস্বাদ কর্‌তে চাই, জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম প্রচারেই আমার জীবন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না, আমি এই হাত দুখানা দিয়ে, তাঁর চরণ-কমল জড়িয়ে ধর্‌তে চাই, এই ভাবেই আমার জীবনের স্ফুরসৎ থাকে না, আবার যোগযাগ করি কখন?

* * *

চাই অতীতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—একটা জীবন্ত জলন্ত অনুভূতি—অটল অচল দৃঢ় বিশ্বাস। অতীত আমার কাছে মৃত নয়, লক্ষকোটী বাহু বিস্তার করে' সে আমার ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিচ্ছে, আর বর্ত্তমান ভবিষ্যতের দিব্যপ্রাসাদনির্ম্মাণের উদ্যোগপর্ব্ব, আমার সমস্ত জীবন সেথায় ধূলাবিলুণ্ঠিত, বুক আমার ভরে' গেছে—কর্ম্মেই—হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা, তুরীয়ের অপার্থিব জ্ঞান একত্র হ'য়ে ত্রিবেণীতীর্থে পরিণত হয়েছে—বাংলার ধর্ম্মসাধনার গোপনমন্ত্র এই তীর্থে বেদধ্বনির মত ঝঙ্কৃত—কানে কানে মানুষকে দীক্ষা দিবার প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে—গুরু আছেন—গুরুগিরির জয়ধ্বজা ধূলায় ধূসরিত—মানুষের সাধনা তাই এত সহজ হ'য়ে উঠেছে।

* * *

আপনাতে আপনি স্থির হ'য়ে বস্‌তে পার্‌লেই, স্থিরের দল একের সঙ্গে এসে মিশে যায়। পরিচয়ে, শাস্ত্রবচনে, যুক্তিতর্কে কারেও পেতে হয় না, আত্মজ্ঞানীর থাক্ আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলায় আত্মসাধনার অনেক ক্ষেত্র রচনা হচ্ছে। পথের মাঝে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের স্বর্ণপ্রাচীর যদি তুলে দেওয়া না হয়, তবে একদিন পাওয়াপাওয়ির মেলা বসে' যাবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বাংলার অসংখ্য প্রাণশক্তি, চুম্বক আকর্ষণে লৌহ-কীলকের মত, এক বিপুল শক্তিব্যূহের অন্তর্গত হবে। ভগবান্‌কে যে হৃদয়ে বসাতে পেরেছে, ভগবানের কাজেই তার নিষ্ঠা জ্ঞান এক হ'য়ে আস্‌বে, জীবনতন্ত্রী ভগবানের হাতেই মধুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে—বাংলার সকল সাধকশ্রেণীকেই আমরা স্ব স্ব পথে প্রবর্ত্তিত হতে' বলি, ডাকের দিনে যেন অচলায়তনের উঁচু প্রাচীর ভেঙ্গে তারা ঐ অসীম গগনের কোলে সীমাহীন প্রাঙ্গণে কোটীকণ্ঠে একটি প্রণব উচ্চারণ কর্‌তে পারে। এমন দিন যখন আস্‌বে, তখন পাওয়াপাওয়ির অমোঘ শক্তি দেখে' সারা জগৎ স্তম্ভিত হবে। আজ ইহা—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।

সমষ্টি-সাধনা

বাংলায় উৎসর্গমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যোগসাধক দ্রষ্টাস্বরূপে দেখিয়া যাইতেছে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র লীলালহরী, এ সকল মঙ্গলময়ের অদৃশ্য করস্পর্শে স্পষ্ট, উজ্জ্বল, মহিমামণ্ডিত; সর্ব্বগত, সর্ব্বদর্শী তিনি, এ ধারণা ধ্রুব ও অটল; নূতন বাংলার অন্তরপটে আত্মসমর্পণযোগ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

অশুদ্ধ আধার যোগশক্তি ধারণক্ষম নয়, যোগস্পর্শে পাপের অমঙ্গল-চিত্র ভিতর হইতে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত—দুর্নীতি, বঞ্চনা, আত্মদ্রোহ—যতকিছু অন্তঃশত্রু মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে, সমস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইয়াছে, সংগ্রাম আজ একজনের একটি পাপের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র মানবস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন চাই।

আত্মমুক্তির জন্য তপস্যা হইলে, তাহা অনেক সহজসাধ্য ছিল। একটি হৃদয় হইতে সয়তানের রাজসিংহাসন উৎপাটিত করিতে সয়তানকে যে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে হয়, বহুজনের হৃদয়সমষ্টি হইতে তাহা নির্ম্মূল করিতে হইলে, বিশ্বের অমঙ্গলশক্তির মর্ম্মস্থলে সহস্রগুণ অধিক বেদনা দান করিতে হইবেই, সুতরাং লক্ষশেলবিদ্ধ অন্তঃশত্রু মরিবার পূর্ব্বে সহস্র ফণা উদ্যত করিয়া রুদ্ররোষে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইবে, ইহা চিচিত্র নয়। এক-বার নয়, শতসহস্রবার একটি একটি অমঙ্গলপ্রভাবকে জয় করিতে হইবে, নিজের জন্য সংগ্রাম সমাপ্ত হইলেও সমষ্টিসাধকের পরিত্রাণ নাই, দীক্ষিত সমষ্টির জন্য বারম্বার একই জয়কে পুনর্জ্জয় করিতে হইবে।

ব্রত কঠোর, মানবসমষ্টির জন্য বিশ্বপাপের ব্যূহবদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া চলিব, এই বিরাট্ সঙ্কল্প যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বীরসাধকের জীবনে সংগ্রামের অন্ত নাই, গতানুগতিক দেশ, কাল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আমূল সমষ্টিস্বভাব, সবই তাঁহার প্রবল পরিপন্থী, তত্রাপি এই জন্যই সিদ্ধির অনুকূল শক্তিগুলিও তাঁহার সমধিক সাহায্যক্ষম, নিজের মুক্তি মোক্ষের জন্যই যে সাধক সাধনরত, তাঁহার নিজের একার শক্তিই তাঁহার সহায়মাত্র, কিন্তু সংঘের জন্য যাঁহার তপস্যা, সমষ্টির সম্মিলিত কল্যাণেচ্ছা তাঁর একার

মুষ্টিতে সহস্র মাতঙ্গের বলবিধান করিবে, মানবাত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যেই যিনি মঙ্গলহস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তিনি সমগ্র মানবসত্তার অজস্র আশীর্ব্বাদে ধন্য, বাহিরে স্বার্থবুদ্ধির বশে প্রাণপণ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, স্বয়ং অমঙ্গলেরও অন্তর্য্যামী দেবতা অন্তরাল হইতে তাঁহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

জাতির মুক্তিবিধানের জন্য যাঁহারা ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অসাধারণ চরিত্রসম্পন্ন হইতে হইবে, সাধনা জাতিগত বলিয়া প্রতি সাধকের দায়িত্বভার সহস্রগুণ গুরুতর, প্রাণের অশুদ্ধ উত্তেজনা মনোমুগ্ধকর আদর্শবেশে সজ্জিত হইয়া আসিলেও তাহার প্রলোভন মূত্রপূরীষের মত পরিত্যাজ্য, জাতির কর্ম্মসূত্র অনন্ত বিলম্বিত, একটি অসতর্ক পদক্ষেপের ফলে সমগ্র সমষ্টির জটিল কর্ম্মডোর আরও জটিলতর হইয়া উঠিবে, একার পাপে কালিমাস্তর সমস্ত সমষ্টির মুখে সংলিপ্ত হইবে, প্রায়শ্চিত্ত অখণ্ড সমষ্টিকেই করিতে হইবে বটে, কিন্তু যে রুদ্র তুষানল জ্বালিয়া সমষ্টি ব্যষ্টিকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইবে, তাহার জন্য যে মর্ম্মন্তুদ অন্তর্দাহ, তাহা হৃদয় পাতিয়াই সহ্য করিতে হইবে।

বাংলায় এই যে বিপুল সমষ্টিসাধনা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার গতি খুব ধীর মন্থর, কিন্তু তাহা অমোঘ অব্যর্থ, চপলচিত্তই অতি দ্রুত ফল প্রত্যাশা করে, এখনই এখানেই দেখিবার দেখাইবার মত একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে চায়, পতঙ্গপালের মত অসংখ্য ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মসাধনায় একটা সুখ আছে, আত্মতৃপ্তি আছে; কীর্ত্তনে, উৎসবে, প্রচারে, উচ্ছল ভাবপ্রবাহে বিমুগ্ধ তরলহৃদয় নরনারীকে দলে দলে একটি সাম্প্রদায়িক পতাকাতলে সমবেত করা কঠিন কর্ম্ম নয়, কিন্তু জাতিসৃষ্টির পথ এত সহজ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। অনন্ত অন্তরসংগ্রামের পর একটি একটি মানুষকে জানা ও পাওয়া যায়, এরূপ একটি আত্মার মিলনফলে যে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে, লক্ষ মানুষের সংখ্যাসংযোগে তাহার সহস্রাংশের এক ভাগও সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য প্রদীপহস্তে অসংখ্য সম্প্রদায় গড়িয়া উঠুক, ক্ষতি নাই, ব্যক্তি সমষ্টিশক্তিরই বিশেষ আধার, প্রতিভা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াই লীলাময় হইয়া উঠে, বাংলার ধর্ম্মজগতে স্তম্ভস্বরূপ যে সকল বিশিষ্ট কেন্দ্রসাধক জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে অধ্যাত্মশক্তি সন্নিবেশপূর্ব্বক দেশের বিপন্ন মতিকে ভাবস্থ করিয়াই তুলিতেছেন। বাংলার ধর্ম্মজাগরণ আশাময়, অন্তরের আলোকে বাঙ্গালী নূতন গতিপথ নির্ণয়

করিয়া লইবে, তাহারই অসংখ্য আয়োজন চলিয়াছে, অচিরে বাংলার তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যগগন প্রভাতকিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এমন আশা করা যায়।

কিন্তু বাঙ্গালীর মুক্তি সম্প্রদায়ে নয়, মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে নয়, সম্প্রদায় মানুষের প্রতিভাকে বেড়া দেয়, একটী কেন্দ্রপুরুষে সকলের তপঃ-প্রকাশ স্তূপীকৃত করিয়া ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ মাত্র প্রতিষ্ঠা করে; গুরু সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যবিন্দু, সমষ্টি সেই বিন্দুর বেষ্টনী, অহঙ্কারের বজ্রবন্ধনে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বর্গীয় সম্বন্ধ কুণ্ঠাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। যে গতানুগতিক গুরুভাব একটী আলোক-স্তম্ভের চতুষ্পার্শে সহস্র সহস্র প্রতিবিম্ব সংগ্রহ করিয়াই পরিতুষ্ট, তাহার ছায়াপাত হইতে এই মুহূর্ত্তে বাংলাকে মুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

উৎসর্গসিদ্ধ জীবনসমষ্টির ভিতরেই দিব্যসংঘ প্রকাশ হইবে। সে উৎসর্গের নিয়ম নাই, বিধান নাই, ব্রহ্মাণ্ডের বিধি তাহার চরণে প্রণত। প্রতি মানুষ একটী একটী শক্তিপিণ্ড, অনন্ত প্রেরণার আধার, বিশ্বের সৎ অসৎ সকল শক্তি সকল প্রভাব তাহার উপর অজস্রধারে অবতরণ করিতেছে, চাই অসীম ধারণসামর্থ্যবান্ বীরসাধক, যে উন্মাদের মত এই অনন্ত প্রেরণাপুঞ্জ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আত্মা, যুগে যুগে যাঁহারা মানবমঙ্গল উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই বিপুল তপঃশক্তি ভবিষ্য সাধকসমষ্টির জন্যই ভারে ভারে সঞ্চিত, সর্ব্বগত সমীরণের মত তাঁহাদের করুণাতুর হৃদয় আজও বিশ্বপথে সঞ্চরণ করিতেছে, একটি বিরাট্ আত্মার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অনন্তসূত্র ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত; রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, সেই অখণ্ড সত্তার ভিন্ন ভিন্ন যুগাবর্ত্ত, তাঁহাদের সেই অমর ভাবপ্রবাহ নূতন জাতির অন্তরে অমোঘ শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য উদগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, কে বিশ্বহিতব্রত শক্তিসাধক আছ, অহংশূন্য মুক্তহৃদয়ে দেবতার এই সহস্র কণ্ঠোত্থিত সহস্র নিমন্ত্রণমন্ত্র সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, সমগ্র অধ্যাত্মজগৎ তাঁহারই উপরে আশীর্ব্বাদবৃষ্টি করিবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষারত।

দিব্যসমষ্টি সৃষ্টির জন্য যে সাধনা, তাহাতে আড়ম্বর নাই, উপাধি আকার আশ্রয়ে তপঃশক্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, বিশ্বের অনন্ত ভাব অবধারণা করিতে হইলে, সকল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী চূর্ণ করিয়া মুক্তহৃদয়ে জয়ধ্বনি তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, সাধনার বন্ধনও বন্ধন, ধর্ম্মের স্বর্ণবেদিকার

উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধ্যাত্মিক অহঙ্কারও মুক্তির ঘোরতর অন্তরায়, সাধনার মায়াজাল এড়াইয়া বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে নিশ্চেষ্ট ও সমাহিত হউক, তাহার ভিতরে অনন্তশক্তির প্রতিভানির্ঝর আপন পুলকে খেলিতে আরম্ভ করুক, মানুষের অহংটুকু যেমন যেমন বিলুপ্ত হইবে, সে তেমনি তেমনি বিশ্বশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

অহং চূর্ণ করিবার জন্য শক্তির ডাক যাহার জীবনে পর্জ্জিয়া উঠে, সেই ব্যাকুল হৃদয়ের অনিবার্য্য আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মঙ্গলপ্রভাব ক্ষুরধার বাণীরূপে মানবকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, কোন্ এক অদৃশ্য বিধানসূত্রে পরিচালিত হইয়া মানুষ মানুষেরই ভিতরে নারায়ণের দিব্যদর্শন লাভ করে, মানুষেরই চরণে প্রেমোল্লাসে লুটাইয়া পড়ে, জগতের যাবতীয় শুভেচ্ছা ও আশীষপুঞ্জ যেন নিবিড়ঘন মূর্ত্তিময় হইয়া অকস্মাৎ তাহার পুরোভাগে আবির্ভূত হয়। আমার ঈশ্বরত্বের প্রভা যাঁহার ঈশ্বরত্বের স্পর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তিনিই গুরু, নিবিড় সম্বন্ধসূত্রে সেই ভাগবতস্পর্শ জাগ্রত হইয়া জীবনের উপর স্বর্গের আলো সঞ্চার করিয়া দিবে, জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তুলিবে, বিক্ষিপ্ত শক্তিস্রোতঃ সবলে আকর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রবেগে নূতন ধারায় প্রবর্ত্তিত করিবে। সেই মূর্ত্তিমান্ আশীর্ব্বাদ, সেই করুণাবিগ্রহ মানুষের নির্ম্মল ভক্তি, প্রেম, উৎসর্গের অভিষেকে অভিস্নাত হইয়া যেদিন উৎসর্গসমষ্টির কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত, সেইদিন মানুষের আত্মদান পূর্ণগৌরবে জয়যুক্ত হইয়াছে, অগ্নিসংযোগে অগ্নিকুণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যের আলোকপাতে লক্ষ ছায়াসূর্য্যের সৃষ্টি নয়, অন্তরপুরুষের জ্বলন্ত মহিমা প্রতি ব্যষ্টির অন্তরে অন্তরে দেদীপ্যমান হইয়া সমগ্র সমষ্টিকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এই অখণ্ড আত্মার অনর্গল প্রেরণাধারা ধারণ করিবার জন্য বাংলার অসংখ্য সাধক ভর্ত্তারূপে আধার শুধু প্রসারিত করিয়া দাও, অনুমন্তারূপে সম্মতি প্রদান কর, ভাগবতমহিমা সহস্রদলে মানবসমষ্টির অন্তরে প্রকাশ হউক, সাক্ষীরূপে দর্শন কর, অহং দূর হইয়া কি অপার্থিব শক্তি জাতির জীবনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, ভোক্তারূপে সেই তৃতীয় শক্তির সহিত গভীর প্রেমসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বিচিত্র রসাস্বাদনে দলে দলে ধন্য হও, মানবজগতে স্বর্গপ্রতিষ্ঠা অচিরে সম্ভব করিয়া তোল।

রয়েল ক্লেমেন্সীর জের

এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আন্দামান হইতে প্রত্যাগত বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনা করি। সাওথাত আলী, কিচলু, রামভুজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতি পাঞ্জাব নেতৃবর্গের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় সেদিন যে আড়ম্বর সৃষ্টি করা হইয়াছিল, বাংলার এই সকল দেশপ্রেমিকের মুক্তিতে তদপেক্ষা অধিক সমারোহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাঙ্গালী যেন আর হুজুগ করিয়া আত্মশক্তির অপব্যয় না করে। নীরব অভ্যর্থনায় হৃদয়বল গভীরভাবে প্রকাশ পায়, এক্ষেত্রে মনে রাখা চাই আমাদের এই সম্বর্দ্ধনা তাঁহাদের কর্ম্মের জন্য নহে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ এক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া নবযুগাগমনের সূচনা বিচিত্র রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে, নূতনজাতির নব ঊষা সমাগত, বাঙ্গালী নতজানু হইয়া আজিকার এই মুহূর্ত্তটীকে হৃদয় পাতিয়া বরণ করিয়া লও।

স্বদেশীযুগের প্রথম পর্ব্বের ইতিহাস নূতনজাতির নিকট অনেকখানি অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন; ইহাঁদের কর্ম্ম, চরিত্র, আদর্শ হইতে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার আছে, নবজাতিকে ধীরে ধীরে তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের বক্তব্য—সেদিন বড়লাট বাহাদুরের দরবারে মাননীয় পাটেল মহোদয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"The Governor-General may be pleased to give the fullest effect to the letter and spirit of the Royal Proclamation in regard to clemency to political offenders." অর্থাৎ "বড়লাট বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজনীতিক অপরাধীদের পূর্ণমুক্তি প্রদান করিয়া রাজাজ্ঞার মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বর্ণে বর্ণে সফল করুন।" প্রস্তাবটি সময়োচিত, আমরা পাটেল মহোদয়কে ইহার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই প্রস্তাবের উত্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিষ্টার ম্যাক্‌ফার্সণ যাহা বলিয়াছেন, আবশ্যকমত তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"He was authorised by His Excellency to say that he had no objection whatever to accept the resolution if it was presented purely as a recommendation of a general nature for mercy, but the speaker doubted if His Excellency would accept it, if there was any insinuation that the Royal Proclamation had been disobeyed." অর্থাৎ "বড়লাট সাহেব তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, এই-প্রস্তাবটি যদি করুণা প্রদর্শন সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা অনুরোধ মাত্র হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হয় নাই এরূপ দুষ্টাভাষ যদি ইহার ভিতরে থাকে, তবে বড়লাট যে কতদূর ইহা লইতে স্বীকৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ আছে।"

তারপর ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজানুগ্রহের পক্ষপাতী নহে বলিয়া, দেশে যে গুজব উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই—"The Royal message was framed after due consultation with the Government of India," অর্থাৎ "সম্রাটের ঘোষণা-বার্ত্তা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত যথোচিত পরামর্শ করিয়াই সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল।"

অতঃপর সকল রাজনৈতিক অপরাধীর মুক্তি সম্বন্ধে বলেন—"No one was more anxious than His Excellency that the new era, which had been introduced should begin under the most favourable auspices, and that the political atmosphere should be purged of all traces of bitterness. These were however never intended to be an open sesame that would let loose into the public every person, however dangerous, however unrepentant, and his crime however remote from things political. It was never the intention of his Majesty that under the amnesty indulgence should be extended to persons, who under the thin guise of political excitement had promised or committed serious crimes of violence such as murder, arson etc. Many of the prisoners had openly declared that if they were released, they would rekindle the embers of anarchism. It would therefore,

be an act of criminal folly on the part of the Government to let loose these microbes of the anarchist movement. We want no reign of terror in India." অর্থাৎ "বড়লাট বাহাদুর খুবই উৎসুক যে, যে নবযুগের সূত্রপাত করা হইয়াছে, তাহা অতি অনুকূল শুভলক্ষণাক্রান্ত করিয়াই প্রবর্ত্তিত হউক, এবং রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডল সকল প্রকার বিদ্বেষচিহ্ন হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত হউক। কিন্তু তাই বলিয়া এই সকলের উদ্দেশ্য এই নহে, যে, ভীষণ বিপজ্জনক, অননুতপ্ত এবং রাজনৈতিক গন্ধশূন্য দুষ্কার্য্যকারী যাহারা, তাহাদেরও ছাড়িয়া দিবার ইহা উপায়স্বরূপ হইবে। যাহারা রাজনীতিক উত্তেজনার ছদ্মবেশে হত্যা, অগ্নিদাহ ইত্যাকার গুরুতর অবৈধ কর্ম্ম করিতে সঙ্কল্প কিম্বা প্রকৃতই সম্পন্ন করিয়াছিল, এমন সকল লোককেও রাজাজ্ঞায় প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, সম্রাটের এরূপ অভিপ্রায় কখনই থাকিতে পারে না। বহুতর বন্দী প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়াছে, তাহারা মুক্ত হইলেই অরাজকতার বহ্নিকুণ্ড আবার জ্বালাইয়া তুলিবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সকল বিপ্লববীজকে ছাড়িয়া দেওয়া অতি অন্যায় রকমের মূর্খতার কাজ মাত্র হইবে। আমরা তো ভারতবর্ষে অশান্তি (Reign of terror) চাই না।"

আনন্দের বিষয়, অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি অনুরোধরূপেই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু উহার গ্রহণে রাজকর্ত্তৃপক্ষের তদ্বিষয়ক অনুমোদনই প্রকাশ পাইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইলে, প্রবর্ত্তকের আশা ষোলআনায় সিদ্ধ হইবে। অতঃপর রাজনীতিক বন্দী ও কয়েদী সকলেরই মুক্তি প্রত্যাশা করা দেশবাসীর পক্ষে অন্যায় হইবে না।

আমাদের আশা, যতশীঘ্র সম্ভব গবর্ণমেণ্ট বন্দীগণের মুক্তিবিধান করিবেন, বিলম্বে যথেষ্টই ভয়ের কারণ আছে, কেননা এই পাঁচ বৎসর কারাবাসের ফলে, যুবকগণের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহা ভয়াবহ ও মর্ম্মান্তিক। আমরা এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং যে যে কারণে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালনে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে, তাহার কথাও আলোচনা করিব।

১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বাংলায় ভারতরক্ষা আইনের প্রথম বন্দী। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে, তিনি মুক্তি

পাইয়াছেন। এই পাঁচ বৎসর কঠোর কারাবাস ফলে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একেবারেই মাটী হইয়া গিয়াছে। ২০এ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময়ে মুক্তিলাভ করিয়া, শনিবার প্রাতঃকালে তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বাহিরের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বাহিরের কয়েকটি শোচনীয় আঘাত তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠে, প্রথম, পাঁচ বৎসর পরে, পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার মাতাকে দুই ঘণ্টার জন্য মৃত্যুশয্যায় দর্শন, তারপর একেবারে প্রজ্জ্বলিত চুল্লির উপর শ্মশানে মাতৃদর্শন, তখন শ্রীশচন্দ্রের বন্দী অবস্থা। ইহার উপর পারিবারিক দারিদ্র্যের কথা। এই অশৌচ অবস্থাতেই শ্রীশচন্দ্রকে মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়, তাঁহার মাতৃবিয়োগে কাতর হৃদয় লইয়া চন্দননগরে স্নেহময়ী পিতৃব্যপত্নীর নিকট দৌড়াইয়া আসেন। ঠিক এইরূপ অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ভদ্রলোক আমাদের নিকট আসিয়া নিজের দুরবস্থার কাহিনী মর্ম্মন্তুদ ভাষায় বর্ণনা করেন, সোমবার সন্ধ্যার সময়ে, সহসা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে ক্ষিপ্ত হইয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়ান ও লোকজনের উপর অত্যাচার করেন, এক্ষণে এই পাঁচ বৎসর কারাবাসের পর হয়তো সারাজীবনই তাঁহাকে উন্মাদ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। শ্রীশচন্দ্রের মানসিক বল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা চন্দননগরবাসীর নিকট অবিদিত নহে। দীর্ঘ অবরুদ্ধতাই যে তাঁহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিল একথা না বলিলেও চলে।

একা শ্রীশচন্দ্র নহেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উচ্চ কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন যদি অনির্দ্দিষ্ট অভিযোগে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ হয়, উন্মাদরোগাধিকার তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। রাজনীতিক অভিযোগে যাঁহারা প্রকাশ্য আদালতে যথারীতি স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের একটা সান্ত্বনা ছিল, কেননা আমরা যে আইন আদালত মানিয়া লইয়াছি, তদনুসারে দণ্ডিত হইলে বলিবার বা অনুতাপ করিবার কিছুই থাকে না, কিন্তু অভিযোগের কারণ সম্যক্ প্রকারে জানা নাই, অথচ গবর্ণমেণ্টের পক্ষের অতি উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে সামান্য পেয়াদা পর্য্যন্ত অপরাধী স্থির করিয়া লইবে—ইহা সুস্থ মস্তিষ্কে অসহ্য হইয়া উঠে, এই কারণেই

আন্দামানে দ্বীপান্তরগত শত শত রাজনীতিক কয়েদীদের মধ্যে কয়েকজনমাত্র যুবকেরই উন্মাদদোষ অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই, কিন্তু ভারতরক্ষা আইনে আটক ছেলেদের মধ্যে জ্যোতিশ্চন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মাখনলাল পর্য্যন্ত কত প্রতিভাশালী যুবক উন্মাদ হইয়াছেন, নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, অনেকেই একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন একথাও মিথ্যা নহে।

গবর্ণমেণ্ট যখন ইহাদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন, কখনই তাঁহাদের এমন উদ্দেশ্য ছিল না, যে বন্দীগণ উন্মাদ হইয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ুক, অথবা আত্মহত্যা করিয়া এতবড় একটা গোলযোগের সৃষ্টি করুক, গবর্ণমেণ্ট দেশে অশান্তি দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন এবং যাঁহাদিগকে রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া তুলিবেন, বাহির হইতে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ হইলেও, অপর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। কেননা যাঁহারা বন্দী ছিলেন, তাঁহাদের মানসিক বলের যেমন যেমন হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদনুসারে কেহ বা অপরাধ স্বীকার করিয়া, কেহ বা একের বোঝা অপরের স্কন্ধে আরোপ করিয়া, আবার কেহ বা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত আত্মমর্য্যাদার হানিকর সর্ত্তে সহি করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, চরিত্র গড়িয়া উঠা দূরে থাকুক, মনের জোর ইহাঁদের একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বরং আমরা দেখিতে পাই, বাহিরে থাকিয়া স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মে যাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রবল যথেষ্টই বাড়িয়া গিয়াছে—এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিও ইহাদের প্রসারিত, জাতির সত্যপথটি ইহাঁরাই ধরিতে পারিয়াছেন, এই সাত আটশত বাংলার যুবক কারাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কোন্ পথে চলিবেন তাহার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইতেছেন, ইহা বড় আশার কথা নহে।

এই সকল আলোচনার এমন উদ্দেশ্য নহে, যে আমরা রাজশক্তির কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছি, তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় ইংরাজরাজকে কিছু ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে হইয়াছিল, বাহিরের গোলযোগ কালে, ভারতে আবার নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইলে রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, এইজন্য কঠোর শাসনই তখন শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইয়াছিল—ভাগ্যদোষে আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে।

এই দুরবস্থার লক্ষণ রাজাপ্রজার মধ্যে মিলনের পরিপন্থী। এইজন্যই আমরা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিকারের কথা বলিয়া আসিতেছি—তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, তখন আর আমাদের বলিবার কিছুই থাকিবে না, তবে, আজিকার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, এতদনুসারে সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি হইতে এখনও বিলম্ব ঘটিতে পারে। এই বিলম্বের কারণ, রাজশক্তির দিক হইতেই যে হইবে এরূপ নহে, কেননা মানুষ স্বভাবতঃ বাহিরের আচরণ দেখিয়াই কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, মনের অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখে না, বাংলায় যে পঁয়ত্রিশ জন ১৮১৮ সালের রেগুলেশন আইনে আটক আছেন, তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কিছু কিছু বুঝিয়াছি—তাহাই আমরা রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে চাই, আশা করি আমাদের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, এ্যাডিসেনেল সেক্রেটারী এবং ইন্‌টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্ত্তা ডিক্‌সন সাহেব যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন।

মুক্তিপ্রদানের কয়েকটী ব্যবস্থা আছে। প্রথম আত্মদোষ স্বীকার করা এবং তাহার জন্য অনুশোচনা, দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিব না, বরং যাহাদিগকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া জানিব, তাহাদের বিষয় রাজশক্তির গোচর করিব, রাজনীতিক সংশ্রবে থাকিব না, সংবাদ পত্রে লেখা বা বক্তৃতা করা, এ সকল করিব না ও চিরজীবন রাজভক্ত রহিব—আরও অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা থাকিতে পারে। এই দুইটি ব্যবস্থারই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেকেই উপরের ব্যবস্থানুযায়ী ছাড়ান পাইয়াছেন। তারপর রাজনীতিক সংশ্রব অর্থে, বৈধী আন্দোলন, রাজনীতিক সাহিত্যচর্চ্চা ধর্ম্মালোচনা এই সকল হইতে বঞ্চিত হইতে কোন বুদ্ধিমান্‌ই রাজী হইবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দীর্ঘ অবরোধে চিত্ত যাহাদের অবসন্ন তাহারা যেমন তেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তারপর একশ্রেণীর বন্দী যখন রাজনীতিক সাহিত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় হইতে বিরত হওয়ার কথায় আপত্তি তুলিলেন, তখন নূতন সর্ত্তে 'রাজনৈতিক' কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইল, এই সর্ত্তানুযায়ী অনেকেই বাহির হইয়াছেন। এক্ষণে অবশিষ্ট বন্দীগণের মানসিক অবস্থা কিছু ভিন্নরূপ, উঁহারা বলিতে চাহেন, বিপ্লববাদ করিব না, রাজভক্ত থাকিব ইত্যাদি সর্ত্তে সহি করা অর্থে, আমরা যেন বিপ্লববাদী এবং রাজবিদ্বেষী

ছিলাম, যখন বিনা লেখাপড়ায় ধৃত হইয়াছি তখন লেখাপড়ার সর্ত্তে বাহির হইতে প্রস্তুত নহি।

কথাটা কতটা সমীচিন ভাবিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে নির্দ্দোষী বড় কাহাকেও ধরা হয় নাই, অতএব তাঁহাদের মতে সকলেই অপরাধী, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ হইতে জেদ রক্ষার জন্য এই পঁয়ত্রিশজন বন্দীর মুক্তিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মেদিনীপুর জেলে শরৎচন্দ্র গুহ নামক কোন ভদ্রলোক সাংসারিক চিন্তায় কিছু বিষণ্ণ হইয়া বর্ত্তমান সর্ত্তে সহি করিয়া মুক্তিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মদোষ স্বীকার ও অতীত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে বলায়, তিনি মুক্তির অপেক্ষা বন্ধনকেই শ্রেয়ঃ করিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য আরও কিছুদিন আটক থাকিলে মানসিক বল হ্রাস হইয়া পড়িবে, তখন খুব সম্ভব সত্যই তিনি অপরাধী হউন, আর না হউন, এই ব্যবস্থানুসারেই মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু মানুষের moral নষ্ট হইলে, সমাজের ভারস্বরূপ তাহাকে চিরদিনই দুঃখময় জীবন বহন করিতে হইবে। রাজার জাতি এবং প্রজার জাতি বলিয়া মানসিক উপাদানের কোনরূপ ভিন্নতা নাই, রাজকর্তৃপক্ষগণ মানুষের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যদি অবিলম্বে এই পঁয়ত্রিশজন বন্দীকে মুক্তি দেন, তাহা হইলে হয়তো এখনও ইহাঁরা বাহিরে আসিয়া মানুষের মত জীবন অতিবাহন করিতে পারিবেন, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে মুক্তি পাইতে পারেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের মত শোচনীয় অবস্থা যে তাঁহাদের না হইবে একথা কে বলিতে পারে?

অবশ্যই এমন কথা যদি কেহ বলিয়া থাকেন, যে আমরা বাহির হইলেই বিপ্লববাদীর দল পুষ্ট করিব, তাঁহারা প্রকৃতই মনের সমতা নষ্ট করিয়াছেন, কারাক্লেশে অতিষ্ঠ হইয়া গবর্ণমেণ্টের যে কোন সর্ত্তে সহি করিয়া যাঁহারা বাহির হইয়াছেন, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই যা তা করিবার সম্ভাবনা অধিক, যাঁহাদের মানসিক বল আছে, চরিত্রবল অটুট রাখিবার সঙ্কল্প আছে, বাহিরের আবহাওয়ায় তাঁহারাই সত্যপথ ধরিয়া চলিতে সমর্থ হইবেন, অন্ততঃ আমাদের এইরূপই মনে হয়। আজ যাঁহারা অন্তরীণ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপোষণের জন্য চতুর্দ্দিকে হা হা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের মানসিক বলের অভাব আছে বলিয়াই

মনে হয়। চন্দননগরে এমন কয়েকজন আছেন, এই ভারতরক্ষা আইনের ফলে তাঁহারা বন্দীর মতই এতদিন কালহরণ করিয়া আসিতেছেন, মূলধনও তাঁহাদের বড় ছিল না, স্বীয় যোগ্যতাপ্রভাবে আত্মপোষণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহাদের করিতে হয় নাই, দেশে এখনও প্রচুর আহার আছে, কল্পনায় দিব্য সৌধ নির্ম্মাণ করিলে ফলে বিশেষ কিছু হইবে না, চাই অবস্থামত ব্যবস্থা করিবার সাহস ও সামর্থ্য, প্রয়োজন হইলে দশ টাকার তরিতরকারী বেচিয়া কিনিয়া দিন গুজরাণ করাও লোকের দ্বারে দ্বারে চাকুরী প্রার্থনার চেয়ে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি।

অবান্তর কথা ছাড়িয়া, বক্তব্য বিষয়ের অবশিষ্টাংশ বলি—আমরা ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবের উক্তিতেও অনুতাপ করার কথা উল্লেখ দেখিলাম। যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতাপ মন হইতেই আসিতে পারে—বাহিরের চাপে এই অনুতাপের উদয় প্রচেষ্টা আমাদের হাস্যজনক বলিয়াই মনে হয়, মুক্তিলাভের আকাঙ্খার মাত্রাবৃদ্ধি অনুসারে, শুধু অনুতাপ কেন, তাহাদের নাকে খৎ দিতে বলিলেও, তাহারা আপত্তি করিবে না, ইহা তো উন্মাদ করিবার উপায় মাত্র, সুসভ্য ইংরাজজাতির নিকট হইতে একটু সুবিধির আশা কি দুরাশায় পরিণত হইবে?

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ধারণায় যাহাই হউন, যাঁহারা নিজেদিগকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা কি অপরাধ করিয়াছেন, যে স্বীকার করিবেন?, অথবা তাঁহারা অনুতাপ করিবেন কেন? এক্ষেত্রে রাজানুশাসনের কঠোর পেষণে তাঁহাদিগের মানসিক মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া অপরাধ স্বীকার বা অনুতাপ করাইবার প্রচেষ্টা ভয়ঙ্কর নহে কি? যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের মতানুসারে সত্য সত্যই অপরাধী, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে সেই সেই অপরাধের বিচার পূর্ব্বক দণ্ড দেওয়া হউক, তাহাতে কাহারও কিছু আপত্তি করিবার নাই, ন্যায়ের বিধান স্বীকার করিয়া শতবার জেলে যাওয়া এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অবরোধের চেয়ে বাঞ্ছনীয়, প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন পুরুষ এইরূপই চিন্তা করিবেন, সন্দেহ নাই, ইহাদিগকে হয় দেশের প্রতিষ্ঠিত আইনের কষ্টিপাথরে বিচারিত হইবার সুযোগ দেওয়া হউক, নতুবা নিরপরাধ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে মুক্তিপ্রদান করা হউক—কথা উঠিয়াছে রাজবন্দীদের লইয়াই, রাজনৈতিক অপরাধীগণের উপর রাজাজ্ঞার প্রয়োগ করুণাপ্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু এই সকল রাজবন্দী, তাঁহারা

অপরাধী হউন অথবা নিষ্কলঙ্ক হউন, রয়েল ক্লেমেন্সী পূর্ণমাত্রায় দাবী করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী, এই অপ্রমাণিতচরিত্র রাজবন্দীগণকে এক্ষণে অবিলম্বেই মুক্তিদান করা উচিত। দেশের বুকে একটী তপ্তশেল বিঁধিয়া থাকিতে সম্রাটের কণ্ঠোচ্চারিত নূতন সন্ধিযুগের প্রবর্ত্তনা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমরা শুনিতে পাই, উন্মাদ ও আত্মহত্যা করার কারণ অবরোধ নহে। মাখনলাল আত্মহত্যা করিয়াছেন, স্বজনের নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া, নরেন্দ্র উন্মাদ হইয়াছেন আত্মগ্লানি স্মরণ করিয়া, জ্যোতিশ্চন্দ্র আত্ম-দোষে বহু ব্যক্তির দুর্দ্দশা সংঘটন ঘটিবে বুঝিয়া, এইরূপ প্রতি ঘটনার অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু অবরোধের মধ্যে জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, উচ্চ আদর্শ আছে, তাঁহাদের অবরোধ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইলে, নৈরাশ্যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। কারাযন্ত্রণা সহস্রগুণ শ্রেয়ঃ এরূপ আটকের চেয়ে, কেননা উহাতে জানা থাকে কতদিন আমায় এরূপ ভোগ করিতে হইবে, একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় কাল পূর্ণ হইলে আবার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইব, সে দুই বৎসরই হউক আর দ্বাদশ বৎসরই হউক।

দ্বীপান্তরে দুঃসহ কারাক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইন্দুর ও উল্লাসের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাঁহারা বিধিমতে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতি নিষ্ঠুর হইলেও, সে দণ্ডের বিরুদ্ধে করুণাভিক্ষা ছাড়া প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু আজ অবরুদ্ধ ছেলেদের মধ্যে এই যে মস্তিষ্কবিকৃতি ও আত্মহত্যা উপর্য্যুপরি অনেকগুলি ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী কে? সংশয়মাত্র নির্ভরতায় যাঁহাদিগকে আত্মীয়স্বজনের স্নেহনীড় হইতে বঞ্চিত করিয়া অবরোধে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের একথা বলিবার খুবই কারণ আছে, এই অবরোধকালের জন্য তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য সকল দায়িত্বভারই গবর্ণমেণ্ট নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, এই মস্তিষ্কবিকৃতি যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয়াধীন ঘটিয়াছে, হয়তো মাতা ভগ্নী পত্নীর স্নেহময় আশ্রয়ে থাকিলে এরূপ শোচনীয় ঘটনা কিছুতেই সম্ভব হইত না, হইলেও তাঁহাদের সেবাময় করপল্লবস্পর্শে অচিরেই ব্যাধির উপশম হইতে পারিত, হয়তো তাহা হইলে ঐ রকমে অকালমৃত্যু

ঘটিবার কোনই কারণ উপস্থিত হইত কি না সন্দেহ, দেশবাসী সরল হৃদয়ে এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার কি উত্তর দিবেন ?

আমাদের বিশ্বাস, রয়েল ক্লেমেন্সী ঘোষণার পর আবার লাট দরবারে পেটেল মহোদয়ের মন্তব্য গৃহীত হওয়ায় অচিরেই সকল রাজনীতিক বন্দী মুক্তি পাইবেন, গবর্ণমেণ্ট চাহেন না যে ভারত অশান্তি উপদ্রবের লীলাভূমি হয়, অন্ততঃ বাংলাদেশও আজ তাহাই চাহে, বাঙ্গালী আজ অন্তরদর্শী, বাহিরের অশান্তি অরাজকতায় দেশের মুক্তি অসম্ভব একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াই বাঙ্গালী আজ আত্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাই বাংলার বিপ্লবযুগের ধর্ম্মপুরোহিত উপেন্দ্রনাথের মুখেও এমন কথা শুনি—"তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই কোন্ পথে আমাদের মুক্তি পাইতে হইবে, পথ ছিল অন্ধকার, কিন্তু কে যেন অনেক কিছু করাইয়া লইয়াছে, এক্ষণে বুঝিতেছি—অহঙ্কারের শেষ করিবার জন্য উহাই হইয়াছিল আমাদের সাধনা, এই দ্বাদশ বর্ষের তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই, চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবানের যন্ত্র হইয়া থাকিব।"

গবর্ণমেণ্টও চাহেন নবযুগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে, বাংলার নূতনজাতি ভগবান্-কেই জীবনময় ছড়াইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প, এই ইচ্ছার বিপরীতে খণ্ডবুদ্ধি দুই চারি-জনের বিপ্লবপ্রচেষ্টা দেশে অশান্তিসৃষ্টি কোন মতে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবে না, একথা আজ তিন বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, আজও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি—এই সকল বিষয় লইয়া আর আমাদের লেখনী চালনা করিতে যাহাতে না হয় এমন ব্যবস্থা অচিরেই দেখিব, এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না কি ?

তারপর দেশের লোক আজ সত্যই বাংলার তপঃশক্তির বহিঃপরিচয় না পাইয়া বাহিরের আড়ম্বরটাকেই জীবন বলিয়া অনুভব করিতেছে, কিন্তু উহাতে জাতির জীবনীশক্তি তো প্রকাশ হইয়া পড়িবে না, বরং উহার অপচয় হইবে, নূতনজাতির জীবনে সনাতন প্রভাব যাহাতে দিন দিন জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহারই সাধনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে, বাংলাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাগবতবন্যার তরঙ্গ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইবে, প্রকৃতির নিভৃত আলয়ে তাহারই বিরাট্ অনুষ্ঠান চলিতেছে—বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে দেশের ভবিষ্যৎ-দর্শন অসম্ভব তো বটেই, উপরন্তু উহারা যে হতবুদ্ধি হইয়া সংস্কারক্ষয় করিবার জন্য পুরাতন শব জড়াইয়া কিছুকাল হাহাকার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সন্দিগ্ধের প্রশ্ন

কোন্‌টি যে মায়া আহা কোন্‌টি যে তুমি ?
স্বপনেরই মাঝে বঁধু
স্বপন রচেছ শুধু
কত মুখ তুয়া জ্ঞানে ফেলিনু যে চুমি।

রহস্য নগরে খোল কত যে দুয়ার !
গৃহ হ'তে গৃহান্তরে
কি সুখ পুলক ভরে
কুসুম শয়নে তোরে খুঁজি অনিবার।

কোথা তুমি নাই ওগো আছ কতদূরে ?
সাগরের মীন হই
বাঁচি না যে জল বই
সে সুধা-সলিল পাই অন্তরে বাহিরে।

হারায়েছি পেয়েছি বা আজো বুঝি নাই।
চাহি যাহা পাগলিনী
হইয়ে মুকুরখানি
সে পরম মুখ নাকি জগতে দেখাই।

কে তোমার পর প্রিয় কে বড় আপন ?
সব মন দল গুলি
স্তবকে স্তবকে মিলি
রচেছি কমল ফুল তোমারে মোহন।

লইতে আদরে নাম ফুরাইল ভাষা।
হলো না যে বলা তবু
কে তুমি কে তুমি প্রভু
জনমি জনমি শুধু বাড়িল পিয়াসা।

আমি দিব ধরা কিবা আসিবে গো বুকে ?
অলি কি গুঞ্জরি মরে
তাই কলি ফুটে পড়ে
অথবা কুসুম তারে ডাকে গো অলখে ?

এই শোভা যাত্রা বঁধু কার ঘরে যায় ?
দাসীরে লইতে শেষে
আসিছ কি বর বেশে ?
মোরে কি তোমার ঘর করিতে পাঠায় ?

অরবিন্দ

১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে একদিন প্রাতঃকালে শোনা গেল, অরবিন্দবাবু সহসা "ধর্ম্ম" অফিস হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ১২ই চৈত্র তাঁহারই পরিচালিত কর্ম্মযোগিনে এতদ্‌সম্বন্ধে যে সংবাদটুকু বাহির হইয়াছিল তাহা এই—"We are greatly astonished to learn from the local press that Sj. Aurobindo Ghose has disappeared from Calcutta and is now interviewing the Mahatmas in Tibet. We are ourselves unaware of this mysterious disappearance. As a matter of fact Sj. Aurobindo is in our midst and if he is doing any astral business with Kuthumi or any of the other great Rishis, the fact is unknown to his other koshas. Only as he requires perfect solitude and freedom from disturbances for his Sadhana for sometime, his address is being kept a strict secret. This is the only foundation for the remarkable rumour which the vigourous imagination of a local contemporary has set afloating."

মর্ম্মার্থ—"স্থানীয় সহযোগীগুলিতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কলিকাতা হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং এক্ষণে তিব্বতের মহাত্মাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন, খবরটি শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা নিজেরা তাঁহার এই রহস্যময় নিরুদ্দেশের বিষয় অনবগত। প্রকৃতপক্ষে, অরবিন্দবাবু এক্ষণে আমাদেরই মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এবং যদিই বা তিনি কুতুমি বা অন্য কোন মহর্ষির সঙ্গে যোগরহস্য লইয়া

নিমগ্ন থাকেন, তাহা তাঁহার পার্ষদগণের জ্ঞানাতীত। কেবল তাঁহার সাধনার জন্য কিছুকালের মত নির্জ্জনবাস এবং বাহিরের গোলমাল হইতে বিরতির প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার ঠিকানা বিশিষ্টরূপে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। একখানি স্থানীয় সহযোগীর সজীব কল্পনা এই যে ঘোরাল রকমের জনরবটির জন্মদান করিয়াছে, এইটুকু ছাড়া তাহার ভিত্তিমূলে অন্য কিছুই নাই।"

আলিপুরের বোমার মামলা এই সময়ে শেষ হইয়া গিয়াছে, দেশে অশান্তি উপদ্রবের ধূমায়িত বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, লর্ড মিণ্টোর কঠোর শাসনে জাতীয় পক্ষ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; ভারতের রাষ্ট্রগগনে একা অরবিন্দ বাবু তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন, সহসা এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে অপসৃত হইয়া তাঁহার আত্মগোপন অনেকের মনে নানা সংশয়ের উদ্রেক করিয়াছিল। কেহ ভাবিয়াছিলেন তিনি হিমালয় যাত্রা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ, তাঁহার এই অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের কারণ ভয় ভিন্ন যে আর কিছুই নহে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, তখন ভারতরক্ষার আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এবং কর্ম্মযোগিনের মকদ্দমার আভাসও পাওয়া যায় নাই, তিনি প্রস্থান করিলে পর, কর্ম্মযোগিনে Open letter to my countrymen প্রবন্ধ লইয়া তাহার অন্বেষণ আরম্ভ হইল, মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলিতে লাগিল। কলিকাতার উচ্চ আদালতে ফ্লেচার সাহেবের বিচারে উক্ত প্রবন্ধ রাজবিদ্রোহসূচক নহে বলিয়া যে দিন রায় বাহির হইল, ঠিক সেই দিন প্রাতঃকালে, মাদ্রাজের "হিন্দু" নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রে অরবিন্দ বাবু আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাজনে যে গুজব রটাইয়াছিল, তাহা আমূল উপাড়িয়া পড়িল, দেশবাসী জানিতে পারিল, তিনি পণ্ডিচারীতে নির্জ্জনবাস করিতেছেন, গোপনে নহে প্রকাশ্যে।

বাংলায় বিপ্লববাদীর দল এই সময় খুবই প্রবল হইয়া উঠে, খানাতল্লাসী, ধর্‌পাকড় খুবই চলিতে থাকে, বাঙ্গালীজাতির মনে এই সময় ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সঞ্চার হয়, ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত অরবিন্দ বাবুর নাম করিলে,বাঙ্গালীকে কানে অঙ্গুল দিয়া শিহরিয়া সরিয়া যাইতে দেখিয়াছি, "প্রবর্ত্তকের" উপর পৃষ্ঠায় অরবিন্দবাবুর নামসম্বলিত "আর্য্য"-

পত্রিকার বিজ্ঞাপন থাকায় অনেকেই গ্রাহক হইতে অসম্মত হইতেন, অরবিন্দ বাবুর বর্ত্তমানছবিসমন্বিত "অরবিন্দের পত্র" পুস্তিকা সভয়ে লোকে খরিদ করিত, এইরূপ অবসাদগ্রস্ত বাঙ্গালীর জীবনের তলে তলে কিন্তু তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তির প্রবাহ প্রচ্ছন্ন থাকিত, নানা ঘটনায় ইহা ফুটিয়া বাহির হইত। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার নাম করিতে সে সময় কেহ বড় সাহস করিত না, এইরূপে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

রণ ক্ষান্ত হওয়ায়, ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া যাইবার অনতিপূর্ব্বেই, সম্রাটের আদেশে উহা এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। দলে দলে রাজনীতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিতেছে; লালা লাজপত রায় ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, বিপ্লবযুগের কর্ণধার বারীন্দ্রকুমার আজ মুক্ত স্বাধীন, এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর সুপ্ত অরবিন্দপ্রীতি স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠিবার কথা, সেদিন "পত্রিকায়" নিভৃত চিন্তারত কোন ভদ্রলোকের পত্রে বুঝিলাম, অরবিন্দবাবুর সম্মান রক্ষার জন্য, এবার মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সমিতিতে তাঁহাকে সভাপতি করা হউক। যদি তিনি আসিতে চাহেন তবে এই মুহূর্ত্তেই বাঙ্গালী সদলবলে পণ্ডিচারী হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসুক, অন্যথা, মহম্মদ আলির অবর্ত্তমানে মুসলমান কন্‌ফারেন্সে তো তাঁহার জন্য শূন্য আসন রাখা হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও এইরূপ বিধানে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শিত হউক, নিভৃত চিন্তাশীলের চিন্তার দৌড় দেখিয়া প্রীত হইলাম বৈকি!

কথাটা এই পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইলে বলিবার কিছুই ছিল না, সম্প্রতি রংপুর হইতে তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, অতঃপর বাংলার সর্ব্বস্থান হইতে ইহার ধুয়া উঠিবে, ইহা অসম্ভব নহে—আরও শুনিলাম, রাজনৈতিক নেতৃগণ পণ্ডিচারী রওনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বারীন্দ্রকুমার নাকি ইহাঁদের নিরস্ত করিয়াছেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালীজাতি অরবিন্দ বাবুকে সংযুক্ত করিয়া অন্যান্য নেতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আজ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে—এই কথাটা অন্ততঃ অরবিন্দ বাবুর কর্ণগোচর হওয়ায় প্রয়োজন, তাঁহার স্বদেশানুরাগ দেশের চক্ষে অবজ্ঞাত নহে তবে দেশ ঘটনাচক্রে তাহার সম্বন্ধে নীরব থাকিবে বাধ্য হইয়াছিল।

রাজকর্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে দেশের আবহাওয়ার যথেষ্টই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অরবিন্দ বাবুকে নেতৃস্বরূপ বরণ করিয়া আবার এক নূতন হুজুগে

মাতিলে উপস্থিত বিপদের বড় সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, এতদ্ব্যতীত দেশনেতৃগণের মধ্যে সকলেই প্রায় দেশবাসীর হাততালি পাইয়াছেন—অরবিন্দকে লইয়া বড় সেরূপ কিছু ঘটিয়া উঠে নাই, জাতীয় পক্ষের বিপিনচন্দ্র ছয় মাস বিনাপরিশ্রমে কারাক্লেশ ভোগ করিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখনও যেমন অভ্যর্থনার ধূম দেখা গিয়াছিল, বাসন্তীকেও কংগ্রেসে সভানেত্রীর আসনে বরণ করিয়া অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটী করা হয় নাই, আবার লর্ড সিংহ ও ভূপেন্দ্রনাথের ভাগ্যেও ইহার অভাব হয় নাই, সেদিন সাওখাত আলী প্রভৃতি নেতৃগণের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতিকে ইহার সঙ্গে যুথিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবার নাকি যথেষ্টই প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু দশ বৎসর দ্বীপান্তরে বাস করিয়া বারীন্দ্রকুমারের এইরূপ রসভোগে বড় বিতৃষ্ণা, তাই বহু অন্বেষণেও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই, এইবার অরবিন্দ বাবুর পালা, যথারীতি লর্ড সিংহ প্রভৃতি দেশপ্রেমিকের মত তাঁহাকেও একবার বাঙ্গালী অভ্যর্থনা করিতে চাহে, কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মত হইবেন কি?

সত্য কথা—আজ বাঙ্গালী অরবিন্দকে চাহে—ইহাতে আর কোনরূপ দ্বিধা নাই, কেবল যে রাজনীতিক পাণ্ডাদিগের কথাই বলিতেছি এরূপ নহে, দেশের তরুণজাতি অরবিন্দ বাবুর নেতৃত্বে অসঙ্কোচে চালিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে—আমরা এই নূতনজাতিকে উদ্দেশ করিয়াই গোটাকতক কথা বলিব। কেননা বাংলার রাজনীতিক সাধনার যে ভঙ্গী, তাহা অবিকল পূর্ব্বপ্রথামতই চলিতেছে, সেক্ষেত্রে অরবিন্দ বাবু আসিয়া যে দেশের কিছু উপকার করিতে পারিবেন আমাদের এমন বিশ্বাস নাই।

কিন্তু আজ যে নূতনের দল অরবিন্দবাবুকে চাহিতেছেন, তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত, আলিপুরের মামলা হইতে এই দ্বাদশ বৎসর তিনি যে তপস্যা করিলেন, তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ট পরিচয় না করিতে পারিলে হাটে মামা হারাইবার মতই তাঁহাকে পাইয়াও বাঙালী হতাশ হইবে, একথা খুব জোর করিয়াই বলিতে পারি। অরবিন্দবাবুর রাজনীতিক সাধনার মধ্যে তাঁহার যে জীবনপরিচয়, তাহা সংস্কার ক্ষয়ের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মাত্র। শিশুজীবনে, দুর্জ্জয়লিঙ্গের উচ্চ হিমাদ্রিশিখরে যে নূতন জ্যোতিঃ-দর্শনে তিনি ভূপতিত হইয়াছিলেন, সেই অপার্থিব দৈবী আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে আজ যে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন,

তাহা বুঝিয়া উঠিবার জন্য বাঙালীকেও নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। ভারতে পদার্পণ করিয়া, নর্ম্মদাতীরবাসী তপস্বী ব্রহ্মানন্দ, যোগসিদ্ধ লেলে, বশিষ্ঠশিষ্য কুতুমি প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সংশ্রবে আসিয়া তিনি যে আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছেন, বিশ্বশক্তির তরঙ্গহিল্লোল আকণ্ঠপান করিয়া তিনি আপনহারা হইয়া যে এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানপ্রচেষ্টা উদ্ভ্রান্ত বাঙালীর পক্ষে সময়ের অপব্যয় বলিয়াই মনে হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এই কয়বৎসর ধরিয়া তিনি যে নূতন যোগ প্রচার করিতেছেন, আজ যাঁহারা অরবিন্দবাবুকে চাহেন, তাঁহারা তাহার সন্ধান রাখেন কি? অরবিন্দ বাবু মানুষ হিসাবে যে কিছুই নহেন, অপর সকলের মত একদিন নশ্বর জীবন শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহার অমর আত্মার নূতন বাণী শুনিবার মত বাঙালী তোমরা কয়জন প্রস্তুত হইয়াছ? কয়জন চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য, তাঁহার যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছ? বাংলার যে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম, তাহা যাহা ছিল, তাহা আর নাই, পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই কথাই যে আমারা বলিয়া আসিতেছি—এখনও সময় আছে—বাঙালী যোগপথ অনুসরণ কর। অরবিন্দবাবু তাঁর বড় সাধের বাংলা দেশ পরিত্যাগ কালে কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা কি তোমরা স্মরণ রাখিয়াছ? "The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised. The truth of the future that Bijoy Goswami hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disciples. A less discrete revelation prepares, a more concrete force manifests, but where it comes, when it comes, none knoweth."

অর্থাৎ "দক্ষিণেশ্বরে যে কার্য্যের সূচনা হইয়াছে তাহা পরিসমাপ্ত হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে, এমন কি লোকে এখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতেও পারে নাই। বিবেকানন্দ যে ব্রতভার পাইয়া পরিপক্ক করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বস্তুগত হইয়া উঠে নাই। বিজয়-কৃষ্ণের ভিতরে যে ভবিষ্যতের গোপনসত্য প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের সমীপে এখনও সম্যক্‌রূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই। নিবিড়তর

সত্যপ্রকাশ পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, বিশিষ্টতর শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কোথায়, কখন তাহার পূর্ণ আগমন ঘটিবে কে জানে?"

ধর্ম্মপ্রধান ভারতে নূতন যুগাগমনের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহা কত মহান্, কত বিরাট্, বুদ্ধি তাহা অধিগম্য করিতে অক্ষম। বুদ্ধের পর হইতে ভারতে আজ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মবন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা কত প্রবল কত বিপুল স্রোতে যে ভারতবর্ষ এবার বিধৌত হইবে, তাহা যাঁহারা রামকৃষ্ণ ও গোস্বামীর পদতলে বসিয়া কিছুমাত্র সত্য আভাস পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন; তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন, আর আজ যাঁহারা নূতন যুগে নূতন স্রোতে অবগাহন করিয়া নূতন মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিন বুঝিতেছেন, কি অভাবনীয় শক্তিতরঙ্গে জীবনের দুইকূল ভাঙ্গিয়া মানবজীবনেই অসীমের সন্ধান মিলিতেছে।

অরবিন্দ বাবু আসিবেন, কিন্তু মনে রাখিও তিনি আর জাতিবিশেষের নহেন, ধর্ম্মবিশেষের নহেন, সম্প্রদায়বিশেষের নহেন, তিনি বিশ্বের; ধর্ম্মভূমি ভারতের উন্নতি অবনতি, মানুষের চিন্তায় কর্ম্মে কোন কালেই নির্ণীত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, ভাগবতবিধান মান্য করিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণতলে মুক্তহৃদয়ে উপবেশন কর—অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশ হইবে, ভগবান্‌ও যেমন বাক্য মনের অতীত, ভাগবত কর্ম্মও তদ্রূপ, আত্মোৎসর্গে জীবনপ্রকাশ সফল হইবে, কল্পনার ও আশার ছলনায় দৌড়াদৌড়ি করিলে কি হইবে?

সাধন-মন্ত্র

দর্শন দেয় মাত্র আলো, শক্তির জন্য চাই সাধনা। বিশ্বাসেই সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সাধকের সাধনা আত্মাকে ভগবান্‌কে জানিবার জন্য, বিশ্বাস সেখানে মাত্র অঙ্গুলীনির্দ্দেশে জানাইয়া দিতেছে, এখান হইতে ঐখানে যাইতে হইবে, এখানে শরীর, প্রাণ, মন, ওখানে অজর অমর আত্মা, ইহ হইতে অমৃত্র, জগৎ হইতে ব্রহ্মে মহাপ্রস্থানই সাধকের লক্ষ্য। সিদ্ধেরও সাধনা আছে, সিদ্ধিকে ক্রমপ্রকাশ করিবার জন্য। ভগবৎসিদ্ধ পুরুষ উল্টা মুখে ফিরিতেছেন, ভগবানের দিক হইতে তিনি আসিতেছেন জগতের দিকে, ভগবান্‌কেই মন ও প্রাণের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে শরীরী করিয়া তুলিবেন। সাধকের যাত্রা নীচে হইতে উপরে, ঊর্দ্ধে ভগবানের দিকে, এই জরামৃত্যুশোকাকীর্ণ অপূর্ণ লোক হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া নিত্য শান্তিধামে উঠিয়া যাওয়াই তাঁহার সমস্ত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রয়াসের মর্ম্মগত উদ্দেশ্য ও কথা, সিদ্ধের থাক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন অধঃস্তরে, তুরীয়ের অমৃতসলিল ভারে ভারে টানিয়া আনিয়া ধরণীকে নব সঞ্জীবিত করিবার প্রেরণা লইয়াই তাঁহাদের জন্ম। সিদ্ধের দৃঢ় ও অচল বিশ্বাস—ভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে আমার ভিতরে জাজ্বল্যমান, অশুদ্ধ জীবাধারে কেবল তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, মন, প্রাণ, শরীরের খণ্ড সীমা ঘুচাইয়া ভিতর হইতে দিব্য অঙ্গপ্রভা রূপে রসে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে বাহিরে চিত্রবিচিত্র করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ভাগবত প্রকাশই সিদ্ধের সাধনার লক্ষ্য।

* * *

বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কাহারও একদিনেই সুসিদ্ধ হয়, কাহারও বহু আয়াসসাপেক্ষ। একটি দৃষ্টিপাতে কাহারও আমূল জীবনপরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, কাহারও শত জীবনে, সহস্র প্রয়াসের পর। বিশ্বাস passive শক্তির বিদ্যুদাধার, অনন্ত শক্তির উৎস হইলেও, একা বিশ্বাস

জীবনকে গতিদান করিতে পারে না। শ্রদ্ধার সঙ্গে চাই ইচ্ছা। শ্রদ্ধা ও ইচ্ছা একই সামগ্রীর এপিঠ ওপিঠ, শ্রদ্ধা আত্মার প্রাণ, ইচ্ছা অচল প্রাণকে সচল করিয়া তোলে, ইচ্ছার হিন্দোলেই সৃষ্টি। হইবেই, হইতে বাধ্য, ইহা বিশ্বাসের কথা; হউক, করুক, চলুক, ইহাই ইচ্ছার প্রেরণা। উভয়ই সমভাবে চাই। একের অভাবে অন্যটি একপক্ষ বিহঙ্গের মত শক্তিহীন আবার যাঁহার জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ইচ্ছার মণিকাঞ্চনসংযোগ সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহার সেই সম্মিলিত যোগশক্তি যদি আত্মজীবনেরই উদ্দেশ্য কল্পে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও তাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। মনের খণ্ড বিশ্বাস ও ইচ্ছা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের জন্য ক্ষুদ্র সার্থকতা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু আমরা চাই আত্মারই অখণ্ড শ্রদ্ধা, অনিবার্য্য ইষণা, আর এই আত্মা শুধু তোমার আমার একার একার নিজস্ব জিনিষটুকু নয়, আত্মা বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বগত, তাঁহার এই চিৎ-তপঃ, ইহাও নিঃসংশয়ে সমভাবে সকলেরই জন্য।

* * *

শত্রু সংশয়, বিশ্বমানুষের এই কেন্দ্রপাপ তার বিশ্বাসতরু নিয়ত মূলচ্যুত করিবার জন্য উদ্যত, হইবে কি, ইহা কি কখনও হইয়াছে, না হওয়া সম্ভব, এরূপ ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন সংশয়ই উত্তোলন করে, সংশয়াকুল মানুষ ভগবানের উপর নিত্য সন্দীহান হইয়া পড়িতেছে, আত্মসত্তায় হতশ্রদ্ধ, একবিন্দু সংশয় অবশিষ্ট থাকিতে জীবনের ভিতর ভাগবত ইচ্ছার দ্যোতনা সুস্পষ্ট হয় না। সংশয় প্রশ্ন করে, তর্ক করে, হাজার রকমের আপত্তি উত্থাপন করে, সংশয়ে জ্ঞানসূর্য্য অবগুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, প্রেমপুষ্প শুষ্ক ম্লান, ভক্তি প্রীতি স্নেহ শ্লথমূল হইয়া মানুষের হৃদয়সমুদ্রে তুমুল ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিয়া দেয়, সাধকজীবনের প্রথম ও মূল সংগ্রাম এই সংশয়শত্রুর সঙ্গে, ইহাকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া বিশ্বাসের মণিময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গুরুশক্তির আশ্রয়গ্রহণ অনিবার্য্য।

* * *

ইচ্ছা প্রতিষ্ঠারও বহু পরিপন্থী, ভগবানের চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে সকলেই উৎসুক কিন্তু এই ক্ষীণ চিত্তবৃত্তি ইচ্ছা নয়, উৎসর্গ মানুষের কাছে করিবার সাধ গেলেও চাই এমন মানুষ যাহার নাম, যশ, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা লোকবিশ্রুত, নতুবা মনোবৃত্তির তৃপ্তি কই, যোগশক্তির উপর আস্থা প্রতিষ্ঠা হইলেও,

ইচ্ছার দোদুল্যমান তরঙ্গে যোগ ফলপ্রদ হয় না, চলচ্চিত্ত হতভাগ্য মানুষ নৈরাশ্যভরা হৃদয়খানি লইয়া দ্বার হইতে দ্বারে প্রত্যাখ্যাত হয়, এত বড় জগৎ-সংসারে উৎসর্গের ডালি গ্রহণ করিবার মত কাহারও সন্ধান পায় না; বিন্দু হইতে বিন্দু, ফোঁটা হইতে খোঁটায়, অনির্দ্দিষ্ট জীবনতরী লইয়া এমনি করিয়াই আশাহত জীব হায়রাণ হইয়া মরিতেছে, অস্বস্তির অবধি নাই।

* * *

উৎসর্গ যাহার সিদ্ধসম্পদ্, ভগবান্ তাহার জন্য আপনি দুইখানি মঙ্গল হাত বাড়াইয়া রাখিয়াছেন, অলক্ষ্যকে স্থিরস্পর্শে অটুটপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে, সিদ্ধদৃষ্টি দিয়া এই বর্ষণোদ্যত করুণাধারা দর্শন করিতে হয়, অকুণ্ঠ অকপট হৃদয়ে সেই শুভ্র অমল দিব্যস্পর্শ আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়, ভগবান্ চির উন্মুখ, অজস্র অবদানে মানুষের মুষ্টি ভরিয়া দিবার জন্য। মানুষ যদি আপনার ধারণা কল্পনা, বিচিত্র বাসনার ঢেউ তুলিয়া আপনি আপনাকে বিমুখ করিয়া না রাখে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তরণীখানি নির্দ্দিষ্ট ঘাটে গিয়া উপনীত হইতে পারে, সেইখানে অমরার ঐশ্বর্য্যে ভক্তের হৃদয়কুঞ্জ সাজাইয়া দিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং যে যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

* * *

উৎসর্গ আত্মহত্যার পথ নয়, আত্মসিদ্ধিকেই অতি-ক্ষিপ্রবেগে প্রকাশ করিয়া তুলিবার জন্য যোগের প্রয়োজন; ইচ্ছা, বিশ্বাস, উৎসর্গ—এই ত্রিপ্রভাব সিদ্ধির অনুকূল উপকরণ, ইচ্ছা ভগবান্‌কে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন শক্তি দান করিতেছে, শ্রদ্ধা তাহার পুণ্য পাদপীঠ রচিয়া দিয়াছে; ভাগবত প্রকাশ সম্ভব, এই অনতিদীর্ঘ বর্ত্তমান জীবনের মধ্যেই উহা পরিপূর্ণরূপে সম্ভব হইয়া উঠিবে, এই দীপ্ত বিশ্বাসে ইচ্ছার হোমকুণ্ড নিত্য প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং উহার জন্য উৎসর্গই একমাত্র সাধনা, এই যোগপথে অন্য সহায়, উপায়, আশ্রয় একেবারেই গ্রহণ করিতে নাই, ভাগবত জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের অনর্গল ধারা ওতপ্রোতভাবে বাড়িয়া বাড়িয়া জীবনের নিত্যপ্রকাশ দিন দিন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

* * *

নূতন বাংলার সাধনা আজ আর ভাসা ভাসা স্বপ্নকুহক নয়, অহংশক্তি ও ভাগবতশক্তির অধ্যাত্মসংগ্রাম তপঃক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, অহঙ্কারের

স্বীকারমন্ত্র আধারের উপর শক্তির খেলা সবলে আকর্ষণ করিয়া লইলেও, গতানুগতিক শক্তিপ্রভাব এত সহজে ভূলুণ্ঠিত হইবার নয়, মঙ্গলশক্তি উপর হইতে হুঙ্কার দিয়া ডাক দিয়াছে, রুদ্রসাধক থাকিয়া থাকিয়া আপনার অন্তরে গর্জ্জিয়া উঠিলেও দুর্জ্জয় অহং স্বয়ং মৃত্যুশেলবিদ্ধ, মন্ত্রশক্তি অগ্নিময় মহাবর্ণে জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে শতজীবনের আবর্জ্জনা নিঃশেষ করিয়া শূন্যে উড়াইয়া দিতেছে, তপঃকুঞ্জ অমরমন্ত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত জীবনের দুইকূল ভাঙ্গিয়া তরঙ্গভঙ্গে শক্তিস্রোত প্রবাহিত, জাতি বিদ্যুদ্বেগে অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, বাংলার জাতীয়জীবনে আজ কালী-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, বামাচার ছাড়িয়া বাঙ্গালী আজ অকপট হৃদয়ে দক্ষিণ পথের যাত্রী, এবার একটা বিপুল জাতির জীবন মন্থন করিয়া ভাগবত মহিমার সিদ্ধপ্রকাশ হইবে, তাহারই সমস্ত লক্ষণ দিন দিন সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

* * *

বর্ণমালা পাইয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছামত বর্ণ-যোজনা করিয়া লইতে হইবে। নূতন সৃষ্টির বীজমন্ত্র থরে থরে সাজাইয়া বাংলা ভরিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে। আত্মার অমর প্রতিভা লইয়া যাঁহারা নূতন নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের ললাট শক্তিরাণীর শুভ্র তিলকে সমুজ্জ্বল, পথের বাধা ও বিভীষিকা অন্তরপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, স্বপ্নরাজ্যের আশাজ্যোতিঃ নয়নে নয়নে ঝলসিত, গতানুগতিকের গতিবেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষপ্রায়, পুরাতনের লুণ্ঠিত শব নূতন প্রাণের বিদ্যুৎস্পর্শে নূতন জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত—বিরোধ নয়, আঘাত নয়, কেবল অন্তর হইতে সিদ্ধ অঙ্গুলি সঞ্চালনায় নূতন নূতন তপঃসৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর, এই অন্তরস্থিত তপোমূর্ত্তিসমূহের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে দিতেই পুরাতন শক্তি দূর হইতে দূরতর হইয়া যাইবে, দিব্য ইঙ্গিত যেদিন পরিপূর্ণ মাত্রায় নূতনের হৃদয়ে অবতরণ করিবে, সে দিন এই তমসাচ্ছন্ন বাংলার জীবনসাগর হইতেই নূতন জগৎ ভাসিয়া উঠিবে।

অনুভূতি

বাংলার নূতন সাধনা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। ইচ্ছা হইতে যোগের আরম্ভ। যেখানে আমার ইচ্ছার সঙ্গে ভগবানের ইচ্ছার বিরোধ, সেখানে নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছাটিকে বলির পশুর মত উৎসর্গ করিতে হইবে। ভাগবত ইচ্ছাই ফুটুক। আমার ইচ্ছা ধুলায় লুটাইয়া পড়ুক—আমার মধ্যে যে মায়াচ্ছন্ন অহং জীব, তাহার আর্ত্তক্রন্দনে হৃদয় বিদীর্ণ হউক; ক্ষতি নাই, সাধকের দৃঢ় সঙ্কল্প, আমায় চূর্ণ করিয়া ভগবান্‌ই মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ হইবেন। ভগবান্‌ই যে আমার সর্ব্বোত্তম আত্মা। তিনিই আবার সর্ব্ব জগতের অন্তরাত্মাস্বরূপ, সেই সর্ব্বভূতাত্মা ভূতাত্মার ইচ্ছাই আমার জীবনে দিন দিন প্রকাশ হইবে। আধার যখন অশুদ্ধ, জীবনযন্ত্র অস্বচ্ছ, তুরীয়ের দিব্য ইচ্ছাটিকে ধরিয়া উঠা একটু কঠিন হয় সন্দেহ নাই, এইজন্যই ভাগবত ইচ্ছার নিগূঢ় পরিচয় যতক্ষণ নিজ অন্তরে সুস্পষ্ট ও ফুটন্ত হইয়া উঠে নাই, ততক্ষণ ধীরভাবে অপ্রমত্তচিত্তে প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত; সাধনা সমষ্টিগত বলিয়া, এই পথে যাঁহারা অধিকতর অগ্রসর, পদে পদে তাঁহাদের নিকট হইতে আলোক ও সহায়তা লাভও সহজ উপায়। দিব্য সমষ্টির ইচ্ছা ভগবানেরই সর্ব্বগত ইচ্ছার জাগ্রত প্রতিরূপ। গুরু ভগবানেরই প্রতীক। গুরু ভগবৎস্বরূপ। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বসাগরে উৎক্ষিপ্ত হইলে, আত্ম-সমর্পণযোগী ভগবানেরই শরণাপন্ন হইবেন, অর্জ্জুনের মত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তলে পড়িয়া শক্তি, আলো, নির্দ্দেশ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিবেন—শিষ্যস্তেঽহম্, শাধিমাং ত্বাম্ প্রপন্নম্—এই শরণাগতিই পথ, গুরুবাক্য অব্যর্থ, অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন জীবনপথ যাঁহার কথায়, আচরণে, আদেশে, ততোধিক প্রত্যক্ষ অন্তরপ্রবাহিত নিবিড় আশীষময় প্রভাবে দিব্য কিরণোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তিনিই গুরু।

সাধনা তর্কের সামগ্রী নহে, সাধনা অনুভবের বস্তু। জীবন দিয়া

অনুভব লাভ করিতে হয়। শাস্ত্র অনুভবেই জীবন্ত হইয়া উঠে। অনুভূতির পথ কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান, ক্রম, নিয়ম, প্রণালী নয়, অনুভূতির শ্রেষ্ঠ উপায় উৎসর্গ। যাহারা অন্ধতমসাচ্ছন্ন, হৃদয়পট যাহাদের স্বচ্ছ হইয়া উঠে নাই, বুদ্ধি মলিন সংশয়াচ্ছন্ন, তাহাদের জন্য এই সকল প্রচলিত সাধন-বিধির প্রয়োজন থাকিতে পারে, এগুলি যেন জোনাকীর বিন্দু বিন্দু আলো। সরল অকপট ধর্ম্মতৃষ্ণা যাঁহার জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে ভগবানের করুণ হস্ত স্বয়ং যাঁহার শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে, তিনি চাহেন জ্ঞানের দীপ্তসূর্য্য, এই সকল অবান্তর খোসা লইয়া তাঁহার তুষ্টি নাই, একেবারে মূল জিনিষটিকেই তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছেন, আত্মা স্বহস্তে যাঁহাকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার যোগ সহজসিদ্ধ, যমেবৈষঃ বৃনুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বৃনুতে তনুং স্বাম্।

প্রথম স্বীকৃতি। ভগবান্‌কেই জীবনে গ্রহণ করিলাম, তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা করিয়া লইব, তাঁহার জন্যই আমার জীবন। সমস্ত সাধনানুষ্ঠানে জলাঞ্জলি না দিলে, এই স্বীকারমন্ত্র জ্বলন্ত আগুণের মত জীবনে জ্বলিয়া উঠে না। আমি তাঁহারই যন্ত্র, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, জানিলেও বুঝিলেও, সে সমস্ত কিছুই দেখিব না বুঝিব না, হে ভগবান্, তুমি যেমন যেমন করাইবে, আমি তেমনি তেমনি করিয়া চলিব, তোমার ইচ্ছাই আমার সাধনা। অধ্যাত্মযোগে এই স্বীকৃতি-মন্ত্রই প্রথম অনুষ্ঠান, অন্য অনুষ্ঠান নাই।

স্বীকৃতি আজ করিলাম, কাল বিস্মৃত হইলাম, জীবনে অহঙ্কারের ক্রীড়া তেমনিভাবে পূর্ব্বপ্রথামত চলিল, এরূপ হইলে যোগ অগ্রসর হয় না। চাই স্মৃতি। সাগ্নিক যেমন গৃহাশ্রমের হোমকুণ্ড চির প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখেন, তেমনি নিরবচ্ছিন্নধারে স্মৃতি ধারণ করিতে হইবে। নিত্য অনুস্মরণকারী সাধক পদে পদে ভগবদ্বিধানেরই অনুগমন করেন, যেখানে দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠে, আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা রাগদ্বেষ উচিত অনুচিত সংশয়ে হৃদয় দোদুল্যমান হইয়া উঠে, সেখানে তিনি স্তব্ধ নিরপেক্ষ চিত্তে ঊর্দ্ধনেত্রে তৃতীয় হস্তের গতিনির্দ্দেশটির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করেন; আমার পথ যেখানে একরূপ, দিব্যবিধান অন্যরূপ, সেখানে আমার মনোমত প্রণালী ছাড়িয়া ভগবানের কার্য্যপ্রণালীটিকেই সর্ব্বান্তঃকরণে আঁকড়িয়া ধরিতে হয়। স্মৃতি মূল সঙ্কল্পেরই শতসহস্রবার পুনরভ্যাস, জীবনের অসংখ্য

ঘটনাবৈচিত্র্য দৃঢ় অভ্যাসে সাধকের প্রথম মন্ত্রটিকে সিদ্ধ করিয়া তোলে।

দ্বন্দ্ব বুদ্ধিক্ষেত্রে, মনে, প্রাণে, শরীরে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ভগবানের ইচ্ছানুগত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই তপস্যা। এই জীবনযন্ত্রগুলি উপরের ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিয়াই পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিবে। ইচ্ছার আনুগত্যই ইহাদের সত্য ধর্ম্ম। বুদ্ধি সংশয়পূর্ণ, হৃদয় বেদনাচঞ্চল, প্রাণ ও শরীর অক্ষম সীমাবদ্ধ, এগুলি সত্যধর্ম্মের লক্ষণ নয়। তুরীয়ের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ নাই, ভাগবত শক্তি ও আনন্দ জীবন দিয়া অনুভব করিতে হইলে আধারগুলির চাই ধারণসামর্থ্য—কালীর স্বহস্তচালিত নিত্য বিকাশেই যন্ত্রগুলি দিন দিন শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইয়া উঠিবে, বুদ্ধি হইবে স্বচ্ছ, দীপ্ত, অনন্ত প্রতিভার প্রকাশপথ, হৃদয় মুহুর্মুহু তাঁহাকেই আলিঙ্গন স্পর্শ দিবে, প্রাণ তাঁহার দর্শন স্পর্শনজনিত যে মধুর পুলকপ্রবাহ, তাহাতেই নিয়ত পরিপ্লুত রহিবে, শরীরখানি সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্ব-অবস্থার ভিতর দিয়া সিদ্ধ রথের মত এই যোগপ্রকাশকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিবে।

অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রভাবে দিব্যশক্তি জীবনে অবতীর্ণ হইবে। তখন মানুষ আর শুধু মানুষ নয়, মানুষের মধ্যে নরনারায়ণ আবির্ভূত। অহং পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া গিয়া শুদ্ধ সত্তাবোধটি জাগাইয়া ধরিবে। অহং করোমি, আমি করিতেছি, এই বোধ লুপ্ত হইবে; ভগবান্ করাইতেছেন, আমি করিতেছি, এখানেও যে অহংসংজ্ঞান, তাহাও নিঃশেষে বিলীন হইলে তবে মানুষ হইবে সচ্চিদানন্দের কেন্দ্র, ভগবানের বিগ্রহ।

সকলের ভিতরেই এই ভাগবত পূর্ণতার বীজ নিহিত, প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভগবানের বিচিত্র বিভূতি, অনন্তগুণ বিশ্বপুরুষ বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণপ্রতিভা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে লীলাশীল। আমরা যে দেবসমষ্টির আদর্শ সহস্রবার কহিয়া আসিতেছি, তাহার একটি বিন্দুও হীন নহে, তুচ্ছ নহে, অপদার্থ নহে; ইচ্ছাভেদে আমি কবি, তুমি কর্ম্মী, সে প্রচারক, গুণ বিভিন্ন হইলেও আত্মা অভেদ, একটি আত্মাই বিচিত্র ধর্ম্ম লইয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন কর্ম্মপ্রকাশ করিতেছেন; ভেদ রূপে, অন্তরপুরুষ অখণ্ড।

আত্মার বিন্দু ঐশ্বর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, একটা সাত্ত্বিক অহঙ্কারের

উদয় স্বাভাবিক। আমি সৎ, অহং ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মবোধ সত্য, কিন্তু ইহাই একমাত্র সত্য নয়। ভাগবত স্পর্শে আমার জীবন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আমার চতুষ্পার্শে জ্ঞানে অজ্ঞানে তাঁহারই বিভূতিপুঞ্জ ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত একটি সত্তার বিচিত্র ক্রীড়া, এই আত্মাকে খণ্ড করিয়া আপনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অষ্টসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী। মানবসমষ্টির সহিত অভিন্নজীবন হইয়াই যোগসিদ্ধি মূর্ত্ত করিতে হইবে, আমি অবতার হইতে পারি, কিন্তু তুমিও যে সমভাবেই ভগবানের অবতরণ-ভূমি; বাংলা হইতে সেই অবতারবাদ নির্ম্মমহস্তে উৎপাটিত করিতে হইবে, যাহা আপনার ভিতরে ভগবদ্দর্শন করিলেও আপনার চারিদিকে কেবল ভক্ত দর্শন করে; বিশ্বমানব ভগবানের অবতার, খণ্ড অবতারবোধে যিনি আপনাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, শুধু মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছেন না, বিশ্বরূপ খণ্ডিত করিয়া তিনি আপনাকেও বঞ্চিত করিতেছেন। ভক্ত কোথায়, এ যে চতুর্দ্দিকে সেই সহস্রশীর্ষ সহস্রনয়ন শ্রীভগবান্ স্বয়ং।

অহং ব্রহ্ম। আমি আছি, আমি তাঁহার সহিত অভিন্ন। কিন্তু আমিও যেমন সৎ, তুমিও তেমনি—আত্মায় জাতি ধর্ম্ম, লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই—আমি, তুমি, সে, রাম, কাশিম, টমসন্, সকলে সমভাবেই সৎ—একটি অবিভাজ্য সত্তা সকলকে ভরিয়া থরে থরে সংসার সাজাইয়া তুলিয়াছে—আমিও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, আর্য্য অনার্য্য সমস্তই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কেহই নাই, কিছুই নাই। তাই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অনন্তবিস্তৃত অবস্থিতি জানিয়া মুহুর্মুহু প্রণতিমন্ত্র উচ্চারণ করি—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সকল মানুষের মধ্যে আত্মাকেই জাগাইয়া তোলা নূতনযোগের লক্ষ্য। এই মহাব্রতে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ, তাঁহাদের সমস্ত জীবনখানি তুরীয়ের আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিতে হইবে। জীবন হইবে উৎসর্গ, কর্ম্ম হইবে আনন্দের হিল্লোলে। উৎসর্গ যত পরিপক্ক হইবে, অনুভূতি ততই সরস, প্রগাঢ় ও পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিবে; যে ইচ্ছা ভগবানের, তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে আনন্দ ও অমৃত, সেই অমৃতরেণু অঙ্গে মাখিয়াই উৎসর্গের শুদ্ধি ও সিদ্ধি ঘটিবে, পরিপূর্ণ উৎসর্গ জীবনের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গে আনন্দের ঢেউ চলাইয়া তুলিবে, জগৎ আনন্দ ও শক্তিরই লীলাসমুদ্র, উৎসর্গফলে যে ঐক্য ও মুক্তির অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে, তাহারই উপরে নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা।



বাংলার জীবনপ্রকাশ ভাব হইতে কর্ম্মে অবতরণ করিতেছে, অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ হইতে যেমন কোটী কোটী জ্যোতিষ্কপুঞ্জ গড়িয়া উঠে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ শূন্যমণ্ডল পরিশোভিত করে, অস্ফুটভাব তেমনি করিয়াই ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, ভগবান্‌ই যাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব, এমন সহস্র সাধকের চিন্তায়, জীবনে, কর্ম্মে, শক্তির খেলা লীলায়িত হইয়া উঠিবে। মানুষ আনন্দের সন্তান, অখণ্ড ভাগবত অনুভূতিসম্পন্ন সহস্র জীবন গড়িয়া উঠিলেই বাংলায় আনন্দের যুগ আরব্ধ হইবে।

পাগলের চিঠি

ভায়া! তোমাদের চিঠিপত্রগুলি এবার ডাহা মারা গেছে, একখানিও আমার হস্তগত হয়নি। না হবারই কথা, তোমরা সবাই জান, মধুচৈত্রমাসে রাবণের দুর্গোৎসব হয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী-আরাধনা করেছিলেন, পাগল হ'লে কি হয়, মা আমার ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে বুক জুড়ে বসেছিলেন—এ ক'দিন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না, একটা দুষ্টু ছেলের গোলাপী পিচ্‌কিরি আমায় জাগিয়ে দিলে, শক্তিতরঙ্গে বিশ্বনাথ তোফা দোল খাচ্ছেন, আর তোমরা একেবারেই মাতোয়ারা, বলি পাগলের পূজা দেখ্‌তে এসেছিলে না কি?

সে এক অভিনব উৎসব। সকালে উঠেই যেদিন খবর পেলুম—মা আস্‌ছেন, ভেবেছিলুম পূজার অনুষ্ঠান উপকরণের কিছু জোগাড় দেখি, কিন্তু গঙ্গার জল গঙ্গা থেকে তুলে এনে লাভ কি, গাছের বুক ছিঁড়ে ফোটা ফুল মলিন করে' কি হবে, কাজেই হৃদয়ের সব দরজা খুলে দিয়ে বসে' রইলুম। দু'তিন দিন কোন সাড়াই পেলুম না, তারপর হঠাৎ হাতে ঠেকে গেল কার এক বিপুল শরীর। চোখ্ বুজে আগাগোড়া হাত বুলিয়ে বেশ বুঝে নিলুম, পূজার প্রথম অনুষ্ঠান আপনিই হাজির হয়েছে, এ যে শবমূর্ত্তি, চোখে জল এলো, মাগো, সাধন ভজন তো কিছুই জানি না, বাংলার এই বিরাট শবমূর্ত্তির জীবনসঞ্চার করাই সাধকের প্রথম সিদ্ধি। তারস্বরে মায়ের নাম উচ্চারণ কর্‌তে লাগ্‌লুম।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী কোথা দিয়ে কেটে গেল, হুঁস্ ছিল না—তিন দিন শবের সঙ্গে অমানুষিক যুদ্ধ করে' মাথার শির ছিঁড়ে যাবার জোগাড় হ'ল, রক্তের ঢেউ নেচে নেচে দুলে দুলে অস্থি মাংস ফেড়ে ফেল্‌বার উপক্রম কর্‌লে, অচেতন গলিত শব ভীষণমূর্ত্তিতে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে' দিলে, ধরিত্রী সে দৃপ্ত-পদভরে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—এ কি হলো মা! যদি জীবন দিলি, তবে এ রুদ্রমূর্ত্তি কেন? শান্ত সুন্দর শিবময় মূর্ত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে' দে—বাংলার মৃতপ্রাণে অপার্থিব মঙ্গল-রাগিণী বেজে উঠুক।

নবমীর নিশি যখন শেষ হয় হয়, তখন শবের কণ্ঠে যেন রুদ্রবিষাণ গর্জ্জে উঠ্‌লো, হুহুঙ্কারে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে মাটির বুকে আপনাকে আছড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো—তারপর রক্ত, কেবল রক্ত, আমার পূজার বেদী পর্য্যন্ত রুধিরসিক্ত হ'য়ে লাল হ'য়ে গেল, শবের আত্মবলি—সে আজ একেবারেই অহঙ্কার মুক্ত—দেবীর বিজয়-আশীর্ব্বাদ তার শিরে বর্ষিত হ'ল দশমীর প্রভাতে—বাংলার প্রাণসমষ্টি মহামিলনের মেলা বসিয়ে দিলে, সারা বাংলার প্রাণশক্তি সেদিন নাচে আর আলিঙ্গন করে—সিদ্ধি—শুধুই সিদ্ধি—এখনো নেশায় বুঁদ্ হ'য়ে আছি, ফাগুয়ার রঙে সারা অঙ্গ রাঙা হ'য়ে গেছে—যেন অহঙ্কারের বুকের রক্ত মেখে একেবারেই ভুলে গেছি—কে আমি, কোথায় আমি ?

মা—মা—মা, পূজা তো শেষ হ'ল। ষোড়শোপচারে পরিতুষ্ট জগদ্ধাত্রী ! বরাভয় কর বাংলার মাথার উপর তুলে ধরে' যা বলে' গেলি, তা তো আর কোন মতেই ব্যর্থ হবার নয়, এ কি অভাবনীয় লীলামাধুরী, কি অনির্ব্বচনীয় বিদ্যুৎশক্তিসঞ্চারিণী প্রবল তোর ইচ্ছা, আনন্দময়ী, দে দে আরও পাগল করে' দে ; অভয়বরদৃপ্ত উন্মাদ সন্তান, প্রতিরোধী জড়প্রকৃতির পাষাণতরঙ্গ ভেদ করে' অমৃতনির্ঝরিণী-মাতৃপ্রেম সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেব, কুলু কুলু নাদে তপঃশক্তির দিব্যরূপ মূর্ত্ত করে' পৃথিবীর বুকে নূতন সৃষ্টি গড়ে' তুল্‌বো, পূজা আমার সার্থক হয়েছে—তোর অভয় বর অন্তরে বাহিরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে—স্বপ্ন যদি সত্য হ'ল পৃথিবীর বুকে নূতন যুগের বিজয়-পতাকা প্রথিত কর্‌তে দুদিন বিলম্ব হ'লেও, তা হবে, তা কর্‌বো, বাংলার কোটি কণ্ঠে আজ জয়ধ্বনি শুন্‌তে চাই।

সেবা—বাংলার চারকোটি নরনারীর শিক্ষা—অন্নসমস্যা—যাদের মাতৃদর্শন হয় নি, তাদের জন্য গতানুগতিক পথে ঐ সকল কর্ম্মযোগ প্রশস্ত। সিদ্ধ সন্তানের সমষ্টি—তোমাদের কার্য্যপ্রণালী মানববুদ্ধির অধিগত হবার নয়—যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ, আচার বিচার, ওসব তোমাদের নয়, তোমরা লক্‌লকে আগুনের এক একটি শিখা, বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ, একত্র হও, সিদ্ধের থাক্ সমবেত হও, তারপর মায়ের প্রত্যক্ষ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উঠে দাঁড়াও, আর হুঙ্কার ছাড়, মায়ার সৃষ্টি উপ্‌ড়ে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে, আর ঘরে ঘরে দিব্যরাজ্য গড়ে উঠ্‌বে—বাংলার বুকে মায়ের সোণার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে তো তোমার আমার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছাময়ীর অমর ইচ্ছা তোমাদের বাসনার ঊর্ম্মিল-সমুদ্রে বিকৃত হ'য়ে' নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে—সিদ্ধ সন্তানের নিষ্কলুষ আধার দিয়ে যে রূপ ফুটে বেরুবে—সেই সৃষ্টিই হবে অবিকৃত, জগতের আরাধ্য সামগ্রী।

বামাচার-রত মায়ের সন্তান ! তোমরা সাধকের থাক, তোমরা এখনও ভগবানের ছোঁয়া পাও নাই, নির্ম্মাণের পথে তোমাদের দর্শন নাই, ধ্বংসের উপকরণ, পুরাতন সৃষ্টির বনিয়াদ পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌বার জন্য তোমাদের আহ্বান করি, আর দক্ষিণাচারী সাধক, তোমরা নূতন সৃষ্টির

সিদ্ধ-যন্ত্র, এস—অনন্তসৃষ্টির মাঝে ধ্বংসের পর যে ফাঁকটুকু দেখা যাচ্ছে, ঐখানে বসিয়ে দাও তোমার অন্তরের পাওয়া সামগ্রীটিকে, চলুক ধ্বংস, চলুক নির্ম্মাণ—পাগল আমি, বিভোর অনাচারী! আমায় তোমরা নাচ্‌তে দাও, আর গপা ছেড়ে বল্‌তে দাও—কালী, কালী, ব্রহ্ম কালী।

কামিনী-কাঞ্চন—কোন্ মহাকালীর আদেশবাণী বাঙ্গালীর কানে তিরের মত বিঁধে গেছে—সে কথা ভোল্‌বার নয়, উপেক্ষা কর্‌বার নয়, মানুষের ভোগ আজ ধূলাধূসরিত—ভগবানের নূতন সৃষ্টির ভারপ্রাপ্ত সিদ্ধের থাক, মোহগ্রস্ত হবে কেমন করে'? জয় কালী—জয় দক্ষিণেশ্বরের মূর্ত্ত মহাদেবী, নররূপে তোমার বজ্রকণ্ঠ পৃথিবীর বুকে তীক্ষ্ণশেলের মত বিদ্ধ হ'য়ে আছে, নূতন সৃষ্টি সার্থক করে' তুল্‌তেই হবে।

জীবন যখন সীমার বাঁধনে আবদ্ধ বলে' মনে হয়, তখনই ভোগের অভাবে, প্রাণের মাঝে বাসনার রোয়গর্জ্জন শোনা যায়, আর গুম্‌রে গুম্‌রে জীবন নিংড়ে কান্নার স্রোত বইতে থাকে; জীবন যার অসীম অখণ্ড, সে যে নিত্যভোগী—ভগবানের ইচ্ছাই যে তার জীবনকেন্দ্র, রসের সমুদ্র—অভাববোধ সেথায় থাকে না, থাক্‌তে পারে না; বাংলার ঐ যে সব সারি সারি চলেছে—বরদৃপ্ত অমরার সন্তান, ঐ যে শান্ত সমাহিত দেবগুরু সিদ্ধ পতাকা উড়িয়ে আমাদের আহ্বান কর্‌ছে—ওরে, গোস্বামীর মানস-পুত্রগণ, ওরে ঠাকুরের প্রাণপ্রিয়গণ, তোদেরই কাজ—আজ কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে তোদেরই ডাকি, আয় আয় দৌড়ে আয় ছুটে আয়, আমার প্রাণ যে বড় আকুল হয়েছে।

আর পারি না লিখ্‌তে, এক লাইন লেখার সময়টুকুতে লক্ষ লাইনের ভাব মাথার মধ্যে গজিয়ে উঠ্‌ছে—লেখায় বলায় বাংলার সাধক আর আস্থা রেখ না—এই যে দেবীপক্ষ কেটে গেল, কে ছিলে ভাই সমাহিত হ'য়ে বিশ্বশক্তির তরঙ্গহিল্লোল অনুভব কর্‌বার জন্য, তোমরা কি স্পর্শ পাও নি, টরনেডোর মত বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হ'য়ে গেল, নিশ্চয় পেয়েছ। অহঙ্কারের ধোঁকায় পরস্পরের মধ্যে ছোট বড়র সৃষ্টি করে' ফাঁপরে পড়েছ, মুক্ত হও, এক হও, জনে জনে ভগবানের অবতার, হরিহরের মত পরস্পরের চরণে পরস্পর মাথা নত করে' উন্মাদ হও, পাগলের কথা তখনই বুঝ্‌বে।

আরও প্রবল বেগ আস্‌ছে—সিদ্ধ যে সে নৃত্যপরায়ণ, সে যে উমানাথ শঙ্করের মত সব বিষ হজম করে' অমর হয়েছে, সাধক যে সে এই শিবের পায়ের ধূলো মাথায় তুলে ধরুক, আর হৃদয়ে নারায়ণের রূপ সন্দর্শন করুক, হাতদুটি বিস্তৃত করে' মহাশক্তিকে জড়িয়ে ধরুক—জয় কালী জয় কালী, শক্তি দে, ধৃতি সামর্থ্য দে—জয় কালী জয় কালী—ভারতের বুকে এ অপূর্ব্ব লীলা প্রকটনের অধিকারী যারা, একবার আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করে' বল—ওঁ কালী।

সিদ্ধ-সঙ্কল্প

"প্রাণে না বাঁচিলে ধনভোগ করিবে কে"?—দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, 'আনন্দ-মঠের' কল্যাণী গৃহত্যাগকালে মহেন্দ্রনাথকে এই কথা বলিয়াছিলেন। অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা লৌহ-পেটিকায় সংগৃহীত হইলে ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া খ্যাতি-লাভ করা যায় বটে, পরন্তু উহাতে উদর পূরণ হয় না।

অধুনা বাংলাদেশে অর্থ উপার্জ্জনের প্রবল স্পৃহা পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন তেমন করিয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করা হয়; দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায় হইতে উচ্চ আভিজাত্য শ্রেণীর মধ্যেও ধনোপার্জ্জনের আকাঙ্খাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দেশের দিক হইতে ইহা বড় শুভ লক্ষণ নয়।

শষ্যশ্যামলা বাংলা বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতায় দিন দিন উষরক্ষেত্রে পরিণত হইতে বসিল। নদীয়া জেলার অধিকাংশ জমীই অনাবাদে মাটী হইতেছে, সেদিন এক সংবাদদাতার পত্রে অবগত হইলাম, বগুড়া জেলার মধ্যেও হাজার হাজার বিঘা জমী পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, একথা অতি সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জমীই সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য শ্রমজীবীদের দ্বারা আবাদ করিয়া লওয়া হয়। বাঙ্গালী চাষী দিন দিন দেউলিয়া হইয়া, কেহ বা দেশান্তরি হইতেছে, কেহ কেহ দুই পাতা ইংরাজী শিখিয়া অফিসের কেরাণী হইয়া দিন গুজরাণ করিতেছে, কাদা মাটী মাখিয়া হলকর্ষণ বাঙ্গালীজাতির পক্ষে যেন অপমানের কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে, দশ টাকা চাউলের মণ হইলেও আপত্তি নাই, কিন্তু ধান্য উৎপাদন করিবে কে? বাঙ্গালীর নির্ব্বুদ্ধিতায় বাংলার শষ্যক্ষেত্রগুলিও বৈদেশিক বণিকের করতলগত হইতে চলিল, হায় রে, বাংলার জাগরণ কি কাগজে কলমে আর গলার জোরেই ঘোষিত হইবে?

বাঙ্গালীর অর্থ উপার্জ্জনের অনেক কথাই আমরা আলোচনা করিয়াছি, সম্প্রতি আবার এক নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহা বাস্তুভিটা বিক্রয়। যে আবাসগৃহখানির মূল্য পাঁচশত টাকা নয়, উহা যখন পাঁচ

হাজার টাকায় খরিদ করিবার লোক জুটিতেছে, এমন সুবিধা কি ছাড়িতে আছে? আবার ইহার দালালী করিয়া শতকরা পাঁচ টাকা যখন পাওয়া যায়, তখন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখ, কোন্ বাঙ্গালী লক্ষ্মীছাড়া, বাস্তুভিটাহীন হইতে চাহে। অন্ততঃ, জীবনবীমা দালালের মত, ঋণভারপীড়িত বাঙ্গালীর কাণে এই আশু অর্থসমাগমের উত্তম সুযোগটীর কথা শুনাইয়া দাও, দলে দলে অনেক বাঙ্গালীই স্বর্ণমুদ্রার লোভে, পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটাটী বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিয়া, পরাধীন জীবনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুক। আমরা শুনিতে পাই, কলিকাতার মধ্যবিত্ত অধিকাংশ গৃহস্থই আজ নিজের বাসবাটীতেই ভাড়াটিয়ারূপে বসবাস করিতেছে, আর ভাড়ার মাত্রা দিন দিন দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন দাখিল করিতেছে। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত গণ্ডগ্রামগুলি হইতেও বাঙ্গালী আজ বিতাড়িত, নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া থাকিলে, বাংলাদেশকে মা বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকারবঞ্চিত হীনচরিত্র বাঙালী! তোমাদের পরিণাম কি, ভাবিতে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

সেদিন ভট্টপল্লী হইতে একজন ব্রাহ্মণ, ভাড়াটিয়া-বাটীর সন্ধানে আসিয়াছিলেন, দুই হাজার টাকার বাস্তুভিটাটী পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন; ইচ্ছা, গঙ্গাতীরে কিছু টাকা খরচ করিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবেন, আর কিছু টাকা পুঁজি করিয়া রাখিবেন, কিন্তু তাঁহার বাড়ীও যেমন পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, অন্যের জমীও তো তাঁহার জন্য অল্পমূল্যে বিক্রয় হইবে না; এতদ্ব্যতীত তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন পাঁজার ইট পুড়াইয়া, হাজারের মূল্য পড়িয়াছিল আড়াই টাকা, এক্ষণে দশ ইঞ্চি ইটের হাজার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা; ভিটা বিক্রয় করিয়া আর যে কেহ নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, এমন আশা আর নাই। হায় বাঙ্গালী! এত অধিক বুদ্ধি তোমাদের কেন হইল?

সংবাদ পাইলাম, আমেরিকাণ ও জাপানী বণিক কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত জমী খরিদ করিবার জন্য বাঙ্গালী দালাল নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতার জাপানী বণিক "মিট্‌সিভূষণ কাইশা" এখানকার একখানি বাড়ী নব্বুই হাজার টাকায় খরিদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, গৃহস্বামী ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তারপর মাড়োয়াড়ী বণিকগণ তো রেল-লাইন ধরিয়া, ভাগীরথীর উভয় কূলে বিস্তৃত জমী খরিদ করিতেছেন। বাঙ্গালী

টাকা চায়, গৃহিণীর গহনা আর কোম্পানীর কাগজ, উহা চিবাইয়া জীবন-রক্ষা হয় না; এই সহজ কথাটা বুঝিবার দিন কি আজও আসে নাই, আমাদের অরণ্যে রোদন শুনিবে কে?

সে যাহা হউক, যদি জাতিকে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে অবান্তর সকল কথা ছাড়িয়া আজই হাজার হাজার সাধক, দেশের কানে এমন মন্ত্র দিতে থাকুন, যাহাতে জাতির আত্মচৈতন্য উদ্বোধিত হয়। বিশ হাজার বাঁশের মাড় বাঁধিয়া যে দুইজন বাঙ্গালী, কাছি টানিয়া, কাদা মাখিয়া নদীর তীরে ছুটিয়াছে, উহাদের আলিঙ্গন কর। শ্রমসিদ্ধ অর্থে বাঙ্গালী যদি শাকান্ন ভোজন করিতে পায়, ফাঁকি জুয়াচুরি করিয়া, ক্ষীর সর ভক্ষণ অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। শ্রমজীবী বাঙ্গালীকে আমরা চিরদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। মাটীর বুক হইতে উৎপন্ন কৃষিজাত সম্পদই জাতীয় ঐশ্বর্য্য, ঐদিকে উদাসীন থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু জাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে; মাটীর মহিমা বিস্মৃত হইলে, আমরা অবধারিত শিকড়-কাটা পরগাছা হইয়া পড়িব, নূতন বাঙ্গালীর ইহা ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

আমরা অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা চাহি না। আমরা চাহি কোটী কোটী মণ ধান্যধন। আর বস্তা বস্তা কার্পাস বস্ত্র। আমরা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া মৎস্য উৎপাদন করিব—গাভী পালন করিয়া প্রচুর দুগ্ধ আহরণ করিব। আমাদের আদর্শ কল্পনামূলক নহে, জাতির শ্রেষ্ঠাংশ এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইলে, দলে দলে শ্রমজীবীরা পুনরায় জাতির মেরুদণ্ডে শক্তি প্রদান করিবে—ইহা অবধারিত। বাঙ্গালী তো মরে নাই, পথের মাঝে লক্ষ্যহীন, আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—বিপুল বাঙ্গালীজাতি আজ দিগ্‌ভ্রান্ত, ইহাদের আলো ও পথ নির্দ্দেশ করিবে কাহারা? নগরের রম্যকক্ষে বুদ্ধির কসরৎ দেখাইলে চলিবে না; নবতান্ত্রিকের দল, দেশ ধর্ম্মের জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়, মরণ পণ করিয়া শ্যামল পল্লীর বুকে কমলার বিস্তৃত আসন ছড়াইয়া দাও, কাদা মাটি অঙ্গে মাখিয়া, হাড়ি বাগ্দী, ডোম চাঁড়াল, সকলের গলা ধরিয়া, আর একবার কীর্ত্তন আরম্ভ কর, মাঠে মাঠে সোণার ফসল ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক, বাঙ্গালীর হাসিভরা মুখগুলি প্রফুল্ল পদ্মের মত সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করুক।

চারকোটি বাঙ্গালীর জন্য বঙ্গদেশ ছয়কোটি মণ ধান্য উৎপাদন করে। তবুও বাংলার কৃষিক্ষেত্রগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, কেননা

জমীর উপর কৃষকের সেরূপ মমতা নাই; এই বৎসর সে যে জমী চাষ আবাদ করিল, পর বৎসরে সেই জমী যে তাহার থাকিবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কাজেই জমীতে সার দেওয়া এক প্রকার বন্ধই হইয়া গিয়াছে, উপরন্তু নিজের জমীতে নিজে চাষ না করায় ভূম্যাধিকারীরও এইদিকে দৃষ্টি নাই। যে জমীতে বিঘাপ্রতি দশ মণ ধান্য উৎপন্ন হইত ক্রমে উহাতে আর তিন চার মণ ধানও উৎপন্ন হয় না, অবস্থা চারিদিক হইতেই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। অশিক্ষিত কৃষককুলের উপর দেশের প্রাণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, একেবারেই মরিব না বটে, বাঙ্গালীর স্থাবর সম্পদ্ অবাঙ্গালীর হাতে গিয়া পড়িবে, সেইজন্য আমরা আজ এত কথা বলিতেছি।

রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার ভবিষ্যৎ যতখানি উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়, জাতির প্রকৃত জীবনক্ষেত্রে সেরূপ চাকচিক্য এবং আশার কথা কিছুই নাই। বাংলাদেশকে বাঁচিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের প্রয়োজন, দ্বাদশ বর্ষের সাধনফলে অন্ততঃ এই কার্য্যের জন্য এক হাজার সন্ন্যাসী সৃষ্ট না হইয়া থাকিলে, আড়ম্বরের মধ্যে কাজের কথা একেবারেই ভুলিয়াছি। সংবাদপত্রে কলমের জোর, আর বক্তৃতামঞ্চে গলার আওয়াজ সাধিলেই দেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা, নিজের পায়ে জোর না পাইলে বুক ঠুকিয়া কোন কাজেই হাত দেওয়া ধৃষ্টতা—বাঙ্গালীজাতিকে বহির্ম্মুখী সকল কাজ হইতেই আমরা বিমুখ হইতে উপদেশ দিই। যে কয়টা বুড়া সেকেলে ধরণের দেশহিতৈষিণার ছাপ মারিয়া হৈ চৈ করিতেছেন, তাঁহাদের অরণ্যে রোদন করিতে দাও। আমরা রাজনীতিক অধিকার যতই পাই না, ঘরের গলদ মিটাইতে না পারিলে, দুই দিন বাদে আবার চীৎকার করিতে থাকিব, কেননা অভাবটা তো বাহিরের কিছু নহে; ভিতর হইতে নিখুঁৎভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিলেই আমাদের অধিকার আমরা লাভ করিতে পারিব, বাহিরের দেওয়া অধিকার যতই বড় দান হউক, আমরা উহার চাপে ছন্নছাড়া হইয়া যাইব। রাজশক্তি দেশ শাসন করুন, আপত্তি নাই, আমরা নিরুপদ্রবে দেশসেবা করিয়া যাই, যেখানে প্রয়োজন বোধ করিব, রাজার সহায়তা চাহিব, যথা সময়ে উহা না পাইলে নিজেরাই উহা পূরণ করিব, নিত্য চাহিয়া চাহিয়া কিছু পাওয়া অযোগ্যতারই লক্ষণ—আইস, আমরা সর্ব্বদিক দিয়া যোগ্য হইয়া উঠি।

দেশের সম্মুখে যে কাজটী অসম্পাদিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, উহা নিষ্পন্ন করিতে যাহার তাহার সাধ্যে কুলাইবে না, কেননা দেশসেবা অর্থকরী নহে। আমাদের উৎসর্গ দিয়া দেশজননীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে অবশ্যই অন্নপূর্ণার বেশে তিনি আমাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন, কিন্তু আজই কিছু তিনি মূর্ত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন না, তাঁর সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য ভোগী বিলাসী স্বার্থপর সংসারমায়া-জড়িত সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে, এই শ্রেণীর লোক যেমন তেমন করিয়া আত্মরক্ষা করুন, আমাদের সে বিষয়ে কোনই বক্তব্য নাই, কিন্তু আজ যাঁহারা ভিতর হইতে জাতির ভবিষ্যতটীকে গড়িয়া তুলিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদিগকেই আমরা আহ্বান করি। তাঁহারা একেবারেই সন্ন্যাসী, তাঁহাদের স্নেহবন্ধন, প্রীতি অনুরাগ, খ্যাতি যশঃ প্রভৃতি সমস্তই দেশসেবায় উৎসর্গ করিতে হইবে, কেবল সাধনারক্ষেত্র হইতে তাঁহারা পাইবেন কটীতট-বেষ্টনের জন্য একখণ্ড কার্পাসবস্ত্র, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য যথেষ্ট আবরণ, আর উদরপূরণের জন্য অন্নমুষ্টি—ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যাঁহারা দেশের সেবা করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি অল্পসংখ্যকও হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহাদের তপোবলেই নূতন বাংলা গড়িয়া উঠিবে।

দেশসেবা করিতে রাজভয় করিলে চলিবে না। রাজা মানুষের প্রাণ মন লইয়াই জন্মিয়াছেন এবং দেশরক্ষার ভার ভগবান কর্ত্তৃকই তাঁহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে; রাজবিধি লঙ্ঘন করা বা রাজবিদ্বেষ প্রচার করা দেশজননীর সেবা নহে, প্রকৃত পথটী অনুসরণ করিয়া চলিলে, রিফর্ম্ম-প্রথা অনুসারে দশ বৎসরে কেন, দুই চার বৎসরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করিব। রিফর্ম্ম আমাদের যোগ্য অধিকার নির্দ্দিষ্ট উপায়ে বিধান করিবে কেমন করিয়া, উহা তো একান্তই নির্ভর করিতেছে আমাদের যোগ্যতার উপরে। স্বাধিকার রাজার হাত দিয়া আসিলেও, বিধানকর্ত্তা তো ভগবান্, বাহিরের চাকচিক্যে যতই আত্মহারা হইব, ততই আমরা পিছাইয়া পড়িব। আইস, আমরা অন্তরকে বলশালী করি, দেশের অন্তরদেশটীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলি—বিরোধ বিদ্বেষ নহে, সাধনা তপস্যা—সনাতন পন্থা আজ আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট—এই পথে চলিতে হইলে সাহস চাই, বিশ্বাস চাই, কিন্তু ভয় এখানে একেবারেই নাই, সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন।

নিবেদন

কোথা হইতে প্রবর্ত্তকের জন্ম হইল, কেমন করিয়া উহার সহিত আমার নাম সংযুক্ত হইল, এ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব আমি তো কিছুই জানি না—শুধু জানি—কোন অলৌকিক শক্তি প্রবর্ত্তকের জন্মদিন হইতে ইহার কর্ণধার—সেই অজানা হাতেই আজ পাঁচ বৎসরের প্রবর্ত্তক লালিত পালিত বর্দ্ধিত—তাঁহারই হাতের যন্ত্র। আমি ভারবাহী মাত্র। প্রবর্ত্তকের সেবা করিয়া আমার জীবন যে নূতন এবং পবিত্র হইয়াছে, ইহা আমি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিব এবং তাহার ফলে যে সত্য দৃষ্টি পাইয়াছি, তাহা মিথ্যা এবং কল্পনা হইতে পারে না।

প্রবর্ত্তক শক্তির মূর্ত্ত বিকাশ। সাধনার স্তর ছাড়াইয়া আজ যে সিদ্ধ-মন্ত্র প্রবর্ত্তকের ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইতেছে, তার প্রতি মূর্চ্ছনায় যে বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা আমারও কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমায় নূতন দৃষ্টি দিয়াছে। আমি জানিয়াছি বুঝিয়াছি—প্রবর্ত্তক কোন জীর্ণ শরীররূপ নামের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নাই—প্রবর্ত্তকের সহিত আমার নাম যুক্ত থাকা পরিহাস মাত্র। এতদিন ইহা বুঝিবার আবশ্যক হয় নাই, বুঝি নাই—কিন্তু আজ যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? প্রবর্ত্তক সত্যই যাঁর নামে প্রসিদ্ধ, যাঁর মহিমায় মহিমান্বিত, সেই অলক্ষ্যহস্তেই আজ পর্য্যন্ত উহা পরিচালিত হইয়াছে—ভবিষ্যতেও হইবে।

তুমি ত কাহারও নামের গর্ব্ব রাখ নাই, আমারই বা রাখিবে কেন? চিরদিন তোমার সেবা করিব, অহঙ্কারের চিহ্নে মণ্ডিত হইব না। আমার ক্ষুদ্র নাম প্রবর্ত্তকের বিরাট বুকে আর শোভা পায় না, উহা মুছিয়া দাও, আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমার সিদ্ধি, উহাতে ত আমারও দাবী আছে—আমার বিশিষ্ট জীবন তোমার নামেই সফল হউক। তুমি নাম দিয়াছিলে, তুমি উহা প্রত্যাহার কর—ইহাই আমার নিবেদন। আমার এই গোপন মিনতি প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় প্রকাশ হউক, পাঠকবর্গও জানুন—প্রবর্ত্তকের কর্ণধার স্বয়ং কালী—চিরদিনই ছিলেন, এখনও আছেন—আমি ছিলাম আবরণ মাত্র, আজ হইতে উহা অপসৃত হইল।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৫ই চৈত্র, ১৩২৬

জাতি-সৃষ্টি

বাঙ্গালী কি জাগিল? ওগো ধ্যানী বুদ্ধ! ভারতের যোগনিরত ঋষি! তোমার দেওয়া মন্ত্র, বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিয়াছি—তুমি একবার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া আমায় বল, সুপ্তবাংলার প্রাণশক্তি ভৈরবগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিল কি না?

জাগিয়াছে—মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, বাঙ্গালীর জাগরণ-লক্ষণ চারি দিক হইতেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, শুধু সমাজ-সংস্কারে নয়, শুধু শিক্ষাবিস্তারে নয়, বাঙ্গালী নিজের আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, আত্মাকে জাগাইয়া তুলিবার অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়াছে।

জাগাইতে আসিয়াছেন যাঁহারা—তাঁহারা নামিতেছেন উপর দিক হইতে; ভাগবতস্পর্শে সবখানি ভরাইয়া, ভাগবত ঐশ্বর্য্যে আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া। ঠাকুরের কথায় ইহারাই সেই নিত্যসিদ্ধের থাক্, দলে দলে ইঁহাদের আগমন আমি লক্ষ্য করিতেছি।

জাগিতেছেন আত্মহারা সুপ্ত ব্রহ্ম। নীচের টান এখনও ইহাঁদের অন্তরকে সমান ভাবেই ধরিয়া রাখিয়াছে—উপরের আকর্ষণ অনুভবের মধ্যে আসিয়াছে বটে, বুদ্ধিশতদলে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইয়াছে, মধুগন্ধে মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সবখানি এখনও নূতন হইয়া উঠে নাই, আত্মার বিপুল পুলকে সকল স্থান ভরিয়া যায় নাই। মাটির টান ছাড়িয়া, জাতির প্রেরণা কেবল ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নবশক্তি-তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিলে, গতি ইহাঁদের অসম্ভব, তাই বাহিরে জাগরণের তেমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নাই, না থাকিলেও বাঙ্গালীর অন্তরপুরুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—ইহা ধ্রুব সত্য।

বাংলার গ্রামে গ্রামে নূতনের দল ছড়াইয়া পড়িতেছে—রাজধানী কলিকাতার বুকে বসিয়া হট্টগোল নিরর্থক বুঝিয়া বাঙ্গালী-সাধক পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামল কর্ম্মক্ষেত্রে হোমকুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছে—নৈরাশ্যবিক্ষুব্ধ নিরক্ষর মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের বিদ্যুৎশিখা আবার একবার ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে—উঠ—জাগ। নৈশ-আঁধার বিদূরিতপ্রায়, প্রভাত-সূর্য্যের রক্ত-কিরণ পূর্ব্বগগনে উদ্ভাসিত। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে, হে বাঙ্গালী! একবার উচ্চারণ কর—

"লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।"

ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আচার বিচার, ভালমন্দ কিছুই জানি না—হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিও—"যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

আমি জাগিয়াছি—ইহা সত্য; আমার আত্মা সর্ব্বব্যাপী—অতএব সকলের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী—সকলে উঠ, উত্তম বর লাভ কর।

শুধুই কি প্রলাপ আর কবিত্ব! বাঙ্গালী কি জাগে নাই? ভাবিয়া ভাবিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত, না আমি কেবলই আশার স্বপন দেখিতেছি—আর হাঁকিয়া হাঁকিয়া নানা ছন্দে গান গাহিতেছি—ঐ যে সারি সারি ধানের মরাই আমার চক্ষুর সমক্ষে চিত্রিত, উহা প্রহেলিকা না কি? ঐ যে সর্ব্বত্যাগী সন্তানের দল, হাসিভরা মুখে, গগন বিদীর্ণ করিয়া পথে মাঠে, বৃক্ষতলে নূতনযুগের মহাসঙ্গীত গাহিয়া বেড়ায়, উহাও কি মায়া মতিভ্রম? ঐ যে জীবনের সব আকাঙ্খা নির্ম্মূল করিয়া, ভাগবত কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অসংখ্য সেবক নতশিরে শক্তি প্রার্থনা করিতেছে—এ সকলই কি কবির হাতে লেখা প্রাণহীন চিত্র? যদি তাই হয়, তবে ঐ যে চিরউর্ব্বর বাংলার বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দামোদরের প্রবল বন্যায় বালুময় মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে—ঐ যে মহামারী, বিসূচিকায়, বসন্তে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এক একখানা গ্রাম একেবারে লোকবিরল অরণ্য হইয়া গিয়াছে—ঐ যে অন্নবস্ত্রহীন সহস্র সহস্র দরিদ্র পরিবার, অজস্র অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতেছে—উহাও তাহা হইলে মিথ্যা অর্থশূন্য কৃত্রিম পুত্তলিকা মাত্র? না, সবই সত্য—একদিকে ধ্বংসের মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য, অপর দিকে বিজয়-আশীর্ব্বাদপূত অসংখ্য দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব—

বাংলার শোচনীয় দুর্দ্দশার পরিশেষ শীঘ্রই হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

যাহা ধ্বংসমুখী তাহার গতিরোধ অসম্ভব। ভবিষ্যতে এরূপ দুরবস্থা যাহাতে না আসে, তাহার প্রতিকার নূতন জাতিকেই করিতে হইবে। ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহার ভোগাধিকার অনিবার্য্য সুতরাং তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—বিরোধে আত্মশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, আততায়ীও বল-শালী হইয়া উঠে; আমরা কিছুর সহিত বিরোধ করিব না, আমরা করিয়া চলিব নির্ম্মাণ, নিখুঁত পরিপাটী করিয়া গড়িয়া তুলিব নূতন সৃষ্টি, একেবারে বনিয়াদ হইতে নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিব।

যাহা আছে—তাহাকে ছাড়িয়া নহে, উপরের পরিবর্ত্তন ক্ষণস্থায়ী এবং বিরোধেরই উদ্দীপক, একেবারেই ভিতর হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করা চাই। আমাদের কার্য্য, বাহিরের প্রতিবাদ নয়, অন্তরের মূলকেন্দ্রকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ কর, বাহিরের বিচিত্র সৃষ্টি পরস্পর বিরোধী হইলেও, অন্তরের প্রেরণা অভেদ, আত্মা চাহেন বাহিরের জগতে অবিকৃত আকারে প্রকাশ হইতে, ব্যষ্টি হিসাবে নহে, বহু বিচিত্রতার মধ্যে সমান আনন্দে এবং ঐশ্বর্য্যে সমষ্টির জীবনে প্রতিফলিত হইতে। এ যুগে যুগাবতার বা বিশেষ পুরুষের আবির্ভাব ভাগবত কার্য্যের ভীষণ অন্তরায়, নূতন যুগের বাঙ্গালী সাধক স্ব স্ব অন্তরে বিরাট্‌কে, সত্যকে, সুন্দরকে পরিদর্শন কর, আর তাঁহারই নির্দ্দেশে, বিচিত্র রসে, সম্বন্ধে, পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য মিলনে সংঘবদ্ধ হও। বিশ্বব্যাপী শক্তিতরঙ্গে বহু সাধক আপনাকেই শ্রেষ্ঠ ও মহান্ বলিয়া অনুভব করিতেছেন, সত্যদৃষ্টি ফিরিয়া আসিলে সকলের মধ্যেই সত্য ও বৃহতের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া পুলকিত ও পরমানন্দে বিভোর হইবেন, তখন যুগলহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিতে থাকিবেন—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি, বাংলার ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রেও তদ্রূপ দলাদলি দেখা যাইতেছে—উন্নতিযুগে ইহা হওয়া বড় বিচিত্র নহে, এবং ইহার ফল ভীষণ হইবে বলিয়া যাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের ভীতি অমূলক, কেননা সাধনার বিভিন্নস্তরে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি লইয়া, চরিত্রগঠনের যথেষ্ট সুবিধা হয়। অল্পাধিক অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রপতি, তাঁহার কেন্দ্রস্থিত অপরিণত

বহু সাধকের মধ্যে শক্তির বীজ অনায়াসেই ছড়াইয়া দিতে পারেন, গুরু-ভাবের পুরাতন সংস্কার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলিকে, নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে চিরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিলেও, আত্মাকে অতিক্রম করিয়া কেহই ইহাতে সফলকাম হইতে পারিবেন না; পক্ষীডিম্ব যেমন পরিণত অবস্থায় ভিন্ন হইয়া যায়, সময় আসিলে বাংলার ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিও নিজ নিজ সীমা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট্ কেন্দ্রচক্রে পরিণত হইবে, নূতন জাতিগঠনের সম্ভাবনীয়তা যদি কোথাও আশা করা যায়, তাহা হইলে বাংলার এই সকল ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রগুলির মধ্যে হইতেই হইবে।

তবে হে সাধক, আত্মঘাতী হইও না। অহংকারের দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে সর্ব্বেশ্বরজ্ঞানে মোহবদ্ধ থাকিও না। বিশ্ব-শক্তির বিপুল প্রেরণা বাংলার দেবমানবসৃষ্টির জন্যই অযাচিত বিতরণ চলিতেছে, যে কেহ শান্ত সমাহিত অবস্থায় থাকিবেন, তিনিই ইহা লাভ করিবেন, কিন্তু বুদ্ধি হইতে শরীরের প্রতি ধমনীটি শান্ত বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য যোগস্থ হও, ঐশী শক্তিকে বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশ হইতে দাও, সারা বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে যে শক্তিশালী জাতি সংগঠিত হইবে, তাহার সূচনা অন্য কোথাও হইবে না, ভগবান্ বাংলা-দেশকেই ইহার জন্য মনোনীত করিয়াছেন,। বাংলার ধর্ম্মস্রোত আরও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, সে খরতর স্রোতে অভিষিক্ত হইবার জন্য বাঙ্গালীজাতিকে অহঙ্কারমুক্ত হইতে বলি, অহঙ্কারের বিজয়স্তম্ভ যতই দৃঢ় ও শক্ত হউক ভাগবত তরঙ্গ উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। বাংলার ভবিষ্যৎসৃষ্টির জন্য তাই অহংলেশশূন্য বহুসংখ্যক সাধককেই আমরা চিরদিন আহ্বান করিতেছি—দল যে গঠন হইবে তাহা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া নহে, কোন কার্য্যবিশেষের সাধন-মানসেও নহে—জগন্নাথের বিপুল রথখানিকে ধরিয়া, বিশ্বের বুকে টানিয়া লইবার জন্য, মানবমাত্রেরই অধিকার; বাঙালী, রথের কাছি তোমায় প্রথমেই স্পর্শ করিতে হইবে; জগৎ-লীলার অগ্রদূত, ধর্ম্মযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, বাঙ্গালী, ক্ষুদ্র অবতারবাদ হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বনাথের চরণতলে আইস কোটী কণ্ঠে শক্তি প্রার্থনা করি, আমরা সকলেই ভগবদ্-বিভূতি—শক্তিসাধনায় সত্যদর্শন পরিস্ফুট হইবে।

ব্রত

বাঙ্গালীর প্রাণে কর্ম্মপ্রেরণা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু উহা ফলপ্রসূ করিতে হইলে, যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা বড় কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। স্বদেশীর কল্যাণে আত্মবলি দিতে বাঙ্গালী আজ কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু প্রাণ দিলেই তো দেশের প্রাণ জাগে না, কুরুক্ষেত্র হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতে অসংখ্য নরবলি হইয়াছে, জগতের ইতিহাস রক্তরঞ্জিত, মানবাত্মার জাগরণ ঘটিয়াছে কৈ?

* * *

বিপ্লবযুগের কর্ণধার বারীন্দ্রকুমার সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন "মানুষ ভাবে—বীর হও, বন্ বন্ করিয়া তলোয়ার চালাও, কাঁচা মাথা স্তূপাকারে কাটিয়া পড়ুক। এই হইল শক্তির সাধনা, এই তো সার্থক। বুঝে না সে কে অপচয়, সে যে দশটাকার কেরাণীর ঘটি বাটী ভিটে নাটী বাঁধা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করা"; কথাগুলি বিপ্লবপন্থী বাংলার প্রণিধানযোগ্য বটে। আর একটু কথা উদ্ধৃত করি "যাহার তপস্যা নাই, ত্যাগ নাই, সে জগদ্ধিতায় চাপ্-রাস পায় নাই। ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, ভারত বল, সকল দেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঐ এক সত্য জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সকল দেশের যুগপ্রবর্ত্তক ত্যাগী সংযমী যোগী। নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধি-ক্ষণে এক একটী তপস্যানিরত শিবের আবির্ভাব, আর তাহার পর পিপ্-লিকার মত সারি বাঁধা কর্ম্মীর সৃষ্টি।"

* * *

বাংলার কাজ কত বৃহৎ, কত মহান্, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। দক্ষিণেশ্বরে জগদ্‌গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে মহাভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মগ্রহণে বাঙ্গালী আজও অসমর্থ, স্বামীজীর মত সর্ব্ব-

ত্যাগী বীরকর্ম্মী সেই অপূর্ব্ব তত্ত্ব বস্তুগত করিতে সক্ষম হন নাই, গোস্বামীর অন্তরনিহিত মহাসত্যও আজ বাঙ্গালীর নিকট অনুদ্ঘাটিত; ইহা হইতে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী সাধকগণকে কি কঠোর সাধনা করিতে হইবে, কি অপার্থিব দৈবী চরিত্র লাভ করিতে হইবে।

* * *

বাংলার অসম্পাদিত এই মহাকর্ম্মের ভার লইতে উদ্যোগী কে? স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহার দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বাহিরের টানে তিনি আত্মহারা হইয়া বাহিরের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন; বাঙ্গালীর অন্তরপুরুষকে জাগাইবার মত স্পর্দ্ধা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

* * *

ঠাকুরের অমানুষিক মহাশক্তি কালচক্রে বিলীন হইবার নহে, আধার হইতে আধারান্তরে ইহা পরিক্রমণ করিতেছে—ঠাকুর আজ বাঙ্গালীজাতির মধ্যেই ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, অন্যদিকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, তাহা আর ব্যর্থ হইবার নহে। বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এই মহাশক্তি অবিচ্ছেদ প্রবাহে বিতরিত হইতেছে; সাধক মাত্রেই ইহার অধিকারী, এবার এই মহাশক্তির হস্তে বাংলাদেশে এক বৃহৎ গতিশীল কেন্দ্রচক্র গড়িয়া উঠিবে—যাহার পরিধি ক্রমপ্রসারিত, জগজ্জয় না করিয়া ইহা আর নিরস্ত হইবে না।

* * *

অধিকারী হইবে কে? ঠাকুরের মর্ম্মবাণী গ্রহণ করিবার জন্য, নরেন্দ্র নাথের মত ব্যাকুলতা কাহার আছে? ঠাকুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য জীবনের ষোল আনা দিয়া কে উন্মাদ হইতে চাহে? স্বামীজীর জীবনে, পরমহংসদেবের অনন্ত ভাব যেটুকু মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইটুকু পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য বিদেশিনী নিবেদিতাকে আমরা যেরূপ কাতর ও আকুল হইতে দেখিয়াছি, এক্ষণে কে সেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাকে নিঃশেষে ভুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—কে, কে সে জগদ্ধিতায় "চাপ্‌রাশের" অধিকারী হইবে?

* * *

বাঙ্গালী! সাড়া দাও; দেশপ্রেমে উন্মাদ হইয়া নশ্বর প্রাণ লক্ষবার বিসর্জ্জন করা তেমন কিছু বীরত্বব্যঞ্জক নহে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষ অকাতরে এইরূপ আত্মবলি প্রতিদিন দিতেছে—অভ্যাসে এবং উত্তেজনায় সকলই সম্ভব হয়। কিন্তু আত্মা দিয়া, ভাগবতবাণী আয়ত্ত করিবার জন্য যে কঠোর তপস্যা তাহা অতি বিরল, বাঙ্গালীজাতিকেই আজ এই বিরাট্ সাধনায় অগ্রণী হইতে হইবে।

* * *

কালস্রোত মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে, তাহার পরিমাপ থাকিবে না; জীবন ছুটিবে নিরলস হইয়া অক্লান্ত অশ্রান্ত ভাবে, এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, মগজের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যুৎ প্রবাহে টানিয়া আনিবে উপর হইতে অফুরন্ত প্রেরণারাশি, হৃদয় সতেজে গ্রহণ করিবে বিচিত্র স্বপ্ন চিন্তা ভাবের লহরী, প্রাণের অদম্য আবেগে মূর্ত্ত করিয়া ধরিব, বস্তুতঃ করিয়া প্রকাশ করিব মর্ত্ত্যের বুকে, দিব্যসৃষ্টি থরে থরে তবে— তো সার্থক হইবে ভারতের সনাতন সাধনা, তবে তো যোগ্য পূজা করা হইবে ঠাকুরের উদ্দেশে, তখনই অন্তরীক্ষ হইতে দেববৃন্দ করতালি দিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন।

* * *

ভারতের অসংখ্য কর্ম্মস্রোত সমান ভাবেই প্রবাহিত হউক কিছুরই অন্তরায় হইবার দুষ্টবুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা চাহি, ভগবানের সত্যপ্রেরণাটিকে অবধারণ করিবার মত তপঃসিদ্ধ আধার। ভারতের কর্ম্ম অনির্ব্বচনীয়, উহা সিদ্ধ করিতে হইলে, যে দৈবীচরিত্র লাভ করিতে হইবে, অসংখ্য কর্ম্মের মাঝে আপনাকে হারাইয়া বসিলে তাহা কখনই সার্থক হইবে না—একথা ধ্রুব সত্য। এই মহান্ কর্ম্মের জন্য সিদ্ধের সংখ্যা নিতান্তই অল্প; কিন্তু তত্রাচ চাই, ভারতের সনাতন ধর্ম্মটিকে নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিয়া উহাকে যথাযথ ফুটাইয়া তুলিবার মত একদল মহাকর্ম্মী মহাত্যাগী জননীর বরপুত্র, তাঁহারা আসিয়াছেন, মহামায়ার কুহকে অধিকদিন না অবরুদ্ধ রহেন, তাই উচ্চকণ্ঠে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার তাঁহাদের আবাহন করিতেছি।

* * *

ভুলিবে নাকি আপনাকে? ক্ষুদ্রতার মায়াপণ্ডী ছিন্ন করিয়া আত্ম

সত্তাকে পাইবে না, জানিবে না ? যাহার ছেদ নাই অন্ত নাই, এক অমরসত্তা তুমি, এই কথাটি নিত্য স্মরণ কর, ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া একবার তোমার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, স্থান ও কালের ব্যবধানে এই অচ্ছেদ্য ব্রহ্মসূত্র নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত। অহংকারের মূলদেশ কাটিয়া অন্তরীক্ষে ছুঁড়িয়া ফেল, উপরের সংস্পর্শে উহা একেবারেই নূতন হইয়া ফিরিয়া আসুক—ভগবানের স্পর্শে দিব্য যন্ত্রস্বরূপ তোমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও—সমগ্র মানবজাতির সাধনা এবার আর নিষ্ফল হইবে না, বুদ্ধ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হউক—ওঁ কালী !

সাধনার নির্দ্দেশ

আত্মসমর্পণ যোগের সাধনা কি? এই মন্ত্রের গুরু কে? প্রভৃতি প্রশ্ন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর সাধনা ফিলজফি নয়, জীবন দিয়ে অনুভব কর্‌তে হয়, আর গুরু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, তিনি ভিন্ন সত্য পথটী অন্যে কে দেখিয়ে দেবে?

এই রকম ছোটখাট উত্তরে, কেহই বড় প্রীত হবেন না। একটু বড় করে' বল্‌তে হ'লে, আমরা সর্ব্বপ্রথমেই বল্‌বো হিন্দুর যে দৃঢ় ধর্ম্ম-সংস্কার তার সঙ্গে এই যোগের আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধর্ম্ম ভগবান্‌কে দূরে রেখে নানা অনুসন্ধানে আরাধনা করতে চায়, উদ্দেশ্য অমঙ্গল অপ্রিয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, আর নিজের ছোট ছোট ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করা। তবে ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামীপ্য ও সাদৃশ্য লাভ যে না ঘটে এমন আমরা বলি না।

আপনাকে ছাড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাগবদ্‌বোধে যে উপাসনা সাধারণতঃ তাহাই ধর্ম্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। ভগবান্‌কে সকল মানুষ মান্‌লেও, প্রথানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি, যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক প্রভৃতি।

যোগ কিন্তু এরূপ নহে। যোগের রীতি আরাধনাও নয় উপাসনাও নয়, সে একটা সাধনা এবং সে সাধনপ্রণালী মানবমাত্রেরই অবলম্বনীয়। যোগ হিন্দুরও নয়, অহিন্দুরও নয়, মানুষের রক্ত লাল, একথা যেমন কেউ অস্বীকার কর্‌বে না, তেমনি, মানুষের জীবন দিয়ে, অতি-মানুষের যোগসাধনের যে প্রথা তা সার্ব্বজনীন। পৃথিবীতে জাতি-সমন্বয় সম্ভব হ'লে এই যোগ দিয়েই হবে।

সকল দেশের মানুষেই অনুভব করেছে কোন এক অজ্ঞেয় শক্তির তারা যন্ত্র মাত্র। এই জ্ঞান ঘটনাচক্রে পাকা হয়ে উঠ্‌ছে। আপনাকে যন্ত্র-স্বরূপ বোধ যতই দৃঢ় হবে, মানুষের পক্ষে নিরহঙ্কার হওয়া ততই সহজ হয়ে উঠ্‌বে। আত্মসীমা উল্লঙ্ঘন কর্‌লেই, অসীমের সন্ধান অনায়াসেই পাওয়া

যাবে, জ্ঞানে অজ্ঞানে জগতের মানুষ প্রকৃতির হাতে যোগের খেলাই খেল্‌ছে।

এই অধ্যাত্মতত্ত্বের আবিষ্কার ভারতের ঋষি সর্ব্বপ্রথমে কর্‌তে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা প্রকৃতির বিলম্বিত লীলাকে সংক্ষিপ্ত কর্‌বার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বহু পথ নির্দ্দেশিত হয়েছিল, ভারতে সাধনার তাই বিচিত্র ভঙ্গী। এক্ষণে প্রাচীন যোগপ্রণালীগুলির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য যদি কোন বিশিষ্ট পন্থায় সংসিদ্ধ হয়, তা হ'লে, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যোগ সাধনে মানুষের ক্ষুদ্র পরমায়ু নিঃশেষ কর্‌বার প্রয়োজন থাকে না।

যোগের উদ্দেশ্য, প্রাণ মন তনু দিয়ে, ভগবান্‌কে ফুটিয়ে তোলা, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে জগতের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসূত্র সংস্থাপন করা। আদৌ যদি ইহা না থাকে, তা হ'লে মানুষের চেষ্টা সর্ব্বকালেই ব্যর্থ হবে। আকাশকুসুমের সন্ধান যেমন নিরর্থক। কিন্তু ভগবান্‌কে পাওয়া অর্থে, তাঁকে কোথাও থেকে আনা নয়, তিনি আছেন, তাঁকে জাগ্রত করা, উদ্বুদ্ধ করা।

"সর্ব্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্ম" এই সূত্র ধরে' আমরা চল্‌ব। আমি তুমি সে, সবই ব্রহ্ম। সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ আছে, কিছুকেই ঘৃণা কর্‌তে নেই, কিছুকেই অমান্য ক'র্‌তে নেই, কর্ত্তা দুইজন নহে, একই ভগবান্ সকলের মধ্যে বিচিত্র লীলাভঙ্গী প্রকাশ কর্‌ছেন, এক্ষণে গোলযোগ হচ্ছে, আমাদের সবখানি দিয়ে, এইটা জানা হয় নি। বুদ্ধির স্বীকৃতিই সবখানি নয়, বুদ্ধিই তো জীবনের কর্ত্তা নয়। আমাদের সব দিয়ে জানা মানে, জ্ঞাতা দিয়েই জ্ঞেয়কে পাওয়া। সেই জ্ঞাতা ওরফে স্বয়ং ভগবান্।

তাই সাধনার প্রথম মন্ত্র—অহং ব্রহ্ম। জড় চৈতন্যেরই প্রসূতি, আবার চৈতন্যই জড়ে পরিণত হ'য়ে আপনাকে পুনর্জ্জাগ্রত কর্‌ছেন প্রাণে মনে বুদ্ধিতে অধুনা বৈজ্ঞানিকেরাও জড়ের মধ্যে প্রাণের সুপ্তাবস্থা স্বীকার করেছেন।

সাধককে সমাহিত হয়ে, যন্ত্রবোধে অবস্থান ক'র্‌তে হবে। এই অবস্থাই প্যাশিভ্ হওয়া। প্যাশিভ অর্থে হাত পা ছেড়ে দিয়ে, পা লট্‌কে আসন ধ্যান করা নয়, নিত্য স্মরণ রাখা, জীবনের সব কিছু, ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে, তা সে ঘটনা আকাশের বাজ মাথা পেতে নেওয়া, আর পৃথিবীর সম্মান মূর্ত্ত হয়ে ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দেওয়া, ভাল মন্দ সব ঘটনাই সমতার সহিত গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

ভগবানের যন্ত্র বোধে অবস্থান কালে, এই সমতা সাধনই বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। সেইজন্য এই যোগ গ্রহণ ক'রতে হলে, সর্ব্বপ্রথমেই আমরা অসাধারণ ধৈর্য্যশীল লোককেই ইহার জন্য বিশেষ উপযোগী বলে' পছন্দ করি। বিশ্বাস তো চাই, তা না হ'লে, ইন্দ্রিয়াতীত কাল্পনিক শক্তিকে এতখানি মেনে নেব কেন? আগে চোখে কানে অনুভব করে' দৈবীশক্তি লাভের সাধনা, কুমীরকে কলা দেখানোর মত। যদি শক্তিদর্শন সাধনারম্ভেই হবে, তা হ'লে আর সাধনার প্রয়োজন কি? তবে কোন কোন সময় সাধনার প্রাক্কালেই ভগবানের দয়া মূর্ত্ত হয়ে সাধককে উদ্বোধিত করেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভিতর এইরূপ হয়েছিল, তিনি শক্তিদর্শনের পর সাধন দিয়ে উহা আয়ত্ত করেছিলেন—ঠাকুর কে? সে কথা বহুবার বলেছি, তাঁর কথা ছেড়ে দেওয়া হোক।

সর্ব্ব কর্ম্মে সমতাসিদ্ধি লাভ হ'লে শক্তিদর্শন হয়। ভগবদ্দর্শনের উপায় স্বরূপ হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল যোগপদ্ধতি প্রচলিত আছে, সকলগুলিই সিদ্ধ, উহার যে কোন একটী অবলম্বন করলেই, সাধক ভাগবদ্‌সমীপে উপনীত হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ তো কেবল ব্যষ্টি নয়, ঠাকুর যেমন ব'লেছিলেন, নিজের প্রাণ নষ্ট করতে হ'লে একটা ছুঁচের দ্বারা করা যায়, অনেক মানুষকে মারতে হ'লে ঢাল তলোয়ার চাই, সেই রকম, মানুষ যদি অখণ্ড আত্মা থেকে স্বতন্ত্র হতো, তা হলে আর কোন কথা থাকতো না। ব্যষ্টির সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির সিদ্ধি সংসাধিত হবে। অনেক লঘুচিত্ত সাধক মনে করতে পারেন, "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" কিন্তু মূলে গোল থেকে গেছে, তা না হ'লে, বুদ্ধের মত মহাপুরুষের আত্মাও আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মুক্তির জন্য অন্তরালে বিচরণ করেন? কল্‌মীর দলের মত, এক শিকড়ে বিশ্বসংসার বাঁধা, এক জায়গায় টান্ পড়লে বিশ্ব জুড়ে টানাটানি প'ড়ে যায়। এই সোজা কথাটা না বুঝেই তো, আজ বাংলায় অবতারের এত ছড়াছড়ি। অবতার যে সবাই।

যোগ, ভাগবত জীবন লাভের জন্য। প্রত্যেক যোগীর উদ্দেশ্য এই একই। সকলের পক্ষেই ইহা সম্ভব। প্রকৃতির ইচ্ছাই এইরূপ। সেই জন্য ভারতে যত প্রকার যোগপন্থা আছে, সকলগুলিই মানুষের সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তিকে ভেঙ্গে অসীমের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়। ভক্ত ভগবান্‌কে স্বতন্ত্র বোধে জীবন উৎসর্গ করে, জীবনের সব কাজই ভাগবত উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকেই তার আসক্তি থাকে

মা; কাজেই সে ভগবানের মার্কামারা ভক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়, কথা হচ্ছে পূর্ণযোগের প্রথা কিছু অন্যরূপ, অনন্ত উদার ও সুপ্রসারিত। ভগবানের সঙ্গে আপনাকে স্বতন্ত্র ক'রে, সে এক দণ্ড থাকতে চায় না, কাজেই আত্মসমর্পণের পর থেকে, জীবনের সব কাজেই যে ভগবানের হস্তখানি নিত্য দর্শন করে। আপনার মধ্যেও যেমন ভগবান্ অবস্থান করেন, অপরের মধ্যেও সেইরূপ তিনি বিরাজ করছেন, স্থান কাল পাত্র, কোন খানেই তাঁর ছেদ নাই, সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায়, সকল ঘটনায়, তিনি আছেন, সুতরাং আত্মসমর্পণযোগীর সাধনা কিছুকে ছাড়িয়ে নয়, কিছুকে ত্যাগ ক'রে নয়, সকলের মধ্যে বিশ্বনাথকে দর্শন করা। এই দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত, এই বিশ্বাসে তাকে অবস্থান করতে হবে। অন্য যোগে বিশ্রাম আছে, আত্মসমর্পণযোগীর বিশ্রাম নাই, কাল যেমন অচ্ছেদ্য, সাধনাও তেমনি অবিরাম, শেষে এমন হবে শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবান্ হ'য়ে দাঁড়াবে, প্রতি রক্তকণাটীকে তাঁর স্বরূপ বোধে হর্ষান্বিত হ'তে হ'বে; তবে তো ভাগবত জীবন লাভ হ'বে।

এই সকল সম্ভব কি অসম্ভব এ জ্ঞান যাদের আছে, তারা না হয় এখন দূরে দূরেই থাকুন, কিন্তু ভগবানের টান যার প্রাণে অনুভব হয়েছে অন্তরবৃন্দাবনের কদম্বশ্রেণীর অন্তরাল থেকে শ্যামের বাঁশী যার বেজে উঠেছে, সে কেমন করে' আর বিচার বুদ্ধি নিয়ে বসে থাকবে, কেমন করে' গতানুগতিক ভাবে সংসারে লিপ্ত থেকে সোয়াস্তি পাবে, তাকে দৌড়ে আসতেই হবে বংশীধারীর কাছে, যুক্ত হ'তেই হবে, শ্যামের সব খানিকে, সব দিয়ে আলিঙ্গন করে'—বাংলায় এই মহারাসের সূচনা চলেছে, শ্যামের বাঁশী ফুকারিয়া ফুকারিয়া মধুর মূর্চ্ছনায় মানুষের মনকে আকুল করে' তুলেছে'—"ঐ বাঁশী বাজে বিপিনে তোরা কে কে যাবি আয়"।

হে সাধক গুরু কে? অন্তরের মণিকোটায় বসে যিনি তোমায় ডাক দিয়েছেন, আকুল ভক্তের অশ্রুনীর তিনি স্বয়ং মুছাবেন, বিরহিণী রাধাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গোকুলে গোপীর অভাব হয় নাই, আজ ভাগীরথী তীরে যে প্রেম উজান স্রোতে বয়েছে, যার তরঙ্গপ্রবাহে নূতনের দল উন্মাদ হয়েছে, এক সঙ্গে এক পথে সহযাত্রীর অভাব হবে না, আমাদের গুরুতো কেহ নাই; পরস্পরের গলা ধ'রে কৃষ্ণ অভিসারে ছুটেছি, তোমরা আমাদের সাথী হবে?

হিতৈষীর অনুযোগ

"প্রবর্ত্তক" পাঁচ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে "বরিশাল হিতৈষী" তার একটু সমালোচনা বের করেছেন। সেই সমালোচনায় এই একটুকু অনুযোগ আছে যে কিছুদিন যাবৎ "প্রবর্ত্তকে"র প্রবন্ধ যেন তাঁদের নিকট অবোধ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে। "হিতৈষী" লিখ্‌ছেন—"প্রবর্ত্তক বাস্তবপক্ষে একটা নূতন ভাবপ্রবাহ আনিয়াছিল—আজ যেন তাহার লেখনী হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিতেছে।" যে-কাগজ সারা বছর ধরে' মাসে দু'বার করে' বেরোয় সে-কাগজ সম্বন্ধে ওমনি একটা আল্‌গা রকমের অনুযোগ করলে আমাদের বাধ্য হ'য়ে বোকা সেজে থাক্‌তে হয়। আমরা আমাদের মনের কথা আমাদের শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য স্পষ্ট করে' বল্‌বার চেষ্টা করে' এসেছি, তাতে যদি সে-লেখা পাঠকের কাছে হেঁয়ালীর আকার ধারণ করে' বর-ঠকানো প্রশ্নের মতো গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে দুর্ভাগ্য আমাদের। আমাদের যে-মনোভাব চার বছরের প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে, তার কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা একটি সংখ্যার কয়েকটি পাতে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং "বরিশাল হিতৈষী"র অনুযোগে আমাদের মুখ বুজেই থাক্‌তে হবে, এইটে প্রথম ধাক্কা মনে করেছিলেম।

কিন্তু পরে বুঝ্‌লেম একেবারে তা নয়। কেননা প্রবর্ত্তক কিছুদিন থেকে হেঁয়ালীর আকার ধারণ করেছে কি কারণে তার একটা ইঙ্গিত সহযোগীর অনুযোগের মধ্যে আছে। সেই কারণটা হচ্ছে এই যে প্রবর্ত্তক দেবজন্মের কথা বলে। সহযোগী লিখ্‌ছেন—"প্রবর্ত্তক আশা দিতেছেন তাহারা অচিরে একটি দেবজাতি গঠন করিবেন, তাহারা দেশের সর্ব্ব দুঃখ দৈন্য দূর করিবেন।" প্রবর্ত্তক দেশের সর্ব্ব দুঃখ দৈন্য দূর করবে, এতবড় একটা আত্মম্ভরিতার কথা প্রবর্ত্তক বলেছে কি না সেটা আমাদের স্মরণ হয় না, এবং এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, কেননা "প্রবর্ত্তকে"র বিশ্বাস যে দেশের দুঃখ দৈন্য দূর দেশকেই করতে হবে তা কোন একটা ক্ষুদ্র সংঘ বা দলের দ্বারা করা কিছুতেই

সম্ভব হবে না। দেশের লোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখ্‌লে তাকে চিরকাল অন্য লোকের বক্তৃতার ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না—বক্তৃতা যেই শেষ হবে ওম্‌নি আবার লুটিয়ে পড়্‌বে। দেশ যদি দরিদ্র হয় তবে পাঁচ জনে টাকা উপায় করে' পঞ্চাশ জনকে বড়মানুষ বানিয়ে দিতে পার্‌বে না—এবং যদি দেয় তবে ঐ পঞ্চাশ জনের পরকাল ঝর্‌ঝরে হ'য়ে যাবে—তাতে করে' ঐ পঞ্চাশ জনের যত বড় ক্ষতি হবে তত বড় আর কিছুতে হবে না। এই কারণে প্রবর্ত্তকের চিরদিনের আকিঞ্চন দেশের প্রত্যেক মানুষটিকে গড়ে' তুল্‌তে, প্রত্যেক ব্যষ্টিটিকে শক্ত করে' তুল্‌তে, প্রত্যেকে যেন তাদের নিজের নিজের ভার অক্লেশে বহন করে' এই পৃথিবীতে দীন হ'য়ে নয়, হীন হ'য়ে নয়—মাথা উঁচু করে' বেঁচে থাক্‌তে পারে—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যেন তারা আপনার অন্তরে শক্তির অনুভব বোধ কর্‌তে পারে—যে-শক্তির অনুভব তাদের পক্ষে দীন দরিদ্র হ'য়ে জীবন কাটান অসম্ভব করে' তুল্‌বে।

কিন্তু সে যা হোক্, ঐ দেবজাতির সম্বন্ধে "হিতৈষী" আরও বল্‌ছেন "আমরা জানি না ইহারা (দেবজাতি) কোথায় সৃষ্ট কোথায় লালিত কোথায় বর্দ্ধিত হইয়া কবে কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন। আমরা কাহারও রহস্য-ভেদ করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যাহারা "প্রবর্ত্তকে"র অনুরাগী ভক্ত তাহারা আলো চায়—"। আমরাও প্রবর্ত্তকের দিক থেকে আমাদের মন দিয়ে জানি যে "প্রবর্ত্তক"ও আলো চায়—সমস্ত মন প্রাণ আত্মা দিয়ে সে যার বিরুদ্ধে সে হচ্ছে মন-মজানো mystery, লোক-ঠকানো ভেল্কি ভোজবাজী—সকল রকমের ভণ্ডামি hypocrisy. সেইজন্যে প্রবর্ত্তকের সম্বল অতীতের নামজাদা নামজাদা মন্ত্রের ঝাড় ফুঁক নয়। স্বনামধন্য আত্মারাম সরকারের খেলোয়াড়ের magic-wand নয়—তার সম্বল সে নিজে, তার নিজের অনুভূতি, নিজের উপলব্ধি। হ্রীং ক্রীং ইত্যাদি যতই সত্যি হোক্ না কেন মানুষের অন্তরের দেবতা না জাগ্রত হ'লে তার কোনই মূল্য ও মানে থাক্‌বে না। প্রবর্ত্তক সাধক—কিন্তু সে-সাধনা নির্জ্জন অন্ধকার গিরি-গুহায় বা বনান্তরালে নয়, সে-সাধনা তার মুক্ত দীপ্ত উদার আকাশতলে—সে সাধনা তার ভাই বন্ধু পিতা মাতা কন্যাকে ঘিরে সংসারকে নিয়ে। চার বৎসরের প্রবর্ত্তক পড়েও যদি একথায় কেহ সন্দিহান হন্, তবে আমরা নিরুপায়।

প্রবর্ত্তক আলো চায়—আমরা আলো চাই, তাই সহযোগীর অনুযোগের

উত্তরে দু'এক কথা আমাদের বল্‌তে হবে, কেননা সহযোগীর সমালোচনা পড়ে' আমাদের মনে হ'ল যে "দেবজাতি" সম্বন্ধে তাঁর কতগুলো ভুল ধারণা আছে। ঐ ধারণা দূর করা দরকার, কারণ ঠিক ঐ রকম ধারণা থেকেই সাম্প্রদায়িকতার অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে।

সুতরাং প্রথমে আমরা দেখ্‌ব দেবজাতি জিনিষটা কি? লোক-ঠকানো হেঁয়ালী বা দিন-দুপুরের খেয়াল বা আর কিছু?

প্রবর্ত্তকে সর্ব্বপ্রথম দেবজন্ম নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাতে—অর্থাৎ সহযোগীর মতে যখন "প্রবর্ত্তক বাস্তবপক্ষে একটা নূতন ভাবপ্রবাহ আনিয়াছিল" সেই আমলে। সুতরাং "প্রবর্ত্তকে"র দেবজাতির আইডিয়া একটা নতুন হেঁয়ালী নয়—যদি নিতান্তই হেঁয়ালী হয় তবে তা অত্যন্ত পুরোণো—এমন কি প্রায় তার জন্ম থেকেই তার অস্তিত্ব।

এই "দেবজন্ম" থেকে কয়েক লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি। এই কয়েক লাইনেই আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে করি।

"ভগবান্‌কে কে না চায়? কিন্তু সকলে চায় সেই ভগবান্‌কে যিনি ভাবগত।....."

"আমরা কিন্তু ভগবান্‌কে শুধু ভাবগত করিয়া রাখিতে চাহি না, আমরা তাঁহাকে বস্তুগত করিয়া তুলিব। জগতের খেলায় তাঁহাকে জাগ্রত মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিব। ভগবান শুধু অনন্ত নহেন, তিনি সান্ত, তিনি শুধু অনির্দ্দেশ্য নহেন, তিনি নির্দ্দেশ্য, তিনি শুধু এক নহেন, তিনি বহু। তিনি চৈতন্যমাত্র নহেন, তিনিই শক্তি।"

"মানুষের সাধারণ জীবন যেমন স্পষ্ট জাগ্রত লক্ষ্যযুক্ত, দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনকে মানুষ যেমন সংহত সুবিন্যস্ত ফলপ্রসূ করিয়া এক সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছে, আমরাও আমাদের জীবনকে সেই-রূপই করিব, তবে পূর্ণতর দৃঢ়তর শুদ্ধতর ভাবে। সাধারণ মানুষ তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের দৃষ্টি দিয়া, আমরা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিব দেবতার দৃষ্টি দিয়া।"

ওপরের ঐ কথা থেকে স্পষ্ট এই জিনিষটা প্রমাণিত হবে, যে দেব-জাতি বলে' আমাদের যাদের ধারণা তারা তিনচোখওয়ালা, বা সাতমাথাওয়ালা কোন অপরূপ অপূর্ব্ব অনির্দ্দেশ্য জীব নয়। তারা

দু'হাত দু'পা চোখ কান ইত্যাদি যুক্ত মানুষের মতোই মানুষ। তবে তারা হবে পূর্ণতর দৃঢ়তর শুদ্ধতর। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে একটা উচ্চতর লোকের একটা—higher planeএর পূর্ণতর সত্য দিয়ে। মানুষকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য—সেই পরিপূর্ণ মানুষেরই নাম আমরা দিয়েছি দেবজাতি—সেই জন্মই দেবজন্ম।

এই যে দেবজন্ম—এই যে আমাদের পূর্ণতার দিকে টান একি আজ-শুবি একটা কিছু—এটা কি মানুষের জীবনে নূতন একটা কিছু? না—কেননা মানুষের মধ্যে আবহমান কাল থেকে ঐ চেষ্টা বর্ত্তমান হ'য়ে রয়েছে। দেশে দেশে যুগে যুগে রাজবিপ্লব সমাজবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব যা হ'য়ে এসেছে তার পিছনেই ঐ কথাটা গুপ্ত, যে মানুষের আসল কায়দাটি পাওয়া হয় নি। তাই আবার অন্য রকমে সাজিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা। আসলে মানুষের ভিতর থেকে ঐ পূর্ণতার ইচ্ছা ঐ perfectionএর আকাঙ্খা সাম্‌নে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যেদিন দূর হ'বে সেদিন থেকে মানুষকে পশুত্বের দিকে জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। মানুষকে চল্‌তেই হবে, হয় এদিক নয় ওদিক। হয় পূর্ণতার দিকে নয় মৃত্যুর দিকে—হয় আলোকের আগে আগে নয় অন্ধকারের পিছে পিছে। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর দিকে চল্‌বার উপায় নেই—তাকে পূর্ণতার দিকে জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকেই চল্‌তে হবে। সেইটাই যে তার মধ্যেকার সত্য ইষণা—কেননা ঐটেই ভগবানের ইচ্ছা।

মানুষকে আমরা পরিপূর্ণরূপে পেতে চাই সবদিক দিয়েই। পূর্ণ স্বাস্থ্য পূর্ণ রূপ পূর্ণ দেহ পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ মন পূর্ণ বুদ্ধি পূর্ণ বিজ্ঞান পূর্ণ আনন্দ। মানুষের কোন খানেই একটুকু পর্য্যন্ত দারিদ্র্যের ছায়াপাত থাক্‌বে না—অণুমাত্র কার্য্যতার আভাস থাক্‌বে না। তাঁর দেহ হবে রাজপুত্রের মতো, মন হবে আকাশের মতো, বুদ্ধি হবে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণের মতো, বিজ্ঞান হবে শতসহস্র সূর্য্যের আলোকরশ্মির মতো। অসুন্দর কে চায়? অশক্তি কে চায়? অমঙ্গল কে চায়? অস্বাস্থ্য কে চায়? দীনতা হীনতা দারিদ্র্য অপমান অসম্পদ্ কে চায়? যে প্রাণপণ করে' বসেছে সে যে মৃত্যুকেই বড় বলে' মান্‌বে। কিন্তু মানুষ হবে সেই যে নিজের মনের আকাঙ্খাকেও মৃত্যুর চাইতে বড় বলে' জান্‌বে। তেম্‌নি মানুষ—কোনখানে স্বল্পতার কৃপণতা নেই, অপচয়ের বুকফাটা চাপা গুম্‌রে

মরা ক্রন্দন নেই, দীনতার জোড়াতালি নেই—আছে কেবল প্রাচুর্য্যের অবদান—যে প্রাচুর্য্য আপনাকে ছাপিয়ে বিশ্বসংসারকে পূর্ণ করে' ফেল্‌বে। মানুষের মনের প্রাচুর্য্য তার কাব্যে সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে, তার সম্পদের প্রাচুর্য্য তার বাসভবনে দেবালয়ে তার পল্লীতে নগরীতে অশনে বসনে ভূষণে আহারে বিহারে অদম্য হ'য়ে সুন্দর মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠ্‌বে—প্রাণের চেহারাই সুন্দর, মৃত্যুই কদর্য্য—প্রাণের প্রাচুর্য্য অতি সহজ, সে প্রাচুর্য্য তার বোঝা নয়, কেননা সেই-ই তার জন্মদাতা। মানুষের এই যে পরিপূর্ণ সুন্দর সত্যরূপ—এরই নাম আমরা দিয়াছি দেবজন্ম। আর এই পরিপূর্ণতার আকাঙ্খা মানুষের অতি পুরাতন। ওই-ই হচ্ছে অমৃতস্য পুত্রাঃ—ইয়োরোপ ওরই নাম দিয়েছে Superman—আমরা আজ তাকেই বল্‌ছি দেবজাতি। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে এতে হেঁয়ালীর কিছুই নেই।

কিন্তু এই দেবজাতি নূতন না হোক্ হেঁয়ালী না হোক্, সহযোগী বল্‌ছেন যে এরা কোথায় সৃষ্ট কোথায় লালিত কোথায় বর্দ্ধিত হচ্ছে তা তাঁরা জানেন না। আসল কথা বল্‌তে গেলে আমরা বল্‌ব যে আমরাও ঠিক তা জানি নে। তবে এদের কোথায় সৃষ্ট কোথায় বর্দ্ধিত হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে প্রবর্ত্তকের স্পষ্ট জ্ঞান আছে। এই যে দেবজন্ম তা হওয়া দরকার গিরিগুহায় নয় নির্জ্জন কান্তারে নয় নিভৃতে মঠে নয়—তা হওয়া দরকার একেবারে জাতির, সমাজের বুকের ওপরে—যেখানে হাজার দুঃখ গুমরে আছে, যেখানে চোখের জল শুকোয় না, যেখানে মুখের হাসি ফোটে নি, সেই নিবিড় ব্যথাভরা জাতির মর্ম্ম যেখানে স্পন্দিত হচ্ছে, পূর্ণ মানুষের আবির্ভাব করাতে হবে সেইখানে। দুঃখ যেখানে, সকল প্রকারের অসামর্থ্য যেখানে, সম্পদ্ ও সামর্থ্যের আয়োজন সেখানেই কর্‌তে হবে। বেদনা যেখানে সেখানেই তার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে—সেইখান থেকেই সেইখানকার লোক দিয়েই তা দূর কর্‌তে হবে—আর সেইটেই হবে সত্য মঙ্গলের আয়োজন। রাজনৈতিকক্ষেত্রে যেমন ইংরেজের ব্যবস্থাপক সভাই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভ করিয়ে দিতে পার্‌বে না, তেমনি আমাদের যে দুঃখ সমাজের বাইরে কোন রকমের মঠ গড়ে' তা দূর হবে না। সমাজের বোঝা সমাজকেই বইতে হবে—চিরকাল স্বেচ্ছা-সেবক জুট্‌বে কোথা থেকে? সুতরাং সেই সমাজের মধ্যেই এমন মানুষের

সৃষ্টি কর্‌তে হবে যারা শক্তিমান কর্ম্মী জ্ঞানী—তারা যত পূর্ণ হবে সমাজও তত কৃতার্থ হবে—তারা যদি দেবতা হয় সমাজও তবে দেবসমাজ হবে। আমাদের উদ্দেশ্য দু'একজনের মোক্ষ নয়, আমাদের লক্ষ্য সমস্ত সমাজের মুক্তি—দুঃখ থেকে দারিদ্র্য থেকে অসামর্থ্য থেকে অধমত্ব থেকে। যেখানে সমস্ত মানুষকে তার মুক্তির দ্বার দেখিয়ে দিতে হবে, সেখানে সৃষ্টির নিগূঢ় সত্যটার বিরুদ্ধে এ জগতের আসল fundamental truthএর বিরুদ্ধে প্রতি পদে সংগ্রাম করে' করে' চলা যায় না। তাই আমরা ভোগকেও ভয় করি নি, ত্যাগকেও বরণ করেছি। তাই আমাদের কথা ভোগঃ যোগায়তে।

আমাদের মনে ওম্‌নি একটা ব্যাপক ও বৃহৎ আশা আছে বলেই হয়ত আমাদের চারপাশে এমন একটা জমাট কঠিন গণ্ডী গড়ে ওঠে নি যে-গণ্ডীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' সহযোগী অতি সহজে দেখিয়ে দিতে পার্‌তেন "ঐ যে প্রবর্ত্তকের দল।" সমস্তকে নিয়ে যার কারবার কর্‌বার ইচ্ছা—সে যদি প্রথমেই দল গড়ে' বসে, পাকা গণ্ডী টানে, তবে দু'দিন বাদে সে সে-দলের খাতিরে সেই সমস্তটাকে বলি দিতে বড় বেশী ইতস্ততঃ কর্‌বে না। এ সত্য যেমনি পুরাতন তেম্‌নি সনাতন। তাই "প্রবর্ত্তকে"র এই একটা ধারণা আছে যে, দল যদি গড়্‌তেই হয় তবে সে-দল হওয়া উচিত এম্‌নি যা সমস্ত সমাজের শক্তি ও সাধনা দিয়ে পুষ্ট—সমস্ত সমাজ যার রসদ জুগিয়ে না চল্‌ছে সে-দল আজ কি কাল শক্তিহীন হ'তে বাধ্য। বৃহৎ সমাজই শুধু সেই বস্তু যা মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে মুক্তি দিতে পারে, stagnation থেকে যুগে যুগে রক্ষা কর্‌তে পারে। নইলে দল কেবল দলাদলিতেই পরিণত হয়। সুতরাং "প্রবর্ত্তকে"র আকিঞ্চন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই বস্তু প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া, যাতে করে' পরিবর্ত্তিত হবে, এখানে সেখানে দু'একজন বা পাঁচ সাতজন লোক নয়—সমস্ত সমাজের জীবাত্মা জাতির সমষ্টিগত আত্মা—collective consciousness of the race. দু'এক জনকে পূর্ণ দেবত্ব পাইয়ে দেওয়ার চাইতে যদি যদি সমস্ত সমাজসমষ্টিকে দেবত্বের দিকে দু'এক পাও অগ্রসর করিয়ে দিতে পারে তবে "প্রবর্ত্তক" আপনাকে ধন্য বলে' মান্‌বে।

তাই আমরা বহুত্বের সাধনা স্বীকার করেছি—তাই—অর্থাৎ বহুকে নিয়ে কারবার কর্‌তে গেলে বহুর ধর্ম্মকেও স্বীকার কর্‌তেই হবে, তাই।

সৃষ্টির ধর্ম্মই বহু। এই সৃষ্টিকে যখন স্বীকার কর্‌ছি তখন বহুকেও স্বীকার কর্‌তেই হবে তাই। এই বহুত্বকে অস্বীকার কর্‌বার ফলেই গড়ে ওঠে creed. Creedএর দোষই হচ্ছে মানুষের বিরাটত্ব অসীমত্ব বহুত্বকে অস্বীকার। এই বহুত্ব আমাদের চোখের আগে অতি স্পষ্ট করে' আছে বলেই আমরা বুঝ্‌তে পারি চিন্‌তে পারি গান্ধীকেও তিলককেও, আবার নির্জ্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসীটীকেও। আমরা রামকৃষ্ণমিশন, রিলিফ ফণ্ডকেও appreciate কর্‌তে পারি, আবার যাঁরা বক্তৃতামঞ্চে সাময়িক মনমাতানো বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁদেরও বুঝ্‌তে পারি। আমাদের কারও সঙ্গেও বিবাদ বা বিসম্বাদ নেই। সমস্ত কর্ম্মই সেই এক বিশ্বপ্রকৃতির বিশ্বশক্তির মূল থেকে, চিন্ময়ীর বিভিন্ন বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ। আমরা তর্ক করি তখন যখন ওদের যে-কেউ আপনার খণ্ডধর্ম্মকেই পূর্ণ সত্য বলে' চালাতে চান্‌।

সে যা হোক্‌ এইখানে প্রশ্ন উঠ্‌বে, যে, ঐ যে দেবজন্ম তা কোথায় সৃষ্ট কর্‌তে হবে তা না হয় বুঝ্‌লেম—কিন্তু তা কেমন করে' সৃষ্ট কর্‌তে হবে? তার উত্তর সোজা—তা সৃষ্ট কর্‌তে হবে মানুষের অন্তরকে অনুপ্রাণিত করে' তার ভিতরের জীবনকে পরিবর্ত্তিত করে', কেননা The kingdom of heaven is within us. মানুষের অন্তরের জগতে যা সুসিদ্ধ তাই কেবল তার বাইরের জগতে কৃতার্থ হ'য়ে থাক্‌তে পারে, নইলে কিছুই নয়।

এইজন্যে দরকার সমাজমনকে তেম্‌নি চিন্তায় তেমনি আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ করা বাকের মধ্য দিয়ে—বাক্‌ ব্রহ্ম কথাটা ত নেহাৎ মিথ্যে নয়। প্রথম দরকার সমাজের সভ্যদের চিন্তায় একটা তরঙ্গ তুলে দেওয়া, একটা ব্যাকুলতা এনে দেওয়া—আকাঙ্খার বস্তুকে তাদের মনের চোখের সাম্‌নে তুলে ধরা। আর "প্রবর্ত্তক" তার শক্তি অনুসারে তাই কর্‌বার চেষ্টা করে' এসেছে।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন আমাদের আশা অতি বৃহৎ, সেই অনুপাতে শক্তি হয়ত অল্প—সত্যি। কিন্তু আমরা জানি যে—মানুষের কর্ম্মেই অধিকার আছে ফলে নয় যেমন সত্যি—আবার মানুষের কোন ধর্ম্মই একেবারে নিষ্ফল হয় না এও তেম্‌নি সত্যি।

রাষ্ট্র-সমস্যা

ইউরোপের রাষ্ট্রভাগ্য বিচিত্র। রণশ্রান্ত জাতিগুলি শান্তি চায়, রক্তলীলার অবসানে শান্তভাবে বিধ্বস্ত অর্থপ্রতিষ্ঠান সব পুনর্গঠন করিয়া লইতে চায়; মনে হইতেছিল বটে, এইবার ইউরোপের জীবন সমস্যামুক্ত হইবে, একটা নূতন সভ্যতার উষারেখা ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা এখনও অন্যরূপ। দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণীর সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকার্য্য যেদিন সমাপ্ত হইল, সেইদিন জগন্ময় শান্তি-উৎসবের মহাধূম পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতার কঠোর বিদ্রূপহস্ত নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছিল, উপর দেখিয়া তাহার কিছুই আভাস পাওয়া যায় নাই।

রুষিয়ার বল্‌শিভিজমের কথা উপস্থিত ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রতি জর্ম্মণী হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, উহা সত্য সত্যই ভীষণ ও আশঙ্কাজনক। জর্ম্মণীর নবগঠিত শাসনতন্ত্রের কর্ণধারগণের সহিতই মিত্রশক্তির সন্ধি হইয়াছিল। ১০ই মার্চ্চ বিশ্বদূত রয়টার সংবাদ দিতেছে—জর্ম্মণীর সৈন্যবাহিনী এই শাসনতন্ত্রের আমূল উৎপাটন করিয়া আবার এক নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—একটা মহাবিপ্লব বটে, কিন্তু একরূপ বিনা রক্তপাতেই এই শাসনপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মণ-সেনাপতি হিণ্ডেনবর্গের রাষ্ট্রপতি হইবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, জনরব হিণ্ডেনবর্গ স্বয়ং কিন্তু নূতন গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে মত দেন নাই, কে জানে এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আবার কৈসারশক্তি পুনর্জ্জাগ্রত হইয়া উঠিবে কি না? ইউরোপের রাষ্ট্র-জগতে যেন ভীষণ গোলমাল চলিয়াছে, তাহা শান্তির লক্ষণ নহে, আবার নূতন করিয়া না মিত্রশক্তিকে রণাঙ্গনে দাঁড়াইতে হয়!

এদিকে কনষ্টাণ্টিনোপলের খলিফাৎ লইয়া সমস্ত মুসলমানজগৎ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইউরোপের মহাযুদ্ধে তুর্কীর সুলতান জর্ম্মণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরাজয়ের সঙ্গে মুসলমানসাম্রাজ্যের দুরবস্থা উপস্থিত। মেসোপোটেমিয়া ইংরাজাধিকৃত, ইজিপ্টের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে, সিরিয়া

প্রদেশ ফরাসীজাতির শাসনাধীনে আনিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে—আবার সে-দিন রুমবাদসাহের সাধের রাজধানীতে ইংরাজসেনাবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে, মুসলমান-সমাজ অতিষ্ঠ উত্তেজিত, ভারতেও দশ কোটি মুসলমান-প্রজার বাস, হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রগগন সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এই আন্দোলনস্রোত ভবিষ্যতে কি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, সেদিনকার খলিফাৎ সভায় মহাত্মা গান্ধী তাহার একটা প্রকৃষ্টচিত্র দিয়াছেন, সে কথা পরে বলিব।

তুর্কীর অধীনে মুসলমান প্রজা ব্যতীত বহুসংখ্যক আর্ম্মিনিয়ানের বাস, উহারা চিরদিনই মুসলমানসম্রাটের শাসনদণ্ড উপেক্ষা করিয়া যথারীতি রাজকর প্রদান করিতে ও তুর্ক রাজবিধি মান্য করিয়া চলিতে অস্বীকৃত, এইজন্য সময়ে সময়ে এই খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের উপর মুসলমান তুরস্কের কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে উভয়পক্ষেই মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর নররক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইউরোপের গত মহাযুদ্ধের পর, তুরস্কসম্রাট্ কথঞ্চিৎ হীনবল হওয়ায়, ইহারা সমধিক স্পর্দ্ধাশীল হইয়া উঠে, খৃষ্টান মিশনরীগণের সাহায্যে তুর্কীর অত্যাচারকাহিনী জগন্ময় প্রচার-লাভ করিয়াছে, ভিন্নধর্ম্মী ভিন্নজাতির উপর শাসনাধিকার অটুট রাখিতে গিয়া তুর্কী আর্ম্মিনীয়ার উপরে যে নির্ম্মম আচরণ করিয়াছে, তাহা সমস্ত খৃষ্টানজগতে হৃৎকম্প সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই, ইউরোপের খৃষ্টানমিশনরীগণ এমন কি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুরোহিত পর্য্যন্ত এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, বর্ত্তমান যুগের নন্দনকানন ইউরোপ হইতে মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, আবার রোমাঞ্চকর ক্রুশেডের কল্পনা দুই এক স্থানের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের মুখে পরিশ্রুত হইতেছে, শুনা যায় আমেরিকা এই তুর্কবিরুদ্ধ অভিযানের পক্ষপাতী, সে যাহা হউক, এই কনষ্টাণ্টিনোপোলঘটিত ব্যাপার মিত্রশক্তির এক্ষণে প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে—মুসলমানপ্রধানগণ সত্যই গভীর চিন্তাকুল, ভারতবর্ষ হইতে মোসলেম প্রতিনিধিবর্গ ইংরাজরাজের নিকট মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে সদলবলে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারতের হিন্দু মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া সমস্বার্থে বিজড়িত, সেইজন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের হিন্দুজাতিকেও আজ মুসলমানসম্প্রদায়ের সহিত একই আন্দোলনে যোগদান করিতে হইয়াছে। জালিয়ান্‌ওয়ালার

তীর্থক্ষেত্রে পবিত্র রক্তপাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্যসূত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা এই ঘটনায় আরও উজ্জ্বল ও দৃঢ়স্থায়ী হইয়া উঠিল, এই মিলন জাতি, সমাজ অথবা ধর্ম্মগত না হইলেও, একই রাষ্ট্রনীতি পরস্পরকে যুক্ত করিয়াছে, অতঃপর আশা করা যায়, ভারতের রাষ্ট্রসাধনার পক্ষে এই রাজনৈতিক মিলন দিন দিন গভীরতর হইয়া উভয়েরই রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের পথ বাধামুক্ত করিয়া তুলিবে।

গত শুক্রবারের হরতালে ত্রিশকোটী হিন্দু মুসলমান যে নীরবসঙ্কল্পের মহিমাচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভারতেতিহাসে দুর্ল্লভ। গান্ধীর অন্তরেচ্ছা আজ বিজয়মণ্ডিত, মুসলমাননেতৃগণ আজ জয়যুক্ত। ১৯শে মার্চ্চ সমগ্র ভারতে মহাযজ্ঞ বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইল, অথচ কোথাও বিদ্বেষচিহ্ন নাই, অশান্তি উপদ্রব নাই, যেন কোনও অশরীরী আত্মা কোটী কোটী হিন্দু মুসলমানকে একই কর্ম্মসূত্রে বাঁধিয়া ভারতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে টানিয়া চলিয়াছে—কোটী কোটী প্রজার এই রক্তলেখাহীন তীব্র প্রতিবাদ মানুষ উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু মানবহৃদয়ের করুণ প্রার্থনা বিধাতার সিংহাসন-তল স্পর্শ করিবে, জাতির প্রেরণা আজ ঊর্দ্ধমুখী, মানুষ আজ মিলনের আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ, সঙ্কল্পশক্তির নূতন মহিমা ভারতের জীবনে দিন দিন যেরূপ উজ্জ্বলরাগে প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, হিন্দুস্থানের নেতৃবৃন্দ অচিরে তপস্যার বিশুদ্ধ পথটি ধরিতে ও বুঝিতে পারিবেন।

পথ এখনও বাধামুক্ত নয়, বোম্বাইএর খলিফাৎ সভায় গান্ধী যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। খলিফাৎবিষয়ক সঙ্কল্পটিকে তিনি চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—প্রথম, ইংলণ্ডের তুর্কবিরুদ্ধ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করা; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান-মত-দলনের ফলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দেওয়া; তৃতীয়তঃ, দেশবাসী যেন কোনরূপ প্রচণ্ডলীলা প্রকট না করে। পরিশেষে, যদি তাহাদের সকল আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে কোরাণের বিহিত ধর্ম্মনীতি অনুসারে তাহাদের চলিতে বাধ্য হইতে হইবে। গান্ধী বলেন, এই নীরব আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, মুসলমান জাতি কোরাণের নির্দ্দেশ অবলম্বন করিবে, উহা আর কিছুই নয়—That they should leave the country in which their religion was

assailed or war against the assailant—অর্থাৎ যে দেশে তাহাদের ধর্ম্ম আক্রান্ত হইয়াছে, সেই দেশ তাহারা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে অথবা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামপরায়ণ হইবে। সমগ্র মুসলমান সমাজের মনোভাব নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন "The feeling on the Khalifat question ran so high, that an unsatisfactory solution of the Turkish question might, if peacefnl means failed, land India in a revolutionary movement, the like of which had not been seen before." অর্থাৎ, খলিফাৎ সমস্যা সম্বন্ধে হৃদয়ভাব এমনই গুরুতর সীমায় উপনীত হইয়াছে, যে, তুরস্কবিষয়ক জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে, যদি শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এমন এক বিপ্লবতরঙ্গে সন্তাড়িত হইবে, যাহার অনুরূপ চিত্র আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই।

ভারতবাসী শান্তিপ্রিয়, গান্ধী স্বয়ং তপস্বী, রাজভক্ত, তবু গুর্জ্জরসিংহের কণ্ঠে আজ যে আশঙ্কার বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, অনর্থক নূতন সমস্যায় ভারতের জীবন যাহাতে জটিলতর না হইয়া উঠে, তাহারই জন্য এই সতর্কতার প্রয়াস, বিশ্বের শক্তিব্যূহ ভারতের ভাগ্য কোন্ পথে লইয়া চলিয়াছে কে বলিতে পারে, আশা করিতে পারি, মিত্রশক্তির তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাষ্ট্রনেতৃগণ সুকৌশলহস্তে এই দারুণ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রসমস্যার সমাধান করিবেন, কোটী কোটী মানুষের জীবনভাগ্য লইয়া লঘুচিত্তে ক্রীড়াকৌতুক করা চলে না, ভারতবর্ষ মঙ্গল চায়, কল্যাণ চায়, পৃথিবীর অমঙ্গলশক্তি যাহাতে এই মঙ্গলকে ব্যর্থ করিয়া না তুলে, তাহার জন্য ভারতবাসীকেই বিপুল আয়োজন করিতে হইবে।

এই আয়োজন নির্ম্মাণ, প্রতিবাদ নয়, বিরোধ নয়, ভারতের সনাতন সাধনা অন্তরে নিহিত, নূতন সৃষ্টির বীজ জাতির ভিতরে গোপনে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে বর্ত্তমানের ভাবসাধনাও অপর্য্যাপ্ত, ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অন্তঃসাধনার শ্রেষ্ঠ রূপটী ফুটিয়া উঠিবে না, রাজনীতিক্ষেত্রে যতবড় কর্ম্মসূত্রই সৃষ্টি হউক, তাহা জাতিকে কতকদূর অগ্রসর করিয়া দিলেও, তাহার সত্য অন্তরমিলনটিকে দৃঢ় ও অটুট করিয়া

তুলিতে উহা সক্ষম হইবে না। ভারতের রাষ্ট্রনীতি মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্ম-প্রভাবে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এইবার রাজনৈতিক সাধনার মধ্যে সনাতন শক্তির প্রভাব বিস্তার হইতেছে ইহা খুবই আশার কথা, কিন্তু ভারতের ভাগ্যদেবতা যে নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবেন—তাহার তুলনায় আজিকার মন্ত্রশক্তি প্রচুর নহে, আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি ভারতের নেতৃবৃন্দকে ইহার জন্য একেবারেই নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে, আপনার সবখানি উৎসর্গ করিয়া পূর্ণজীবন লাভ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীই ইহার প্রকৃষ্ট অধিকারী। বর্ত্তমান জাতির কর্ণধার হইবার মত যোগ্যতা একমাত্র তাঁহারই আছে, এরূপ অবস্থায়, ভারতের সবখানিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া নূতন যুগের মানুষ হইতে না পারিলে, অচিরেই তাঁহাকে অন্যান্য নেতৃবর্গের মত, পেছু হাঁটিয়া দাঁড়াইতে হইবে—আনন্দের কথা তিনি ইহার জন্য উদাসীন নহেন, ভারতের পূর্ণপ্রাণশক্তির সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু যে উপায়ে উহা সংসিদ্ধ করিতে চাহিতেছেন—তাহা সনাতন প্রথা নহে, বাহিরের দিক হইতে উহা লাভ করা একেবারেই অসম্ভব, অন্তরদেবতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলেই মণিকাঞ্চন সংযুক্ত হইবে।

আমরা দেখিতেছি আজিকার কর্ম্মপ্রবাহ অপেক্ষা ভবিষ্যতে উত্তাল তরঙ্গের মত যে কর্ম্মপ্রেরণা আসিতেছে—উহার বেগ সমধিক শক্তিশালী ইত্যবসরে উহাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত শক্তি ও সামর্থ্য জাতির জীবনে সঞ্চিত হইলে, আজিকার নিভৃত সাধনা সার্থক হইবে, ভারতের পুণ্যযজ্ঞ পূর্ণ হইবে, নূতন সৃষ্টির পুলকোজ্জ্বল মহিমায় ভারতবর্ষ ধন্য হইবে। হে বাঙ্গালী! ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও, স্থিতধী হও, আজিকার উন্মাদনায় আত্মহারা হইও না।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
৩০এ চৈত্র, ১৩২৬

আহ্বান

বাংলাদেশ আজ বাহিরে নেতৃহীন। ধীরপন্থী ও চরমপন্থী, রাষ্ট্রতান্ত্রিক ও সমাজ-সংস্কারক, শত শত বিদ্বান্ ভাবুক কর্ম্মবীর থাকিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী আজ চালকবিহীন তরণীখানি লইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া চলিয়াছে। মহারাষ্ট্রে তিলক আছেন, পশ্চিম ভারতে গুর্জ্জরসিংহ গান্ধীর শ্রদ্ধাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, মালব্য, খাপার্দ্দে, পেটেল, পাঞ্জাবের লাঞ্ছিত নেতৃবৃন্দ, মুসলমান সমাজের সর্ব্বজনপূজ্য আলিভ্রাতৃদ্বয়—ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে লোকনায়কের অভাব নাই, কিন্তু বাংলায় কে আছেন? সুরেন্দ্রনাথের বিজয়ভেরী আজ আর প্রাণের তাজা বার্ত্তা ঘোষণা করে না, একা চিত্তরঞ্জন শিবরাত্রির সলিতাখানি জ্বালাইয়া বাংলার আন্দোলনক্ষেত্র একটু উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথেরও মুরলীরব আজ শান্তিনিকেতনে নীরব তপস্যায় সমাহিত, বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি কি আজ সত্য সত্যই শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিদ্রালস, উদাসীনতার সুখসায়রে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া গেল? শুধু অরবিন্দ,—কিন্তু নিভৃত নেপথ্যে বাংলার এই মাতৃভক্ত সুসন্তান যে জ্বলন্ত তপোমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সন্ধান কে রাখিতে চায়? সুতরাং বাঙ্গালীজাতির জীবন আজ কাহার নির্দ্দেশে পরিচালিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

বাংলা আজ এমন ছন্নছাড়া হইল কেন, সেই কথারই উত্তর দিব। মানুষের কথায় নৃত্য করিতে বাংলার জাগ্রত অন্তরপুরুষ আজ আর স্বীকৃত নহেন; প্রতি হৃদয় দিব্য মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অন্তরের জ্বলন্ত নির্দ্দেশ প্রতিজন ভিতর হইতে সংগ্রহ করিবে, অন্তরের মণি-কোটায় হিরণ্ময় আসনে জীবনদেবতাকে বসাইয়া আজ প্রতিজনকে গতি-

নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ প্রতিব্যষ্টির তপঃসৃষ্টি জাগাইয়াই জাতির সমষ্টিশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; বাঙ্গালীজাতির নেতা আজ আর কোনও মানুষ নহেন, বাঙ্গালীর কর্ণধার সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ম্ ভগবান্।

ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, আত্মা যদি অপদার্থ না হয়, বাঙ্গালীর জীবনে যে মহাশক্তি গর্জ্জিয়া উঠিবে, তাহা মানুষের ক্ষুদ্র কল্পনা ও মনীষার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অচিরে এক নূতন পথ মুক্ত করিয়া তুলিবে; বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র আজ আর জটিল ও অস্পষ্ট নয়, আপনাকে জানা ও পাওয়ার তপস্যা প্রভাতসূর্য্যের মত প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল; তপঃশুদ্ধ আধারে নূতন শক্তিমন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়াছে, সে মন্ত্র ব্যর্থ হইবার নয়; নীরব সাধনায় শত শত তপস্বীর সিদ্ধজীবন গড়িয়া উঠিতেছে, গঠন যে-দিন পরিপূর্ণ হইবে, সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত উন্মাদ জয়গানে সোনার বাংলার আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিবে।

এই গঠনে ধৃতি চাই, চারিদিকের ঝঞ্ঝাঝাপটে তপঃপ্রদীপ প্রতিমুহূর্ত্তে বিচঞ্চল হইয়া উঠিবে, আপনার ছায়ায় প্রতিপদে আপনাকেই হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা, পশ্চাতে বিদলিত অহঙ্কারের আর্ত্ত ক্রন্দন কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া তুলিবে, আত্মজনের স্নেহকরুণ মমতাচিত্র পদে পদে পথ কুহেলিকাচ্ছন্ন করিবার প্রচেষ্টা করিবে, নূতন সৃষ্টিমাত্রেই এইরূপ অস্পষ্ট অন্ধকারসমুদ্র মন্থন করিয়া নূতন আলোক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হয়, আজও সেই সনাতন নিয়মের ব্যাভিচার ঘটিবে কেন, সিদ্ধ তিলকে ললাট জয়মণ্ডিত করিয়া যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের এই একই প্রথায় তিল তিল করিয়া অমৃত সঞ্চয় করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী চাই। নূতন গঠনশক্তি যাঁহাদিগকে ধারণ করিতে হইবে, জাগরণের প্রথম পুরোহিতবর্গ, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে এই একটী ব্রতের চরণমূলে পূর্ণোৎসর্গ করিতে হইবে; ইঁহারা অগ্রদূত মাত্র, চির তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনরথখানিকে টানিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া দিবার জন্যই ইঁহাদিগের আবির্ভাব, সম্মুখের পথরোধকর পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাস্তূপ চূর্ণ করিয়া জাতির জন্য পথ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের একমাত্র কার্য্য; ইহারা জাতির আদর্শপুরুষ নহেন, নির্ম্মাণেই ইহাদের উল্লাস; পথ যখন প্রস্তুত হইয়াছে, নির্ম্মাণ যখন একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে,

তখনই ইহাঁদের কর্ম্মশেষ; জাগরণ সিদ্ধ হইলে নূতন জাতি সেই নবগঠিত পথে দলে দলে অগ্রসর হইবে, এই সুমহান্ পুলকদৃশ্য দেখিয়াই এই প্রথম বীরসন্ন্যাসীদলের ব্রত সার্থক ও পূর্ণ।

নূতন পথের স্রষ্টা যাঁহারা, উঞ্ছভোগে তাঁহাদের অভিলাষ নাই, কর্ম্মই ইঁহাদের ভোগ, নিত্যসৃষ্টিই ইঁহাদের কর্ম্ম, ভবিষ্যজাতির অনন্ত ভোগবিধানের জন্যই ইঁহাদের জীবন, আবার স্বতন্ত্র ভোগ কি! নূতন জগতের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া যে অপূর্ব্ব ভোগোল্লাস, সেই মহান্ আনন্দরাগেই ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ অনুরঞ্জিত, দিব্য আশীর্ব্বাদ ইহাঁদের অন্তরে, কর্ম্মের ইহাঁরা মূর্ত্তদেবতা, বৃহৎ অট্টালিকার ভিত্তিমূলে যে ইষ্টকগুলি আপনাকে ঢালিয়া দেয় তাহাদের সেইভাবে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই যেমন পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি, নূতন সৃষ্টির উত্তোলন যাঁহাদের জীবনস্তম্ভের উপর সম্ভব হইবে, তাঁহাদের এই ভিত্তিগত ইষ্টকস্তূপ হইয়াই পরম ও চরম সাফল্য, অন্য সার্থকতায় তাঁহাদের আকাঙ্খা নাই, প্রয়োজনও তো নাই।

তুরীয়ের এই দিব্য ইষণা যাঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বাংলার সেই শত শত সিদ্ধ সন্ন্যাসীকেই আজ তারস্বরে ডাক দিয়াছি, জাতির জাগরণের জন্য আপনাকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে কে অন্তর হইতে অভ্রান্ত নির্দ্দেশ লাভ করিয়াছ, ঠাকুরের মর্ম্মমন্থন করিয়া যে আকুল ইচ্ছা অব্যর্থ কণ্ঠে গমকে মূর্চ্ছনায় স্ফুরিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভৈরব রাগিণী শ্রবণে কাহার অন্তরাত্মা পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, আমি আজ আহ্বান করি তাঁহাদেরই, একদল কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী সৈনিককেই আজ ভারতের ভাগ্যবিধাতা অলিখিত সিদ্ধভাষায় কর্ম্মক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, জাতিগঠনের এই রুদ্র আহ্বান মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইবার মত সহস্র আধার কি সারা বাংলার জীবনসমুদ্র বিলোড়ন করিয়া মিলিতে পারে না?

কোটী কোটী মানুষকে জীবন দান করিবার জন্য ক্ষুদ্র আত্মজীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারেন, এমন বীরসাধক শতে শতে আমার দিব্য নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছেন, এ তো আজ আর আমার কাছে স্বপ্নের কুহককাহিনী মাত্র নয়; ঐ যে চলিয়াছে সারি সারি যোগী, তপস্বী, সিদ্ধকর্ম্মীর দল,—কণ্ঠে তাদের জয়মন্ত্র, হৃদয়ে বিশ্বজননীর প্রদীপ্ত আশীর্ব্বাদ, অব্যর্থ খনিত্র লইয়া তাহাদের রুদ্রহস্ত বাংলার জটিল জীবনারণ্য সুপরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছে,

একমুঠা অন্ন আর লজ্জা নিবারণের একখণ্ড বস্ত্র মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহারা কোটী কোটী নরনারীর জন্য ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ভারে ভারে সংগ্রহোদ্যত, ইহারা সোণার বাংলার বক্ষ চিরিয়াই স্বর্ণশস্যের সম্ভার উত্তোলন করিবেন, বাঙ্গালী জাতিকে অন্নেবস্ত্রে ভোগেসম্পদে গৌরবেসম্ভ্রমে ভরাইয়া তোলাই এই নূতন সমষ্টির তপস্যা।

নূতনের ধারা

যাহা আছে—তাহা যে একেবারেই অকেজো, অনাবশ্যক, এমন কথা আমরা বলি না, তবে সৃষ্টি হইবে একেবারেই নূতন আনকোরা, পুরাতনের বনিয়াদে নূতনের প্রতিষ্ঠা অস্বাভাবিক।

* * *

পুরাতন ও নূতনের মধ্যে পার্থক্য,—পুরাতন চাহে সবখানি ধার করিয়া টিকিয়া থাকিতে, আর নূতন অন্তরের সিদ্ধসম্পদে মর্ত্ত্যের বুকে নূতন রাজ্য নির্ম্মাণ করিতে চায়। পুরাতন আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন, শক্তির ছায়া লইয়া অপর অনেকের ছায়া মিশাইয়া সে সৃষ্ট পদার্থটাকে ঘন করিতে চাহে, নূতন কিন্তু আপনার শক্তিতে বিশ্বাসবান্, অপরের শক্তি আপনার সবখানি শক্তির সহিত যুক্ত করে, জোড়াতাড়া দিয়া বৃহৎ কিছু রচনার জন্য নহে, পরন্তু শক্তির অখণ্ডত্বে তার কোনই সংশয় নাই।

* * *

পুরাতন মায়াবাজী, আড়ম্বরপ্রিয়। ঢাকঢোল বাজাইয়া আপনাকে জাহির করিতে যেমন সে উন্মুখ, আবার অচিরে মাটীর উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেও তার বিলম্ব হয় না। নূতন আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়া ভিতরের সত্তাটীকেই মূর্ত্ত করিয়া তোলে, সেইজন্য তার প্রকাশের ভঙ্গী ধীর মন্থর, কিন্তু প্রতিষ্ঠা তার অটলস্থায়ী। পুরাতন প্রকাশ করে বাহিরের উপাদানে আপনাকে বিপুল করিয়া, স্থান ও কালের বুকে অধিকার বিস্তার-কল্পে সে প্রকাণ্ড বাহু বাড়াইয়া চলে, কিন্তু স্থান ও কালের সংগ্রামেই সে পরাজিত হয়, রহিয়া যায় মাত্র স্মৃতি, পুরাতনের বিরাট্ সৌধ কালের আঘাতে মাটীর বুকে লুটাইয়া পড়ে।

* * *

কথাগুলি আরও একটু স্পষ্ট করিতে হইবে। অধুনা ভারতবর্ষে নূতন ও পুরাতনের একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, কোথাও কোথাও পুরাতন, নূতন

বলিয়া পরিচয় দেয়, কোথাও বা নূতন পুরাতন পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়। সৃষ্টির বাহিরটা দেখিয়া এই নূতন পুরাতনের প্রভেদ নির্ণয় করিলে বিশেষ ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা।

* * *

আমরা এতদুভয়ের অন্তরপ্রদেশের কথা লইয়াই আলোচনা করিব। মানুষের বুদ্ধিতে যে কর্ম্মপ্রেরণা সমুদিত হয়, উহা প্রকাশের ধরণ অনুসারে নূতন পুরাতনের প্রকার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। পুরাতন, প্রেরণার মূলকেন্দ্র অন্বেষণে বৃথা সময় নষ্ট করে না, চিত্তে উহার যেমন-তেমন একটা ছবি আঁকিয়া নিজের অপূর্ণ সামর্থ্যটুকুকে অপরের খণ্ড খণ্ড সামর্থ্যের সমবায়ে কিছুকে মূর্ত্ত করিয়া ধরে, সে নির্ম্মাণ জগতের বুকে লক্ষ নিশানের মধ্যে আরও একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐরূপ সহস্র সহস্র জয়কেতু প্রতিদিন হাওয়ায় উড়িতেছে, আবার মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে, পৃথিবীর কিছু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যথেষ্টই সংস্কারক্ষয় হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* * *

নূতন ঐ একই প্রেরণা লাভ করিয়াছে, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার জন্য সে পূর্ণ সামর্থ্য লাভ করিতে চাহে, এবং অপরেরও পূর্ণ সামর্থ্যের সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করে; সেইজন্য নূতনের সৃষ্টি হয় বহুবিলম্বে, কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধি লইয়া, পূর্ণ অবয়বে; বাহিরে তাহার জাঁকজমক না থাকিলেও জাতির অন্তরে উহার প্রভাব অমরভাবে সঞ্চারিত হয়, নূতনের কর্ম্ম তাই—যাহা আছে সর্ব্বপ্রথমে তাহার অন্তরকে আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তোলা, কাজেই সৃষ্টি হয় অসংখ্য আকারে, অদম্য গতিতে—পুরাতনের মত জায়গা জোড়া করিয়া সে বসিয়া থাকে না।

* * *

একটা উপমা দিলে বিষয়টা সমধিক সরল হইবে। আমার অন্তর উদ্বুদ্ধ হইয়াছে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। তাহার জন্য আমার সামর্থ্যের কতটা প্রয়োজন তাহার পরিমাপ না করিয়াই ভিক্ষাপাত্র হাতে বাহির হইয়া পড়িলাম লোকের দ্বারে, সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান লইয়া গড়িয়া তুলিলাম আতুর-আশ্রম; কিন্তু যে উপাদানে রচিত হইল বিরাট্ মন্দির, উহার প্রতি ইটখানি একদিন খসিয়া পড়িবে, কেননা যাহাদের দান লইয়া আমার এই রচনা, তাহাদের দান তো আমার সিদ্ধইচ্ছাপ্রসূত

নহে, সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে দাতার হৃদয় তো লইয়া আসা হয় নাই; বাহির হইতে বোধ হয়, সম্পদ্ দিয়াই আমরা কিছু গড়িয়া তুলি, কিন্তু ইহা সত্য নহে, যাহা কিছু সৃষ্ট হয়, সে সমস্তই হৃদয়ের গড়া, দাতার হৃদয় না পাইলে আমার প্রেরণানুযায়ী তাড়াতাড়ি কিছু মূর্ত্ত করিয়া তোলা ভোজবাজীর মত হাতীঘোড়া বাহির করা--সমস্তটাই তার মিথ্যা, কেবল চক্ষের পরিতৃপ্তি।

* * *

নূতনের কর্ম্ম হইতেছে, যে কোন প্রেরণাই হউক, উহার উৎস-স্থানটিতে প্রথমে পৌঁছান; তারপর আপনার সবখানিকে মূলতীর্থে অভিষিক্ত করিয়া, শুদ্ধ ও শক্তিমন্ত হইয়া, বুদ্ধি চিত্ত মন প্রাণের ভিতর দিয়া, বাহিরে অবিকৃত অমরপ্রেরণার ঝঙ্কার তোলা, ও তদনুযায়ী জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া উহা প্রতিপালন করা। তবেই উহা একদিন একত্র হইয়া বৃহৎ আকারে প্রকাশ পাইলেও, সে সৃষ্টি অস্বাভাবিক কিছু হইবে না, পরন্তু সরল সত্যরূপটি লইয়াই মন্দিরে মন্দিরে ছড়াইয়া পড়িবে।

* * *

ভারতের ইহাই প্রকৃষ্টতম সাধনা। বর্ত্তমানে দেশে অন্তরপ্রেরণা প্রকাশের যে ভঙ্গী উহা একেবারেই পাশ্চাত্যের। অনেকেই মনে করিতে পারেন, যুগের সঙ্গে সঙ্গে মামুলী প্রথার পরিবর্ত্তন না করিলে, দেশের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে, আজ শতাব্দী কাল ধরিয়া শিক্ষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, সকলই তো প্রাচীনের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অসংখ্য Institution সৃষ্টি করিল, ফল কেবল আত্মপ্রসাদ লাভ, পরন্তু স্থায়ী কিছু হইয়াছে কি? আজ যাহা অতি পুরাতন, তাহাকেই নবীন আকারে বরণ করিয়া লইতে হইবে, ভারতের সনাতন প্রথাটিকেই আজ আমরা নূতন মন্ত্রে জীবনদান করিয়া অভিনন্দন করিয়া লইব।

* * *

অধুনা পাশ্চাত্যজ্ঞানদীপ্ত মনীষীবর্গ এই একটা প্রশ্ন তুলিতে পারেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মপ্রেরণাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, একজনের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম কেন অপরজনের মধ্যে প্রবেশ করাইবার প্রয়াস? ইহা কি একটা হামবড়া অহঙ্কারের ভাব নয়? এক্ষেত্রে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইন্‌ষ্টিটিউশন্ গড়িয়া মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার বিপর্য্যয় সাধনও তো একটা বিরাট্ অহঙ্কার, শুধু অহঙ্কারপ্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন, এইটুকু

ছাড়া একজন অপরজনকে অন্য কোন অপরাধে অপরাধী করিতে পারে না।

* * *

যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া দিলে ইহা আদৌ অহঙ্কার নহে,—কেননা, যদি মানবাত্মার অখণ্ডত্বে বিশ্বাস করা যায়, এবং প্রতি মানবের মধ্যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ কোন সত্তার অধিষ্ঠানে নিঃসংশয় হওয়া যায়, তাহা হইলে এক-জনের কর্ম্মক্ষেত্র, অপরজনের দৃষ্টিসীমার অন্তর্গত করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও, উহা তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য নহে। অন্তর যেখানে এক হইয়াছে, সেখানে আমার সবখানি তোমার সবখানির সঙ্গে মিশাইয়াই আনন্দ, এখানে জোর জবরদস্তির কথা একেবারেই নাই, বরং আত্মা অভিন্ন হওয়ায় প্রতিজনের সংগ্রহ দান প্রতিদানে গুণবৃদ্ধিই করিবে, ভাবের আরোপ চিরদিন টিকে না, মানবসত্তার উপর যাঁহাদের অখণ্ড বিশ্বাস ও মর্য্যাদাজ্ঞান আছে তাঁহারা এ কথাটা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

* * *

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—ভারতের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী য়ুরোপের কর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া চলিলে, আমরা সাময়িক একটা উৎসাহে ও উত্তেজনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিব বটে, কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডে যথার্থ শক্তি সঞ্চার করিতে অসমর্থ হইব।

নূতন পুরাতনের প্রভেদ আর কিছুই নহে, যখন ভারতবর্ষ যোগসিদ্ধ সত্য পথটি হারাইয়া—অন্ধভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, আর হুঙ্কার দিয়া বলিতেছিল—ভারতের বিশেষত্বরক্ষার জন্য ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন পাশ্চাত্যের খরতর প্রভাব উহার অন্ধ দৃষ্টির উপর বিস্তৃত হইয়া উৎকট পরিহাস জুড়িয়া দিয়াছিল, তখন এই পাশ্চাত্যের বিচিত্র খেলাকেই নূতনের প্রভাব বলিতে পরাঙ্মুখ হই নাই, কিন্তু কেবল আমাদের ব্যর্থ আত্মরক্ষার বিপুল প্রচেষ্টাকে নিরর্থক করিয়া তুলিতেই ইহার আগমন হয় নাই, আজ পাশ্চাত্যের হাবভাব শিকড় গাড়িয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, সত্য সত্যই ইহা ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে; তাই আজ নূতন, ভারতের তপোলব্ধ জ্ঞান লইয়া এই পাশ্চাত্যের সৃষ্টিপ্রথার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—পাশ্চাত্যের উপকারটুকুকে উপেক্ষা করিয়া নহে, বরং তাহার যোগ্য দান মাথায় করিয়া আজিকার এই নূতনকে আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে।

যোগ-দৃষ্টি

যে কর্ম্ম আরম্ভ করা গিয়াছে—আত্মসমর্পণযোগ গ্রহণ করিলে, উহা সংসিদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্টই সুবিধা হইবে, নিজের চেষ্টায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু তো করিতে পারিলাম না, দেখি এই যোগে যদি কিছু হয়, ঠিক এইরূপ মনোভাব লইয়া যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিবেন, তাঁহারা যে একেবারেই যোগের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইবেন ইহা অবধারিত; কেননা আজ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাই যে অভ্রান্ত এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শ উল্টাইয়া যাইতে পারে, জীবনের সত্যকর্ম্মটীকে ধরিবার জন্যই না আত্মদর্শনের প্রয়োজন?

আমার জীবন লইয়া যাঁহার খেলা, বাহিরের লীলাভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার সম্যক্ নির্দ্ধারণ সব সময় ঘটিয়া উঠে না, জীবনদেবতার সাক্ষাৎ পাইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। আপনাকে যাঁহারা কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, ভগবান্‌কে মানিয়া চলিতে হইলে, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন আছে।

যুক্তি তর্কে ইহার অবধারণ অসম্ভব। ঐ সকল বাক্‌বিতণ্ডা আর ভাল লাগে না, কি করিলে, কোন্ পথ ধরিলে তাঁহাকে পাওয়া ও জানা যায়, ইহারই স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইবার জন্য অনেকেই আকুল হইয়াছেন—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আলোচনা করিব।

যোগের প্রথম প্রকরণ—আত্মবিশ্লেষণ। বেশ ভাল করিয়া শরীর প্রাণ চিত্ত মন বুদ্ধির সহিত আত্মাকে স্বতন্ত্রবোধে অবধারণ। একদিকে আধার ও আধারস্থিত অন্তঃকরণসমূহ, আর অপরদিকে এই সকল হইতে পৃথক করিয়া আপনাকে দেখা। দেখিলাম বলিলেই চলিবে না, চাই একটা সত্য অনুভূতি। শরীর যে একেবারেই জড়, যদি প্রাণের তীব্র অনল-ইন্ধন না থাকে। আবার চিত্তের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণকে

নিপীড়িত করে, ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে মনের দর্শনে—এই সকল তত্ত্ব গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। বুদ্ধি অসংখ্য কর্ম্মসৃষ্টির মধ্যে বিচলিত, বিভ্রান্ত। হিত অহিত ভালমন্দ বিচার, বিচিত্র কল্পনা জল্পনার ভিতর দিয়া চিত্তে রেখাপাত, প্রাণকে উত্তেজিত করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি অন্তরের অসংখ্য লীলাভঙ্গী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

কিন্তু বুঝিবে কে? শরীর প্রাণ মন প্রভৃতির সহিত আপনাকে হারাইয়া বসিয়া থাকিলে যোগ তো আরম্ভই হইবে না। সেইজন্য সর্ব্ব প্রথমে আত্মদর্শনের অনুকূল সঙ্কেতগুলিকে বুদ্ধি দিয়া গ্রহণ কর, তারপর আপনাকে পৃথক করিয়া দ্রষ্টা হিসাবে অন্তরের খেলাগুলিকে অবহিত দেখিয়া যাও, সংস্কারানুযায়ী প্রিয় অপ্রিয় কর্ম্মসৃষ্টিতে বিচলিত হইও না, কেমন করিয়া কার্য্যাদি ঘটিতেছে, কেমন করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রগুলি স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মরত হইতেছে প্রভৃতি নিরাসক্ত হইয়া দর্শন কর, এইরূপ দেখিতে দেখিতে, আপনাকে যন্ত্রাদির সহিত সংযুক্তভ্রমে যে কর্তৃত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার নিরসন হইবে, ক্রমেই দেখিবে যন্ত্রগুলি নিজেও চলে না, তুমিও চালাও না, অন্য কোন এক তৃতীয় শক্তি ইহাদের যথারীতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে, তুমি দ্রষ্টামাত্র, আপনাকে প্যাশিভ (passive) করা অর্থে সাধারণের ধারণা, সব গুটাইয়া বসিয়া থাকা, কিন্তু সব গুটাইয়া রাখার অধিকার যে আমার নাই, এই সহজ জ্ঞানটা তাহাদের থাকে না, সেই তৃতীয় শক্তিই যে সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা, এই ধারণা দৃঢ় করিবার জন্যই যোগারম্ভে প্যাশিভ হইবার কথা বলা হয়।

বাসনা ও চেষ্টা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ হইলে কোন কার্য্যই তো করা যায় না, এমন ধারণা অভ্রান্ত নহে। কেননা কার্য্য যাঁহার, তিনি আমাদের অপেক্ষা কতবড় শক্তিশালী, তাহা ধীরে ধীরে উপলব্ধি হইবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা এবং অশান্তি বোধ হইলেও যোগশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাই স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। বরং আমরা যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত, তাহার বিপরীতে কিছু করিলে এইরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্য, আধার এবং আধারস্থিত যন্ত্রাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বোধে অবস্থান করিবার সময়ে, আপনার মধ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই সময় উত্তম সাহায্যকারীর উপদেশ এবং আদেশবাণী পাইলে সাধকের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে, এই যোগের গুরু কেহ নাই, যে শক্তি

অবাধে জীবাধারে লীলাপ্রকাশ করিবেন, তিনি বিশ্বশক্তি, সকলের মধ্যেই সমানভাবে অবস্থিত, অহংকারকে যে উপায়ে যতশীঘ্র দূর করা যায়, তাহাই শাস্ত্র এবং প্রণালী এবং যোগশক্তি ততই প্রবল হইয়া উঠে।

দ্রষ্টাস্বরূপ আপনাকে অবিচলিত রাখিবার সময়ে আপনার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা চাই। এবং সেই তৃতীয় শক্তি, তিনি ভগবান্‌ই হউন, কোন দেবতাই হউন, প্রকৃতি অথবা মানব কিম্বা কোন বস্তুবিশেষ যাহাই হউন না, বিশ্বাস অটল রাখিতে হইবে। আধারযন্ত্রটিকে এই তৃতীয় হস্তে সম্যক্ প্রকারে ছাড়িয়া, দূরে দাঁড়াইয়া কেবল পর্য্যবেক্ষণ কর, তুমি সবই করিতেছ এরূপ অনুভূতি একেবারেই আনিবে না, এরূপ বোধ হইলেও উহাকে সবশক্তি দিয়া দূর করিয়া দিবে, তুমি যে কর্ত্তা নহ, নিয়ন্তা নহ, এরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিবে, তুমি দ্রষ্টা—কর্ত্তা যাহা করিতেছেন আমি কেবল তাহা দেখিতেছি মাত্র, যোগের ইহাই সর্ব্বপ্রথম স্তর।

এই দ্রষ্টৃত্ব জ্ঞানকে ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়া দিবে। কেবল আপনার মধ্যে নহে, সর্ব্বভূতে এই একই প্রক্রিয়া চলিতেছে—এইরূপ অনুভূতির প্রতিষ্ঠা করিবে। জীব, জানিয়া অথবা না জানিয়া তোমার মতই নির্ব্বিকার, তৃতীয় কোন শক্তি জীবজগতের কর্ণধার। তুমি জানিবার জন্য সাধন আরম্ভ করিয়াছ, উহারা করে নাই, কেবল এইটুকু পার্থক্য—নতুবা সকলের মধ্যেই একভাবে কার্য্য চলিতেছে।

যে দিন সকল কর্ম্মের মধ্যেও তোমার নির্ব্বিকার অবস্থান সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে, তখন আবার এক নূতন জ্ঞান স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তুমি দেখিবে কার্য্য করিতেছেন যিনি তাঁহারও পশ্চাতে শক্তিমান্ অধীশ্বর আছেন, তাঁহার আদেশেই এই সব হইতেছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্—তিনি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ইচ্ছায় এক বিদ্যুৎশক্তি উদ্ভূত হইয়া জগতে ক্রীড়ারত, পুরুষ ও প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় লীলা দেখিয়া তখনই তোমার জাগ্রতে সমাধি আসিবে—আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার করিয়া তুলিতে পারিলে তোমার আধার বলিয়া তখন কিছুই আর থাকিবে না—যাঁহার আধার তিনিই উহা পরিচালিত করিতেছেন, তুমি দ্রষ্টাস্বরূপ কেবল দেখিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছ।

ক্রমে তোমাকে ঘিরিয়া এই আনন্দ এক বিপুল চেতনার সঞ্চার করিবে, তখন তুমি দেখিবে উপর হইতে মাঝে মাঝে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ

তোমাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, ধীরে ধীরে জ্ঞান-সূর্য্যের দিব্য প্রভায় আপনাকে পরিপূর্ণ আকারে জানিয়া, দেখিবে, তুমি ঈশ্বর হইয়া গিয়াছ, যে সকল অধিকার একে একে ত্যাগ করিয়া এতদিন সাধনা করিতেছিলে, তোমার আপনাকে জানিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল, তুমি জানিতে না পারিলেও তোমার ভিতর হইতেই সকল কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। আর এই জানা কেবল তোমাকে লইয়া নহে, জগতের প্রতি আধার প্রতি বস্তু প্রতি ঘটনা প্রতি কথার মধ্যে ঐ এক জানাই কার্য্য করিতেছে, তুমি কেবল একার ঈশ্বর নহ, সর্ব্বজীবের ঈশ্বর। এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে যে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমাত্মাও তুমি। জগতের সকল বিষয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, তুমি জগৎ ছাড়িয়া কিছুই করিতে পার না, কেননা আপনাকেই অসীম করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছ—আপনাকে গুটাইয়া লওয়া অর্থে সারা বিশ্বকেই গুটাইয়া লওয়া, কিন্তু তাহা তো তোমার ইচ্ছা নয়, তোমার আধার এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই নহে, সেই পরমাত্মার লীলা-নিকেতন। জন্ম মৃত্যু, শোক আহ্লাদ, দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্য, সমস্তই আনন্দের বিকাশ, তুমি সচ্চিদানন্দময়—কিছুতেই তোমার স্পৃহা নাই, অথচ আনন্দের জন্যই সব সৃষ্ট, চালিত, পরিবর্দ্ধিত, সীমাহীন ছেদহীন অনন্ত লীলানাট্যের রঙ্গভূমি এই জগৎ বিচিত্র আনন্দময়—যোগের পূর্ণসিদ্ধি অন্তরাত্মার এইরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি, না শুধু অনুভূতি নয়, একেবারেই ভাগবতময় হওয়া, এই অবস্থায় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ছোট বড় করিয়া তোলা নয়, সর্ব্ব অবস্থায় সমান ভাবে আনন্দ বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করা।

এই আধার, ঐ আধার, সেই আধার, কোন্ আনন্দ প্রকটনের ক্ষেত্র, তখন তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। আমার, তোমার, তার, সকল কর্ম্মের মধ্যেই আনন্দ তখন উৎসৃত হইয়া থাকে, অনুকূল প্রতিকূল, স্বপক্ষে বিপক্ষে, প্রকাশের তারতম্যে বিচিত্র অনুমিত হইলেও, সিদ্ধের নিকট উহা সমানভাবেই পরিগৃহীত হয়—এই আমি, এই তুমি, এই জগৎ, এই কর্ম্ম, এই ভাব, সবই থাকিয়া যায়, পরিবর্ত্তন হয় ভিতরে, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের উঠা নামা তখন আর ঘটিয়া উঠে না। কর্ম্মের এখন যে অর্থ, যে মর্ম্ম, তখন তাহা ভিন্ন বোধে পরিগৃহীত হয়।

অন্তরকে এইরূপ দৈবীভাবে গড়িয়া তুলিলে, সৃষ্টি থাকিবে, তবে হইবে সমধিক

শক্তিশালী, অপূর্ব্ব শোভাসম্পদ্‌ময়। জগতের বুকে মৃত্যু যে থাকিবে না, কর্ম্ম যে রহিত হইবে, এমন নহে, তবে মানুষ হইবে নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক, আনন্দপূর্ণ, মানুষের হৃদয়ে বহিবে অনাবিল প্রেম, প্রাণে জ্বলিয়া উঠিবে দুর্জ্জয় উৎসাহ, আর আধার গড়িয়া উঠিবে, স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে নূতনভাবে, উহাই খৃষ্টের স্বর্গরাজ্য, ভারতের সনাতন যুগ। খৃষ্ট চাহিয়াছিলেন যে সম্পদ্ ঊর্দ্ধ হইতে নামাইয়া আনিতে, তাহা অবতরণ করিবে, মাটীর বুকে নয়, মানুষের হৃদয়ে; মানুষ পরিপূর্ণ হইবে ভগবদ্‌ভাবে, আপনাকে ভাঙ্গিয়া মাটীতে মিশাইয়া নয়, আপনার অস্তিত্বটাকে আরও নিরেট ও পরিপূর্ণ করিয়া; মানুষের আজ যাহা বাসনা তাহা ভাগবত ইচ্ছায় অবিকৃত ও বিপুল আকারে প্রকাশ পাইবে, সাধনা সৃষ্টিকে উড়াইয়া দিবার জন্য বা আপনাকে লয় করিবার জন্য নয়, পরন্তু এই যাহা কিছু তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্যই; মানুষের অন্তর যে দিন ভগবানে পূর্ণ হইবে, সৃষ্টি সে দিন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

ভাবের চিঠি

মালা ফল্‌তা,
২৪শ পরগণা।

প্রিয়তম,

আজ দিন তিনেক হ'ল, আমার ভাঙ্গা পা খানি আবার ভেঙ্গে গেছে। খুব কাজকর্ম্মে লেগে গিয়েছিলেম, ভোর ৫টা থেকে কোদাল কোপান, মায় ৭টা রাত্র পর্য্যন্ত। তাই বুঝি প্রকৃতিরাণী আমার পা ভেঙ্গে কিছু-দিনের জন্য বসিয়ে দিলেন, যাতে আধারের অন্যান্য যন্ত্রগুলিও বিকশিত হবার দিন কতক অবকাশ পায়। আমার মত অশান্তের সর্দ্দারকে কর্ম্ম থেকে ছিনিয়ে দু'দশ দিন ভাবের ঘরে টেনে আন্‌তে হ'লে, ভগবান্‌কে মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা মতলব আঁট্‌তে হয়, নইলে খোঁড়া পাখানিকে আবার ভেঙ্গে দিয়ে কিছুকালের মত বিছানায় শুইয়ে রাখার অন্য কোনও তো মানে দেখ্‌তে পাই নে। যে সুবোধ ছেলে, একটু আধটু দরদে তো বসে থাক্‌ছিনে, কোন মতে লেংচে লেংচেও মাঠে মাঠে ছুটে যাব, একটু গুরুতর রকমের অথর্ব্ব হ'য়ে যখন পড়ি, তখন কাজেই গুটিশুটি হয়ে কোন রকমে একটু শান্তশিষ্ট ভাবে শুয়ে থাক্‌তে হয়— আমার পা ভাঙ্গার ফিলজফিটা একটু বেশী করেই লিখে ফেল্‌লুম, কেন না আগেই বলেছি তো এই রকমের দুই একটা অবসরমুহূর্ত্তেই আমার ভিতরের প্রেরণাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়, এ যেন আমার অবকাশমত দাঁড়িয়ে জীবনের ইঞ্জিনঘরে কয়লা পূরে নেওয়া, সুযোগ বুঝে ভাগবত তরঙ্গগুলি ফোঁস ফোঁস করে' জেঁকে বস্‌ছে—কি আর করি, এই তারহীন বার্ত্তাগুলি receive করা যাক্, তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে এখন পৃথিবীর বুকে আরও শুদ্ধ ও শক্তিমন্ত হ'য়ে। আমার অন্তরপ্রবেশের উপায়টুকু বড় স্থূলরকমের নয়? তা আর কি করা যাবে, তাঁর ইচ্ছামত আমায় চোখ বুজিয়ে বসিয়ে রাখুন আর টাট্টু ঘোড়ার মত ছেঁটান, তাতে আমার হাঁ না বল্‌বার কিছুই নেই, তবে কিনা আমার ঐ আবাল্যের স্বভাবটুকু, সেটাকে আজও বাগ্ মানাতে

পার্‌লুম না, সুযোগ পেলেই ছুট, প্রকৃতির কোলে হাফদাঁফ কর্‌তেই যেন আমার জন্ম—কাজেই আমাদের মত নিত্য নূতন পথের অভিযাত্রীর পক্ষে ডাইনে বাঁয়ে মুখ ফেরাবার জন্যে বেচারা ভগবান্‌কে এই স্থূল ও মোটা গোছেরই লাগাম টানা মক্স কর্‌তে হয়েছে, এতে তাঁকে বিশেষ কিছু খেলো হ'তে না হ'লেও একটু অকবি ইব প্রতীয়মান হ'তে হয়েছে, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই, তবে উপায় কি বলুন!

এবার শুনুন আমাদের এখানকার একটু ইতিহাস। আমাদের চাষবাস আপাততঃ শেষ হয়েছে, তাতো জানেনই। আমাদের সোণার বরণী রাণীকে মাথায় করে' এনে, আমাদের ঘর ও আঙ্গিনা মধুময় করে' তুলেছি। সে অধ্যাত্ম মধুর আস্বাদ বাইরে বড় কেউ সচরাচর তো টের পায় না, সেদিন মনে হ'ল বাইরেও একটু আনন্দঢেউ গড়িয়ে দেওয়া যাক্ না। কি হবে,—খাওয়া, আমোদ, ছোটখাটো একটা মেঠো উৎসব। তাই ঠিক হ'ল। গোলযোগ তো বেশী কিছু নয়, ডাক্ আর দিতে হ'ল না, ভোর সকাল থেকেই আমাদের বন্ধুবর্গ আর আমাদের স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা, যারা মাঠে ময়দানে আমাদেরই সঙ্গে আশেপাশে স্বেচ্ছায় উল্লাসে কাজকর্ম্ম করেছিল, সবাই আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। কয়েকজন পাড়ার অনুরাগী কৃষকবন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করা হ'ল। কাঠমোট পাতা সব যোগাড়—ক'এর বউ গাছকোমর বেঁধে রাঁধ্‌তে লেগে গেল—আর তার মা বাট্‌না কুট্‌না সুরু করে' দিলেন। আমি বেচারা একটু আধটু সাহায্য কর্‌তে যাবো কি, পুকুরে আলু ধুতে গিয়ে সিঁড়ি নাম্‌তে নাম্‌তে পা'টি হঠাৎ পুটুস করে' ভেঙ্গে বস্‌লুম—কত নারিকেল গাছে উঠি, কত পুকুরপাড় থেকে জলে ঝাঁপ খাই, তা তো আর আপনাদের জান্‌তে বাকী নেই, সোম নদীর তীরের বুলেটগুলো কানের পাশ দিয়ে গান গেয়েও গিয়েছে, আর মেডিটারেনিয়েনের উন্মত্ত ঢেউগুলার সঙ্গেও কিছু কিছু কোস্তাকুস্তি করা গিয়েছে—কিন্তু যখন হয়, তখন এমনি মুট্ করে'ই ভাঙ্গে, এখন কিছু-দিনের জন্য ত শয্যাশায়ী! রান্নার যা সাহায্য কর্‌বো মনে করেছিলুম, তা মনেই রেখে দেওয়া গেল, মুখ চোখ ছাড়া আর কিছু দিয়ে উপকার কর্‌তে পার্‌লেম না—এইটা এইরকম ওটা ঐরকম কর, দাওয়ায় বসে মুড়ুলী করাই তখন আমার যা কিছু কাজ।

খেতে দেতে বেলা ২টা বাজ্‌লো। পাতে দেখ্‌লেম, আমাদের ক্ষেতের

মোটা চালের ভাত,—মোটা চাউলটা আমারই পছন্দমত হয়েছিল—ক্ষেতেরই অরহর ডাল, পুকুরে জাল ফেলে ছেলেরা যে মাছ ধরেছিল, তারই টক, আর আমার সাধের—মাংস। মহানন্দে ২৷৷০টার সময়ে ভোজনাদি শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে সকলে বাড়ী গেল, আমার আর যাওয়া হ'ল না, সেইখানেই পড়ে' রইলেম—আমার বিশিষ্ট বাড়ী যে কোন্‌টি, তা তো আজ পর্য্যন্ত জানিনে—তবে যেখানে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি, সেইখানেই আমার বাড়ী।

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ একসঙ্গে খেয়েছিল—তার মধ্যে ধরুন না, আমাদের পণ্ডিত আর দুজন ব্রাহ্মণ, জন ১৬ কায়স্থ, ১৮জন পোদ ও কৈবর্ত্ত, একজন কলু, একজন যুগী ও একজন সত্যই চাঁড়াল ছিল। আমি সকলকেই বেশ চিনি, তবে কে কি জাত তার বিশেষ কিছু সংবাদ রাখ্‌বার আমার সময় হয়নি—আজই প্রথম গ্রামের লোক একটু কাণাকাণি কর্‌ছে শুন্‌লেম, তারপর সব নিভে গেল। ভগবান্‌ই সব আচার নিয়মাদি গড়েছেন, তা ভাঙ্‌বার কারও অধিকার নেই, তবে তিনিই তাঁর আচারসমষ্টির যে অংশ থেকে তাঁর সহি (Sanction)টুকু তুলে নিয়েছেন, তা আপনি ভেঙ্গে পড়ে যায়, মানুষ উপলক্ষ মাত্র। সে নিয়ে তখন লোকেও আর লড়্‌তে পারে না, কারণ ঐ বেড়ার মধ্যে যেটুকু সত্যি ছিল—তাঁর স্বাক্ষর-চিহ্ন, তা চলে গেছে, মাকড়সার মত তাঁর সত্তার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জালও তিনি গুটিয়ে নেন, আমরা কেবল জড়সংস্কারবশে (inertia) জাল এখনও রয়েছে মনে কর্‌ছি, তা ছাড়া, দেখ্‌ছি কেমন আপনা থেকেই একটা শিল্প আমাদের সকল কাজ কর্ম্মের ভিতরেই গজিয়ে উঠ্‌ছে। সে সূক্ষ্ম শিল্প যার অন্তর্দ্দৃষ্টি একটুও ফোটেনি, সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বে না—এ শিল্পের ধরণধারণও একটু বিচিত্র, সেটা লোকমতের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করার তীব্র প্রচেষ্টাও নয়, আবার অন্ধবুদ্ধির রুদ্র ব্যাভিচার (Social anarchism)ও তা নয়—আমাদের মনে হয় ও দুইটাই মনের বন্ধন ও অহংপ্রসূত। জীবনে এই আপনি-ফোটা আর্ট থাক্‌লে লোকের সঙ্গে মিছামিছি অনাবশ্যক রকমের অকালযুদ্ধ কর্‌তে হয় না।

এবার অনেকেই রবিখন্দের চাষ করেছে। আমরাও করেছি। এ বছর অনেক বেশী খন্দের চাষ হয়েছে। ঐ চাষ প্রায় এদেশ থেকে উঠে যাচ্ছিল। আর এ অঞ্চলের লোকের চাষের প্রতি যেন একটা আস্থা

হয়েছে। এটা আমার অন্তরের অনুভব। আর একটা কথা শুনলে আপনাদের খুব আনন্দ হবে, আমাদের স্কুলে যেমন চাষা শিক্ষিত হচ্ছে, তেমনি আমাদের মাঠে শিক্ষিত চাষাও হচ্ছে।

আমার পা খোঁড়া হয়েছে বলে' কাজ বন্ধ নেই, ছেলেরা কেউ বোট নিয়ে গেঁয়োখালিতে ধান কিনতে ছুটেছে, কেউ কুমড়া বাড়ী মেরামত করছে। আর আমি স্থির হয়ে এইখানে বসে' কি আর করবো, আপনাদেরই ভাবছি।

সেদিন এক দূরসম্পর্কের বন্ধু বলছিলেন, যে আমরা যেরূপে চলেছি, তাতে আমাদের অধ্যাত্মবিকাশ সম্যক্ হবার সম্ভাবনা আছে কি? এই কথা শুনে আমাদের একজন একটু রেগে উঠে তাকে দুকথা শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। উভয়েরই কথাগুলি আমি একটু হেসে ধীরভাবে কাণ পেতে শুনলুম—বললুম জীবনের সমস্ত সময় ও শক্তি ভাগবত কর্ম্মে নিয়োজিত করেও যদি ভাগবতজীবন লাভ না হয়, তবে আর কোনও উপায়েই হবে না, এইটুকু অন্ততঃ খুব জোর করেই আমি বলতে পারি। তবে উৎসর্গ-মন্ত্রটিকে নিত্য স্মরণ রাখতে হবে বৈ কি! আমাদের অন্তরের মধ্যে ভাবে থাকতেই হবে, তাঁর কথাগুলি শোনবার জন্য। এই রকম স্বাভাবিক ভাবেই যাতে অধ্যাত্ম জীবনের দিন দিন ক্রমপ্রকাশ হয়, সেইটাই তো আমাদের অন্তরদেবতার ইচ্ছা—ধ্যানধারণাগুলো আমি তো দেখছি বেশ স্বভাবনিয়ন্ত্রিতই হয়ে উঠছে।

এরকম একটা প্রশ্ন অনেকদিন থেকেই এখানে কাণাকাণি শুনছি—ধর্ম্মের দল আবার লাঙ্গল কাঁধে মাঠে চাষ করছে নাকি! দেশে এরকম সমস্যা যে উঠবে, এটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নয়; আমরা অনেকদিন থেকেই সেই ধর্ম্মের দুয়ারে ধন্না দিয়ে এসেছি, যা মাটির দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতেই মানুষকে দিনেরাতে শিক্ষা দিয়েছে, আমরা মাটির পরশ একেবারেই হারিয়ে বসেছি, জীবন যে সেইখানে, অমৃত যে এই স্বর্গরেণুরই পরতে পরতে, স্বর্গরাণীর স্নেহধারা যে এই মাতৃ-স্তনকেই নিঙড়ে নিঙড়ে পান করতে হবে, কোন্ সয়তানের কুহকে সমস্তই আমরা ভুলে গিয়েছিলেম—এমনি মাতৃহারা হয়েছি বলেই তো দুনিয়ায় আজ আমাদের মত লক্ষীছাড়ার জাত দুটি মেলা ভার হয়েছে। যাহোক ভগবান্ শুভদৃষ্টি ফেলেছেন, সময় থাকতে ভুল ধরা পড়েছে, একদল

অগ্রদূতকে এই পুণ্য পতাকা তুলিয়ে বাংলামায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে' পথ দেখিয়ে দিতে হবে—এদের বহুদিনের গতানুগতিক অলসধর্ম্মের জের-টুকুর সঙ্গে একহাত যে লড়ে যেতে হবেই, তা আমাদের সকলেরই জানা উচিত, সেটা তো গৌরবেরই কথা। তবে দেখ্‌ছি কাজটা শক্ত হ'লেও ফল হাতে হাতেই ফল্‌তে সুরু হয়েছে—এই পল্লীরই রৌদ্র জলে ছুটাছুটি কর্‌তে গিয়ে যাদের সঙ্গে সংস্পর্শে আস্‌তে হয়েছে, তাদের আস্তে আস্তে মতি-পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে আরম্ভ হচ্ছে, এটা দিন দিন স্পষ্টই অনুভব কর্‌ছি, আমার হৃদয় আশায় ভরে' উঠেছে, বাংলার কর্ম্ম দিন দিন শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছে, এ আমি দিব্যনেত্রে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

চিঠিখানি দীর্ঘ হয়ে গেল, কলম এইখানেই বন্ধ করা যাক।

* * *

অলমিতি

অভিজ্ঞান

(১)

দেবসভা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। স্ফটিকস্তম্ভবিজড়িত মন্দারমালা ম্লান, কনক-কলসোপরি আম্রশাখা শুষ্ক, অনাবলী, ব্রহ্মবীণা, শারঙ্গী, ত্রিশবী, শতচন্দ্রী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রনিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সুন্দরীচরণস্খলিত মঞ্জীর অনাদরে নীরব—কিন্নরীকণ্ঠ রুদ্ধ, সুরভিমলয় ক্ষীণশ্বাস, ম্লানমূর্ত্তি দেবরাজ ইন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে অমরগণ নতশিরে চিন্তামগ্ন—ললাট কুঞ্চিত, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠযুগলে বিদ্যুৎরেখার মত সঙ্কল্পের ঈষদাভাস ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত, আবার উহা মিলাইয়া যাইতেছে—জড় পাষাণমূর্ত্তির মত দেবগণ ঘোরতর সমস্যাসমাধানে ধ্যাননিরত।

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। হেমাসনে দেববৃন্দ সুখাসীন হইয়া, বিচিত্র বসনভূষণ প্রসাধনে অপূর্ব্বরূপময়ী অপ্সরাবৃন্দের ললিতকণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী শ্রবণ করিতেছিলেন, চারু অঙ্গের মনোরম অঙ্গভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া মধুর আবেগপূর্ণ বঙ্কিমদৃষ্টি দিয়া অনর্গল পুলকহিল্লোল উৎসৃত হইতেছিল, কুসুমের সৌরভ, মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল, ভৃঙ্গের রিহঙ্গের কলতান, স্বর্গের অনাহত আনন্দের সুর অটুট রাখিয়াছিল, শ্বেতচম্পকবর্ণ কোটী চন্দ্রপ্রভায় দেবসভা সমুজ্জল ছিল, সহসা দেবরাজের কনককিরীট ম্লান হইয়া গেল, কিন্নরীকণ্ঠে স্বরভঙ্গ হইল, সমীরণ অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, কিরণমালা প্রভাহীন হইয়া পড়িল, স্বচ্ছ নীলাম্বর কে যেন মসীলিপ্ত করিয়া দিল।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বাসবের বজ্রকণ্ঠ পরিশ্রুত হইল—"দেবগণ, আদেশের মর্ম্মার্থ বুঝিলে কি?"

দেবগুরু বৃহস্পতি কমলদলপরিশোভিত স্ফটিকবেদীর উপর সমাসীন থাকিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম—আবার মর্ত্ত্যলীলার প্রয়োজন হইয়াছে। নারায়ণ জাগিয়াছেন—দেববৃন্দকে প্রস্তুত হইতে হইবে।"

ফণিমালাবিজড়িত রত্নসিংহাসন হইতে পবনদেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "প্রস্তুত হইয়াই আছি, কোথায় ঝাঁপাইয়া পড়িব?"

সহস্রাক্ষ শান্ত স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন "বুঝিয়াছি, জম্বুদ্বীপের আর্ত্তকণ্ঠ এইবার কর্ণগোচর হইয়াছে, ভোগরত—সৃষ্টির সকল সংবাদ রাখিবার অবসর নাই, ঊর্দ্ধ হইতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণী ঝঙ্কৃত হইলেই চেতনা ফিরিয়া আসে, এক্ষণে কেন্দ্রস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।"

আজন্ম ব্রহ্মচারী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, ময়ূরসিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া বজ্রপাণির চরণতলে নতজানু হইয়া বলিলেন, "আদেশ করুন, ভগবান্ বাসুদেবের অবতরণকেন্দ্র আমিই স্থির করিতে বাহির হইব।"

দেবরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া ষড়াননকে বিদায় দিলেন। সেদিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

(২)

স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের সন্ধিপথ বহুদিন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—শিখিধ্বজ অন্তরীক্ষে বহুদিন বিচরণ করিলেন, কত গ্রহ নক্ষত্রের অন্তর্বর্ত্তী হইলেন, মানবশরীরের সন্ধান কোথাও পাইলেন না, সূক্ষ্ম আত্মার অসংখ্য বিচরণ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মর্ত্ত্যের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ দিতে পারিল না। অসংখ্য সূর্য্যচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বুধগ্রহে আসিয়া উপনীত হইলেন, জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মার নিরবচ্ছিন্ন ব্যগ্রতা দেখিয়া জিজ্ঞাসায় বুঝিলেন, তাঁহারা মর্ত্ত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—অবতরণপথ নির্ম্মাণে ব্যস্ত আছেন। সিদ্ধসেন তাঁহাদের নিকট হইতে মর্ত্ত্যের নির্দ্দেশ পাইলেন। দেখিলেন, সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকারস্তূপ হইতে এক অতি অস্ফুট ক্ষীণ জ্যোতিঃরেখা ঊর্দ্ধপ্রদেশে ক্রমপ্রসারিত হইতেছে—দেবশক্তিবলে, ঐ সূত্রপরিমিত জ্যোতিঃপথ ধরিয়া তিনি নামিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমেই রজতশুভ্র চন্দ্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঐ স্থান হইতে অতি স্পষ্ট তিনি নিরীক্ষণ করিলেন, সূর্য্যকরোদ্ভাসিত উন্নত গিরিশৃঙ্গ হইতে মানবাত্মার তপঃশক্তি ক্ষীণাকারে স্বর্গের পথে প্রধাবিত হইয়াছে—বুধগ্রহ হইতে উহাই তিনি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ রেখা ধরিয়া তিনি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন।

কি বিচিত্র অতুল শোভাসম্পদপূর্ণ মনোরম দৃশ্য! অদ্রির উপরে অসংখ্য অদ্রির উৎপত্তি, তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে ঝলসিত, শ্যামপত্রপুঞ্জ-মণ্ডিত বনস্পতিসমূহ সারি সারি দূরদূরান্তে দিক্‌চক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে, মাঝে মাঝে স্বচ্ছমুক্তাপ্রবালরচিত স্রোতস্বিনী হেলিয়া দুলিয়া মর্ত্ত্যের বক্ষে

কণ্ঠমালার মত পরিশোভিত—মরি মরি, এ যে দ্বিতীয় স্বর্গ, সৌরজগতে সংখ্যাহীন সৃষ্টির মাঝে মর্ত্ত্যের শোভা কি অপূর্ব্ব রমণীয়—জটাধর বিমুগ্ধ হইলেন।

পৃথিবীর সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, সেই হিমাদ্রিশিখরে। রবিকরতাপে প্রস্তরকঠিন ধবল তুষার বিগলিত হইয়া যে প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই তীর ধরিয়া ছুটিয়া চলিলেন—পবনসঞ্চালন কি সুখস্পর্শী, কি তৃপ্তিপূর্ণ, কলনাদিনী নদীতরঙ্গে কি মধুর মূর্চ্ছনা, শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্র কি অনির্ব্বচনীয় শোভাময়, বিটপী-বল্লরীর শ্যামশোভা হৃদয় যে কাড়িয়া লয়! দেবসেনাপতি তূণ হইতে তীক্ষ্ণ শর তুলিয়া, পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতবক্ষে আমূল প্রোথিত করিলেন। তারপর পূর্ব্ব-পথ ধরিয়া দেবধামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

(৩)

"ভুল করিয়াছ—স্থান কালের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ কোন কালেই সম্ভব হয় না, অসংখ্য মানবের হৃদয়রাজ্যেই তিনি প্রকাশ হইতে চাহেন, তিনি আছেন—কেবল জাগাইয়া তুলিতে হইবে।"

শম্ভুপুত্র অপ্রতিভ হইলেন। বিদ্যুৎমালামণ্ডিত কনক আসন হইতে অনলদেব করজোড়ে কহিলেন, "দেবরাজ আমায় আদেশ করুন, আমারই প্রভাবে মর্ত্ত্যের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে।"

করুণানত আননে কার্ত্তিকেয় কহিলেন, "আর একবার—এবার আর ব্যর্থ হইব না, তবে ফিরিতে বিলম্ব হইবে—এবার যাইব দেবতা হইয়া নহে, মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিব।"

* * *

কেবল জল, ধূ ধূ সীমাহীন অসীমবারিধি। দেবতার কার্য্য লইয়া, বীরকেশরী পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। জয় করিতে হইবে মানুষের হৃদয়, সেই রাজ্যেই পরাৎপর পুরুষের অধিষ্ঠান হইবে। জনবহুল মহা-নগরীতে হৃদয়জয়ের যুদ্ধঘোষণা প্রচারিত হইল। মানুষ পরাজয় জানে না। ভগবান্ মানে না। তারা অবিরাম মরণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অমরত্বে আস্থাবান্। নূতন মানুষের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।

আগুন জ্বলিল। দেবতার কার্য্য পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। দেব-সেনাপতির নরদেহ নাগপাশাবদ্ধ হইয়া লোকালয় হইতে দূরে পরিত্যক্ত

হইল। কেবল স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে মানুষের হৃদয় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল—মোহরাণীর কুসুমপেলব করস্পর্শে তাহাও শীতল হইল। দেবসভায় এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। ঊর্দ্ধ হইতে ভগবানের ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি দেবকর্ণ বধির করিয়া দিবার উপক্রম করিল। শচীপতি কাতর হইয়া প্রদ্যুম্নের হাতখানি ধরিয়া কহিলেন "উঠ, জাগ—তোমার শরসন্ধান অব্যর্থ হইবে—পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক।"

পীনোন্নত পয়োধরযুগল হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল, কমনীয় রমণী অঙ্ক হইতে নিদ্রালস চক্ষে কন্দর্প চাহিয়া দেখিলেন—আদেশ মূর্ত্ত হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া; গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তিনি বিজয়তূণ পৃষ্ঠে বাঁধিয়া বীরবেশে মর্ত্ত্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভোগ যার নিত্য, মানুষের প্রাণ মন মাতাইয়া, অমৃতমধুরকণ্ঠে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ত্যাগের মধ্যে ভোগের অমরবীজ সংগোপিত দেখাইলেন, প্রেমের মুরলীধ্বনি ফুকারিয়া ফুকারিয়া মানুষের চিত্ত মন হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—মানুষ ছুটিল দলে দলে কান্তারে কান্তারে, হৃদয় দিবার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

* * *

দ্বাদশ বর্ষের তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে, দূরের মানুষ নিকট হইয়াছে, যে তরু শুখাইয়া গুমরিয়া মরিতেছিল, নূতন আশার মঞ্জরী তাহাতে উদ্গত হইয়াছে—হৃদয় তো জয় হইল, দেবতার স্বস্তিবাণী শুনিবার জন্য মর্ত্ত্য এক্ষণে উদ্গ্রীব, তাই অসংখ্য মানব আর্ত্তকণ্ঠে দেবতার আরাধনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—নারায়ণ আসিবেন কি?

সমালোচনা

শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত—মূল্য ২৷৷০ মাত্র। অন্তরের হৃদয়ানুরাগ মিশাইয়া নবীন গ্রন্থকার সেই বিশ্ববিশ্রুত স্বামীজীর এই বৃহৎ ও সুখপাঠ্য জীবনচিত্রখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে উৎসর্গ-পত্রে যাঁহার নাম ও চিত্র, সেই স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমবিগলিত পুণ্যশ্বাস যেন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম গুরুভ্রাতার নামের সঙ্গে এখনও বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে; পুস্তকখানি আমরা বাঙ্গালী পাঠককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতার রাজপথে ক্রীড়াশীল বালক নরেন্দ্র নাথ, যিনি বিবেকানন্দরূপে ভবিষ্যতে রুদ্রঝঞ্ঝাবৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূমণ্ডলের জীবনে উত্তাল তরঙ্গক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া The Cyclonic Hindu এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালী পাঠকের জন্য বাংলার সেই স্বর্গীয় পুরুষসিংহের অমর জীবনকথা সঙ্কলন করিয়াছেন, লেখকের প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল না হউক, বিবেকানন্দচরিত্রের একটা ধারাবাহিক আলেখ্যচিত্র বেশ স্বচ্ছ, সতেজ ও প্রাণপূর্ণ ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "I want to preach a man-making religion." তাঁহার সাধনা বাঙ্গালী জাতির জীবনে এক চির উৎসস্বরূপ অমর শক্তি সঞ্চার করিবে, স্বামীজীর বজ্রগর্জ্জন ঠাকুরের, দিব্য অনুভূতিকে ভাষাদান করিয়া নূতন বাংলার প্রাণে যে তপস্যার আগুণ জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, তাহা দিন দিন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালীর তপস্যায় বিবেকানন্দই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছেন, এ সময়ে তাঁহার জীবন ও চরিত্র কাহিনী যত অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী পড়িবে, বুঝিবে, অনুধ্যান করিবে, ততই মঙ্গল। রামকৃষ্ণের এই সিংহশিশু আজ কর্ম্মঅবসানে অনন্ত জননীর কোলে নশ্বর শরীর লুটাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনযজ্ঞ শতগুণ দীপ্ততর হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, স্বামীজীর একার মহৎ ব্রত আজ সহস্র সহস্র স্কন্ধে সংন্যস্ত, বাঙ্গালীকে আজ সহস্র বিবেকানন্দরূপে সহস্রজীবনে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সেই অনন্ত করুণ মর্ম্মবাণী সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

"May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum-total of all souls"—এই সমষ্টি-ভগবানের জাগ্রত উপাসনায় বাঙ্গালীজাতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণমূলেই দীক্ষালাভ করিয়াছে; নূতন বাংলা আজ যে নব শক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ, তাহা তাঁহাদেরই গোপন প্রেরণার পূর্ণতর প্রকাশ। সত্যেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ-চরিতে প্রাণ আছে, শ্রদ্ধা আছে, উৎসাহের নিদর্শন আছে, তবে শোনা কথা ও ঘটনাচিত্রে সেই যে একটা জিনিষের অভাব থাকিয়াই যায়, সেটুকু জীবন্ত সাধনার স্পর্শলাভ ভিন্ন অবলুপ্ত হইবার নয়, সেই গভীর দৃষ্টিটুকু গ্রন্থখানির ভিতরে বৃথাই অন্বেষণ করিতে হয়, তাই স্বামীজীর বহির্জ্জীবনের স্থূল দ্বন্দ্বসংগ্রামগুলি, যথা তাঁহার পারিবারিক দারিদ্র্যের সহিত কঠোর যুদ্ধ, তাঁহার চিন্তা ও বুদ্ধির পরিপাক-কাহিনী, তাঁহার প্রব্রজ্যা, বক্তৃতা, কার্য্য, কথা—এইগুলির যেমন স্পষ্ট ও সজীব ছবি জীবনীখানির ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশটির নিবিড় রহস্য ঠিক সেরূপ ফুটন্তভাবে পরিস্ফুট হয় নাই; তবু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী মোটামুটি যত ভাবে দেখা সম্ভব—সাধক, পরিব্রাজক, আচার্য্য, যুগপ্রবর্ত্তক, মানবমিত্ররূপে—সকলভাবেই আলোচনা করিবার প্রয়াস লেখক করিয়াছেন। পুস্তকের আদ্যোপান্ত ভক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধানুরাগে জীবনবান্, বাংলাসাহিত্যে এরূপ একখানি জীবনীর অভাব ছিল, তরুণ মস্তিষ্কে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় প্রদানোপযোগী এই পুণ্য চরিতচিত্র প্রণয়ন করিয়া নবীন গ্রন্থকার সেই অভাবটুকু দূর করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালী ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী, বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ গ্রন্থের সমাদর হইলে প্রভূত উপকার হইবে।

অমর কথা—সীমুলতলা, শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে স্বামী যোগবিলাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত—সাহায্য মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত ভক্ত-কাহিনী ও সদ্ভাবোদ্দীপক উপদেশ কথার সুসংগ্রহ। উদ্দেশ্য সাধু, সফল হউক।

Asian Review—জাপান হইতে নূতন প্রকাশিত এই প্রাচ্য ভাব-প্রচারব্রতী নূতন মাসিকের প্রথম সংখ্যা পাইয়া প্রীত হইলাম।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
১৫ই বৈশাখ, ১৩২৭

জীবনের ডাক

এইবার তোমাদের জীবনযজ্ঞে আহ্বান করিব। প্রকৃতির ঘূর্ণিতচক্রে পলে পলে লক্ষ্যদেশ ছুটিয়া আসিতেছে—সন্নিক্ষণ আগতপ্রায়—এখনও তোমরা কোন্ অজপা জপিতেছে—কোন্ গুরুর কোন্ কুহকমন্ত্রে, কোন্ সাধনা করিতে তোমরা নিরত? সময় যে বহিয়া যায়—দিন যে ঘনাইয়া আসিল—এখনও কি তোমাদের প্রস্তুত হওয়া শেষ হইল না?

সাধনা তোমাদের আমি কিছুতেই করিতে দিব না। থাক্ পিছনে পড়িয়া তাহারা যারা সাধিতে এ পৃথিবীতে আসিয়াছে—কিছু পাইবার জন্য, কিছু হইবার জন্য, অধিকারী হইতে। তোমরা কি চাও? তোমাদের কি সাধ? তোমরা প্রকৃতির বরপুত্র, হে দেবসংঘ, তোমরা আসিয়াছ সৃষ্টি করিতে। দেবতার সেই অমর সৃষ্টি তপঃসংঘে প্রকটিত করিতে। তোমাদের আর অপেক্ষা করিতে হইবে না সিদ্ধির জন্য—হে চিরসিদ্ধ, অগ্রসর হও, বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া ঠেলিয়া আত্মপ্রকাশ কর—বাধা, সে ত তোমাদের রোধ করিবার জন্য নহে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবারও কিছুই নাই—সে কুয়াসার মত সূর্য্যকিরণপ্রপাতেই মিলাইয়া যাইবে—মা তোমাদের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

আমি চাই কতকগুলি অদ্বৈতবাদী বীর—যাহাদের দেশ কাল নাই, সমাজধর্ম্ম নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, উচ্চ নীচ জ্ঞান নাই, কর্ম্ম অকর্ম্ম ভেদ নাই—যাহারা পর্ব্বতের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া বলিবে—"রুদ্রোহহং", আর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে পদাঘাতে দুর্ভেদ্য প্রস্তরস্তূপ—যাহারা প্রবলা নদী সাঁতারিয়া পার হইবে—গ্রামকে নগর ও শ্বাপদসঙ্কুল বনরাজী দেবাবাসে পরিণত করিবে। যাহারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া স্বর্ণরেণুর পর স্বর্ণরেণু সঞ্চয় পূর্ব্বক সিদ্ধ সম্পদ গড়িয়া তুলিবে।

তোমাদের ধবলকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া ঔষধ ক্রয়ের সঙ্গতি নাই—ভিক্ষান্নে

জীবনধারণ কর তোমরা—নিরন্ন হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন কর—তোমাদের কিসের সাধনা? আর সাধনা করিয়াই বা পাইয়াছ কি? যদি প্রাণে মরিলে ত তোমার সিদ্ধি কে ভোগ করিবে?

তোমাদের ধর্ম্মবল বিরাট্ জার্ম্মাণীর স্পর্দ্ধার মত অন্নবিহনে ধূলাবিলুণ্ঠিত হইবে—তোমাদের ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের সব সাধনা সব আশা ব্যর্থ হইবে, যদি প্রতিষ্ঠানকে তোমরা অচল করিয়া তুলিতে না পার।

উঠে এস কে আছ মহান্ বিরাট্ সুস্থ সবল দেবসৈনিক, তোমাদের লইয়াই আমি আমার প্রথম সৈন্যদল গঠন করিব। সেথায় কঠোর নিয়ম তোমাদিগকে নিষ্পেষিত করিবে না—প্রেমই সেথায় অধিপতি, উচ্চ নীচ সেখানে থাকিবে না—সকলেই সেথা দেববীর, সেথায় থাকিবে না হিংসা দ্বেষ, অর্থের কাড়াকাড়ি—একটী স্বর্ণভাণ্ডারের পূরণার্থই আমরা আমাদিগকে বলি দিয়া যাইব, সেথা আমাদের আত্মচিন্তা করিতে হইবে না—ঐ স্বর্ণ-ভাণ্ডার আমাদের সব অভাব দূরীভূত করিবে। ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল হয়ত হইবে আমাদের শয্যা, বস্ত্র মাত্র হয় ত আমাদের ভূষণ হইবে। দুই মুঠা চাউল মাত্র বা একটুকরা মাংস খাইয়া হয়ত আমাদের দিনাতি-পাত করিতে হইবে। ব্যাধি হয়ত আমাদিগকে বিত্রস্ত করিবে, দেশ কাল হয়ত আমাদের বিপরীতাচরণ করিবে, গৃহ বন্ধন বোধ হয় আমাদের বহুদূরেই অবস্থান করিবে—তবুও আমরা ফিরিয়া আসিব না। ব্যাঘ্র শার্দ্দুল হয়ত আমাদিগের কাহাকেও হত্যা করিবে, কিন্তু আমরা ভীত হইব না—বিষধর সর্প হয়ত আমাদিগকে দংশন করিবে, কিন্তু আমরা পলাইয়া আসিব না। কুম্ভীর মকর আমরা উপেক্ষা করিয়াই চলিব। ব্যাঘ্রাদি শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সশস্ত্র থাকিব, বাধা সকলকে কখন উল্লম্ফনে কখন চরণতলে দলিত করিয়া আগাইয়া যাইব—আমাদের চরণে রক্ত ক্ষরিবে, ললাট স্বেদ বর্ষণ করিবে—শরীর হয়ত শীর্ণ হইয়া পড়িবে, কিন্তু আমরা কর্ম্ম করিয়া চলিব। আমরা দেবসংঘের অগ্রবাহিনী, আমাদেরই ত প্রথম নির্ম্মমভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

আমি প্রথম যুদ্ধ করিব জাতির অনাহার ও অসুস্থতার সঙ্গে। তারপর দেশের অন্ধতামসকে আমি ধ্বংস করিব। যাঁহারা আমার প্রথম দলের সাথী তাঁহারা রহিবেন অগ্রে, দেবজাতিকে দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর হস্ত হইতে

রক্ষা করিতে—তাঁহারা হইবেন লক্ষ্মীর বরপুত্র। আমার দ্বিতীয় দলের সাথী যাঁহারা তাঁহারা রহিবেন তার পশ্চাতে—জ্ঞানবিজ্ঞান বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া তাঁহারা করিবেন দেবগঠন—যাঁহারা আমার বলবৃদ্ধি করিবে। ইঁহাদের কর্ম্ম আরও কঠোর। যুগব্যাপী অজ্ঞানঘন অন্ধকারকে অতলের তল হইতে টানিয়া তুলিয়া ইহাঁদিগকে দূরে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অবিদ্যার সূক্ষ্ম তরবারিটী ইঁহাদের বক্ষোপরেই প্রথম নিপতিত হইবে। আরও ইহাদের বীর্য্যবান্ হইতে হইবে, কেননা তাঁহাদের কর্ম্ম দেবতাকে জন্মদান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রথম দল অজ্ঞ ব্যক্তিরই স্থান হইবে না—সকলেই আর্য্য, যোগী ও আত্মজ্ঞানী হইবেন। প্রতি দলেই রহিবেন শক্তিধর সাধক, যিনি দিবানিশি হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিবেন—দেবগণের পুষ্টি বিধান করিবেন—দেবমাতৃকার মত স্তন্যদানে ভীতকে অভয়, দুর্ব্বলের ভিতরে অনন্ত শক্তির সঞ্চার করিবেন। তারপর রহিলেন যাঁহারা বাকী, যাঁহারা সকলের আদি, তাঁহারা রহিবেন দূরে, সংঘর্ষের ঘর ঘর শব্দ তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিবে না। কিন্তু সকল আঘাতের সূক্ষ্মস্বরূপটী তাঁহাদের তুরীয় সত্তায় প্রতিভাত হইবে—সেইখানেই মৃত্যুশেল-বিদ্ধ হইয়া সকল অবিদ্যাশক্তি শূন্যপ্রাণে ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে।

তপঃপথ

সৃষ্টির জন্যই নূতনের সাধনা। চাই নূতন সৃষ্টি। উপায় তপস্যা। গতানুগতিক লৌকিক পথ শতসহস্রসত্ত্বেও, আজ এই বলবতী প্রেরণাই নূতনের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। পুরাতন জীবননীতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নূতন জীবন নূতন উপায়েই গড়িয়া উঠিবে।

* * *

তপস্যা কি? উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক তপস্যার কথায় শিহরিয়া উঠেন। তপস্যা উদ্ভট কিছুই নয়। তপস্যা হইতেছে বাহিরকে অন্তর দিয়া গড়া, সম্পূর্ণ ভিতরের দ্যোতনায় কর্ম্মসৃষ্টি; তাহার প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসে।

* * *

একটা বিশ্বাস। আত্মার অমরসত্তায়, অনন্ত চেতনায়, অফুরন্ত আনন্দে অটুট দৃঢ় নিষ্ঠা। মানুষ সুপ্ত, আত্মনিষ্ঠাহীন, তাই তাহার চিন্তা, ভাব, আদর্শ, কর্ম্ম সকলই অশুদ্ধ, অসিদ্ধ। প্রথম কথা হইতেছে এই আত্মনিষ্ঠা। আত্মা চিরশুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, পূর্ণ সিদ্ধ। আত্মা এক। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্।

* * *

আত্মার জাগরণের উপরেই নূতন সৃষ্টি নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী, তোমার কর্ণে এই অগ্নিদীপ্ত নূতন বাণীই ধ্বনিয়া তুলিতে চাই—একটী প্রশ্ন, একটী উত্তর। জাগিয়াছ? হাঁ জাগিয়াছি। বল জলদমন্দ্রে তারস্বরে এই একটি মহাধ্বনি সহস্র কণ্ঠে উচ্চারণ কর—ইহা সিদ্ধবাক্, ঋষির তপঃশ্রুতিলব্ধ, অপরিসীম শ্রদ্ধায় ইহা হৃদয়ে ধারণ কর—জীবন বিদ্যুৎশক্তির প্রভায় তপোময় হইবে; বিশ্বাসে, স্বীকারমন্ত্রের প্রভাবে, সিদ্ধ কর্ম্মধারা অন্তরে বাহিরে ঝকিয়া উঠিবে।

* * *

কেমন করিয়া জাগিলাম? এই প্রশ্ন আবার করিতে হয়? ওগো অল্পবিশ্বাসী, উৎসর্গ করিয়াছ, জাগরণশক্তি তোমার ভিতরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই? তুমি তো আর শুধু তুমিই নও, আত্মা অখণ্ড, একটি

সত্তা সকলের ভিতরে, উৎসর্গ সত্য হইলে দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষ করিবে, একের জানা সকলের জানা হইয়া উঠিতেছে, একের পাওয়া সকলের পাওয়াতে পরিণত—জানাজানি পাওয়াপাওয়ির মহামেলা বসিয়া গিয়াছে—আত্মসমর্পণ সেতুসদৃশ, তাহারই উপর দিয়া অমর শক্তিপ্রবাহ এক হইতে বহুতে প্রবল তরঙ্গে সঞ্চারিত।

* * *

বিশ্বাস জ্বলন্ত হইয়া উঠুক, ঘনীভূত বিশ্বাসই জ্ঞানের মূল। সংশয়ের একটি কৃষ্ণরেখাও যেন অন্তরে চিহ্নপাত না করে। জানিয়াছি? পাইয়াছি? উৎসর্গযোগী! কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? সংশয়মুক্ত হও, দীপ্তনেত্রে পরিদর্শন কর, ভিতরে উৎসর্গের প্রতিষ্ঠা অচল হইয়াছে, সমষ্টির অগ্নিনিষ্ঠা দৃঢ় ও অটুট হইয়া উঠিয়াছে, আজ যাহা ভাবে ও দর্শনে সত্য ও সিদ্ধ প্রায়, তাহাকে মর্ত্ত্যের কর্ম্মক্ষেত্রে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

* * *

প্রথম আত্মদর্শন, তারপর আত্মদান। আত্মদর্শনসম্পন্ন দেবসাধক, আপনাকে বিলাইয়া নিশ্চিহ্নরূপে নিঃশেষ করিয়া ফেল, আপনার অমরসম্পদ্ বিতরণেই পরিবৃদ্ধ হইবে, শক্তিপ্রয়োগেই শক্তির বৃদ্ধি ঘটিবে, যে মধুভাণ্ড তিল তিল করিয়া দীর্ঘ তপস্যায় আপনার অন্তরে সঞ্চয় করিয়া তুলিয়াছ, তাহার শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত মানবাত্মার জন্য উৎসর্গ করিয়া দাও, উৎসর্গ সিদ্ধ হইয়াছে ভিতরে, এইবার উৎসর্গ সিদ্ধ হউক বাহিরেও, বাক্য নয় কর্ম্ম, ভাব কর্ম্মেই মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠুক।

* * *

কর্ম্ম হইবে, কিন্তু নূতন প্রণালীতে। পাওয়াপাওয়ির দলকে লইয়া নূতনের সকল কর্ম্মসৃষ্টি। সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াই নূতনকে কর্ম্ম করিতে হইবে, বাহিরের কাহারও উপরে নির্ভরতা অনাবশ্যক, অশুদ্ধ অসিদ্ধ আধার লইয়া দ্রুত কর্ম্মসিদ্ধির সম্ভাবনা মনে হইলেও, এই ধারণা অভ্রান্ত নহে। নবীনজাতির ভাব, আদর্শ, চিন্তা, চরিত্র যেমন, তাহার কর্ম্মযজ্ঞও হইবে তেমনি আমূল নূতনধারাসঙ্গত; একপাত্র দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্রপাতে যেমন সমস্ত দুগ্ধটুকু অপেয় হইয়া পড়ে, সেইরূপ নূতনের পূর্ণপাত্রে পুরাতনের অশুদ্ধস্পর্শ যাহাতে তিলমাত্র না ঘটে তাহার দিকে খরতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

* * *

হউক মুষ্টিমেয়, হউক বৃহৎ, হৃদয় যেখানে অভিন্ন, সমষ্টির তপঃশক্তি তাহাদিগের মধ্যেই সমভাবে ক্রীড়া করিতে পারিবে, ইহাদিগেরই সিদ্ধদান একত্র করিয়া বিপুল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর্ম্মচক্র হইবে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই সেখানে স্বাধীন, স্বতন্ত্র—সমষ্টির অন্তর্গত প্রতি ব্যষ্টি ইচ্ছামত আত্মবিকাশ সম্পন্ন করিয়া চলুক, উৎসর্গ যদি সত্য হয়, ব্যষ্টির উন্নতি, আনন্দ ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতিরই দ্রুতবিকাশ সংঘটিত হইবে, সমষ্টির ভিতরে যদি সত্য সত্যই অতুল অধ্যাত্ম-শক্তি থাকে, বিভিন্ন প্রেরণাপুঞ্জ একটি অদৃশ্য সামঞ্জস্যসূত্রে স্বতঃই একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া উঠিবে।

* * *

নূতন সৃষ্টির ইহাই তপঃপথ। অধ্যাত্মশক্তির উপরেই ইহার মূলপ্রতিষ্ঠা, বাহিরের নিয়মবন্ধন নাই, আত্মসংযমই ইহার প্রকৃষ্ট নীতি, আত্মার বিমল প্রকাশ সহস্র পল্লবে সহস্র দিকে ছড়াইয়া পড়ুক, কিন্তু রস, প্রাণ, ইচ্ছা রহিবে একটী, উহা আর কিছু নয়, সকলের ভিতরেই ভাগবত সত্তার উদ্দীপন হইবে, সকলেই অনুভব করিবে তাহারা ভগবানের যন্ত্র, জীবন তাহাদের ভগবানেরই জন্য—দেবায় জন্মনে, দেবান্ কর্ম্মণে, ভগবানের ইচ্ছার সহিত যাহাদের ইচ্ছা একীভূত, ভাগবতপ্রেমে যাহারা অখণ্ডসূত্রে সন্নিবদ্ধ, ভাগবতজ্ঞানে যাহাদের অন্তর সমুজ্জ্বল, তাহাদের লইয়াই দেবজাতি—জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের যুক্ত তীর্থেই ভারতের অমর জাতীয়ত্বের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা।

* * *

আত্মাই দেবসংঘের কেন্দ্রপতি। অখণ্ড উৎসর্গনিষ্ঠায় এই কেন্দ্রগত বিপুল তপঃশক্তি অব্যর্থক্রমে বহু আধারে প্রকট হইবে, তপঃশুদ্ধ প্রতি দেবসাধকের পশ্চাতে বিরাট্ শক্তিসমষ্টি কার্য্যরত, আত্মার সিদ্ধ যোগশক্তি ক্ষিপ্রবেগে সকল সাধকের ভিতরে পরিস্ফুট হইয়া সমষ্টির অতুল সিদ্ধি কর্ম্মে বিগ্রহবদ্ধ করিয়া তুলিবে, নবোত্থিত তরুণজাতি জয়ধ্বনি পূর্ব্বক বিশ্বের রাজপথে উল্লাসে অভিযাত্রা করিবে, এ বিপুল যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে।

* * *

ওগো বাংলার নূতন, তোমাদের হৃদয়ে আজ এই নবীন তপঃপথ পরি-

স্ফুট হইয়াছে ত? আত্মার উপর অপরিসীম আস্থা দৃঢ়মূল, আপনার ভিতরে সর্ব্বভূতের ভিতরে একই আত্মাকে ক্রীড়ারত জানিয়া অতুল সমতা-সম্পন্ন হইয়াছ ত? আমিই আমার সমষ্টির ভিতরে, আমার সমষ্টির পূর্ণ সত্তা আবার আমারই ভিতর দিয়া উদ্গত, আত্মা সর্ব্বভূতে, আবার সর্ব্বভূতে সেই একই আত্মদর্শন, বেদ আজ জ্যোতির্ম্ময়, উপনিষদ্ আজ তোমাদের অন্তরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ত? বিশ্বাস অটুট, ধৈর্য্য অপরিসীম, বিপুল অসমসাহসে সুসজ্জিত, তোমরা নূতন, আজ যে মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ, তাহারই সিদ্ধির উপরে বিশ্বরাণীর মুক্তি সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে—তোমাদের আত্মনিষ্ঠা আত্মদর্শনে সার্থক হউক, তোমাদের আত্মদর্শন অনলপ্রভায় ঝলসিত হইয়া তোমাদের আত্মপ্রকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলুক—পুরাতন, গতানুগতিক সহজ পথে চলিতেছে, চলিবে, চলুক, মৃতের সৎকার মৃতেরাই করুক—কিন্তু হে উন্মাদ নূতনের দল, তোমরা বীরদর্পে অগ্রসর হও, অসংখ্য ক্ষেত্রে অসংখ্য কর্ম্মে তোমাদের শক্তিরাজী বিকীর্ণ কর, আত্মার গভীর উৎস হইতে তপঃপ্রভাবে একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি তোমরাই নির্ম্মাণ করিয়া তোল।

দীক্ষা

যতদিন পর্য্যন্ত না সাধক তাহাকে কি করিতে হইবে, ভিতর হইতে বুঝিতে পারে, নীরব তপস্যা ততদিন খুবই কার্য্যকরী। নীরব সাধনা বলিতে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা না, পরন্তু অবস্থার আনুগত্যে সমতা লাভ করা। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বঘটনায় স্থিতধী হইতে পারিলে, গঠনাধিকার জন্মায় এবং তখনই নির্ম্মাণ হয় অবিকৃত, শুদ্ধ, ভাগবত ইচ্ছানুযায়ী।

সাধকের কর্ম্মাধিকার জন্মিতে যে কালবিলম্ব, তাহার পরিমাপ সকলের পক্ষে সমান নহে, সমষ্টির মধ্যবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ কর্ম্ম-সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং সেই কর্ম্ম অন্তঃপ্রেরণার বশে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিলে সমষ্টিশক্তি তাহার সহায়তা করিতে পারে, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। অনেক সময়ে সমষ্টিবদ্ধ জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে, সমষ্টির নিয়ামকই এইরূপ প্রেরণা অধিকতর পরিস্ফুটভাবে পাইয়া থাকেন, এবং তাঁহাকেই বিশুদ্ধচিত্তে প্রতি ব্যষ্টিহৃদয়ে উহা সঞ্চারিত করিতে হয়।

আমাদের সমষ্টিবোধের মধ্যে কোনই দ্বন্দ্ব নাই। আর কিছু না হউক, আমরা একটা সমষ্টিজীবন লাভ করিয়াছি। আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল ভাব, সকল প্রেরণা সমষ্টিগত। ব্যষ্টির বিশেষত্ব এক্ষেত্রে কিছুই নাই, ব্যষ্টির চরিতার্থতা তাহার সবখানি সমষ্টির মধ্যে ঢালিয়া, বিছাইয়া—সমষ্টিকেও আপনার তপঃশক্তি ভারে ভারে অবহিতে সঞ্চারিত করিয়া যাইতে হইবে, যতদিন না তাহার অন্তর্গত প্রতি ব্যষ্টি কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্ব দিক্ দিয়া এক হইয়া যায়।

অন্তঃসাধনা—অর্থাৎ অধ্যাত্মশক্তি আদান প্রদানের সুষ্ঠুপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কালের সহায়তায় ইহার ক্রমপ্রসারণ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এক্ষণে এই অধ্যাত্মযোগকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার কৌশল আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে।

যোগকে—জীবন দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—কাজেই যোগশক্তি অবধারণ করিবার জন্য আধার নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। মানুষের কর্ণে

যোগের বাণী প্রবেশ করে, এমন বাক্য, শাস্ত্র, উপদেশ ইহার জন্য প্রযুজ্য। মনে রাখিতে হইবে—উপকরণগুলি হইবে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ। শুদ্ধ দেব-সমষ্টি যেমন যেমন আত্মপ্রকাশ করিবে, মানুষের প্রাণে যোগ তেমনি তেমনি বিস্তৃত আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে; এই যোগশিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত করিবার যে বিধি, তাহা আজ সুস্পষ্ট; শাস্ত্র, গুরু, উৎসাহ এবং কাল যোগপ্রকাশের এই চতুরঙ্গ সহায়েই দিন দিন মানুষ অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রসর হইবে।

যোগপথে যাঁহারা সমধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই যোগপ্রচারে অধিকারী। লৌকিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন অগ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিতে হয়, সেইরূপ এই অধ্যাত্মযোগে কেন্দ্রপতির নিদর্শনচিহ্ন না পাইলে সমষ্টির বিশিষ্ট কোনও কর্ম্মোপযোগী হওয়া যায় না। ভাবসিদ্ধ যোগীর ভিতর দিয়াই নির্ম্মল ও অবিকৃত আকারে আত্মার শুদ্ধ প্রকাশ সম্ভব হইবে, অন্তর যাঁহার যোগযুক্ত, দীর্ঘকালব্যাপী সমতা প্রভাবে যাঁহার আত্ম-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির দর্শনলাভ সংসিদ্ধ হইয়াছে, উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষা-দানে তাঁহারই প্রকৃষ্ট অধিকার, মানবাত্মাকে লইয়া অনধিকারীর ক্রীড়া আগুন লইয়া নাড়াচাড়ার চেয়ে লক্ষসহস্রগুণ ভীষণ ও সর্ব্বনাশকর। আদেশ যেখানে পাওয়া হয় নাই, ঠাকুরের কথায়, চাপ্‌রাস যে লাভ করে নাই সে ধর্ম্মদানে অক্ষম, অকালসিদ্ধ গুরুভাব সেক্ষেত্রে গুরু শিষ্য উভয়কেই একসঙ্গে তুষানলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবে, ইহা অবধারিত।

অন্যপক্ষে যোগবিদ্যাগ্রহণে যে উৎসুক, তাহাকেও অধিকারী হইয়া উঠিতে হইবে। অপরাবিদ্যায়ও শিক্ষাপ্রার্থীমাত্রেরই সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বতত্ত্বে প্রবেশাধিকার নাই, সর্ব্বশিক্ষা লাভের বীজ সকলেরই ভিতরে বর্ত্তমান, কিন্তু অবস্থানুগত করিয়াই সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, সকল বিদ্যার সারস্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যায় যে অধিকারীবিচার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আত্মা সকলেরই ভিতরে সহস্রদলে বিরাজিত, সকলেই ঈশ্বরস্বরূপ, পূর্ণত্বের পরি-পূর্ণ সম্ভাবনা সকলেরই পূর্ণমাত্রায় আছে, কেবল প্রকাশের তারতম্য মাত্র, এই গুণভেদ ভগবতবিধানেই নির্দ্ধারিত, যোগগ্রহণকালে ভাগবত ইচ্ছার ব্যাভিচার ঘটাইলে, তাহাতে নিশ্চয়ই ইষ্ট নাই।

চিত্তের ঔৎসুক্যই ইচ্ছা নয়, বাসনা ও চেষ্টামুক্ত না হইলে, শুদ্ধ

ব্যাকুলতার উদয় হয় না, ইহার জন্য একটা পূর্ব্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন, উহা কোন অনুষ্ঠান, নিয়ম, প্রণালী নয়, অধ্যাত্মযোগ আদ্যোপান্ত সমস্তটাই অন্তরপ্রতিষ্ঠিত, কোনও বাহ্য সহায়ের উপর তাহার আস্থা ও নিষ্ঠা নাই, যোগলাভের জন্য যখন হৃদয়ের ভিতরে স্ফুট অস্ফুট একটা প্রেরণার অনুভব জাগে, তখন তাহাতেই অস্থির হইয়া না উঠিয়া, ধীর ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, চঞ্চল সলিলতরঙ্গের উপর যোগমন্দিরের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, প্রশান্ত ধৈর্য্য লইয়া পরিদর্শন করিতে হইবে, কোথা হইতে প্রেরণা উদ্ভূত হইল, উহা সত্যই অন্তরের ব্যাকুল আকর্ষণ, না চিত্তের সহস্র খেয়ালের একটী ঢেউ মাত্র, ব্যাকুলতা অনেক সময়েই অন্তরদেবতার প্রত্যক্ষ আহ্বান না হইয়া, শ্রুত, অধীত, কল্পিত ধর্ম্মাকাঙ্খারই প্রভাবাচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি হইতে পারে, উহা যে তাহাই নয়, পরন্তু দেবতার অভ্রান্ত নির্দ্দেশ, কঠোর আত্মপরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে, এই আত্মপরীক্ষাই ধর্ম্মজীবনলাভের প্রথম ভূমিকাসূত্র।

ব্যাকুলতা যদি সত্য বলিয়াই অনুভূত হয়, বারম্বার নিষ্ঠুর হস্তে আপনাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়াও তখনও যদি উহা অনির্ব্বাপিত রহিয়া যায়, বরং দিন দিন সকল আত্মপ্রতিবাদ সত্ত্বেও উহা শতসহস্রগুণ দীপ্ততর হইয়াই উঠিতে থাকে, বুঝিতে হইবে, দেবতার আহ্বান আসিয়াছে, প্রস্তুত হইতে হইবে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পরিচয়লাভের জন্য। তখনও যেন ধৈর্য্য অটুট থাকে, হৃদয় নবানুরাগের জোয়ারে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিলেও, অবিচল স্মৃতিশক্তি দিয়া উহা বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া তাহার গুমরিত ক্রন্দনরোল উপভোগ করিও, এ যে বিশ্বাত্মারই চিরন্তন ক্রন্দন, তোমার অপেক্ষা না রাখিয়াই উহা তোমার মধ্যে স্ফুরিয়া উঠিয়াছে, তোমার নিরপেক্ষ অবস্থানেই উহা সহজে ও স্বতঃসিদ্ধক্রমে ক্ষিপ্রতর বেগে বৃদ্ধি পাইবে। যোগগ্রহণেচ্ছুর বিপুল ধারণসামর্থ্য চাই, উহার অভাবে কেবল অনর্থক শক্তিক্ষয় ও কালবিলম্বই ঘটিতে পারে, ধৈর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রার্থী যখন স্পষ্ট অনুভব করিবেন, অন্তরের আকুল প্রেরণা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভিতর হইতেই আশ্চর্য্যক্রমে বিন্দু পতন হইবে, ধ্রুবনক্ষত্রের মত সেই অন্তরের ইচ্ছাবিন্দু অব্যর্থ সন্ধানে গুরুশক্তির পরিচয় মিলাইয়া দিবে, আশ্চর্য্য উপায়ে, আশ্চর্য্য অভাবনীয় গতিনির্দ্দেশে, কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ অলঙ্ঘ্য বিধানের আকর্ষণে

সকল বাধা বিঘ্নের উপর দিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত করিয়া দিবে—যে সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে বিধাতার কল্পপটে নির্দ্ধারিত হইয়া ছিল, সেই অস্ফুট সঙ্কল্পই সাক্ষাৎ পরিচয়ে সহস্রসূর্য্যের মত উজ্জ্বল, জীবন্ত, সত্য হইয়া উঠিবে।

পরিচয়েই যোগারম্ভ। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের উন্মাদ রাগিণী অন্তরাত্মাকে উদ্বেল করিয়া তুলিল, যুগ যুগান্তের পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা দর-বিগলিত ধারায় বিরহমধুর অশ্রুসমষ্টি হইয়া ঝর ঝর ঝরিল, গুরুভারাক্রান্ত বুকের রুদ্ধ কপাট কাহার করুণকোমল করস্পর্শে সহসা ঝন ঝন শব্দে মুক্ত হইয়া গেল, গুমরিয়া মরা যেন লক্ষ লক্ষ জন্মের সঞ্চিত রুদ্ধ বাষ্প মুক্ত বাতায়নপথে নির্গত হইয়া হৃদয়ভার নিমেষে লঘু করিয়া দিল—এ অমৃতমধুর অনুভূতি লাভে যে সৌভাগ্যবান্ ধন্য হইয়াছে, তাহার কাছে আর জটিল কি, দুর্লভ কি, শাস্ত্র তাহার কাছে জীবন্ত দর্শন হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নবানুরাগের তপ্ত হৃদয়রাগে গণ্ড আরক্তিম, নয়ন বিস্ফারিত, স্বর্গের উলঙ্গ দ্যুতিপ্রভা উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুর মত ললাটে ঝলসিত—মানুষ যেখানে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছে মানুষের চরণে, অপার্থিব প্রেমের অতুল মহিমায়; বিনিময়ে অপার্থিব প্রেম, সহস্রগুণে হৃদয়ে ফিরিয়া পাইয়াছে; উৎসর্গ যেখানে স্বরে সুরে অনাহত ছন্দে লহরে লহরে বিধুনিত—দীক্ষা সেখানে যে সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সে কি আর বলিবার অপেক্ষা রাখে?

ভালবাসার কথা, বড় সূক্ষ্ম কুসুমপেলব কাহিনী, লজ্জাবতী লতার মত উচ্চারণে ম্লান হইয়া পড়ে, সে কথা থাক, কাহিনী আরম্ভেই নীরব হউক, কণ্ঠ নির্ব্বাক্, লেখনী নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া পড়ুক, ভাব দিব্য ভাষার অভাবে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরুক—প্রেমরহস্য প্রকাশ করিবার গান মানুষ আজও যে রচিয়া তুলিতে পারে নাই, মর্ত্ত্যের স্থূল হস্তে ছিন্ন বীণার তারে অসিদ্ধ মূর্চ্ছনার ঝঙ্কার তুলিয়া, তৃপ্তি ত হয় না, কিন্তু উপায়ও ত নাই!

শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মলাভ হয় না, যোগসাধনার জন্য ঠিক কোন্ স্তরে কিরূপ প্রণালীতে চলিতে হইবে, তাহাই স্পষ্ট সরল ভাষায় বুঝিতে চাই, তর্ক বুদ্ধি লইয়া আসি নাই, প্রকৃত সাধনজীবন লাভ করিতে হইলে সংসার হউক, সন্ন্যাস হউক, যেরূপ আদেশ করিবেন, যথানির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অনুগত

হইয়া তাহাই অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছি, এরূপ বহু ব্যাকুল হৃদয়ের উৎকণ্ঠ আগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে—সত্যই আজ বাংলার নিষ্কলঙ্কচরিত্র তরুণকুল ধর্ম্মের অমৃতাস্বাদ পাইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন। হে ধর্ম্মের ও অমৃতের সনাতন আধার, হে প্রেমের জলন্ত প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, ভারতের যুগবিগ্রহ, তুমি আজ সহস্রদল কমল হইতে অবতরণ করিয়া অগ্নিময় মহাবর্ণে আবির্ভূত হও, বাংলার শুষ্ক হৃদয়-ঘট অতুল প্রেমে ভরাইয়া তোল, দিগ্‌ভ্রান্ত জীবনে জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুবনির্দ্দেশদানে বাঙ্গালীকে ধন্য, পূর্ণ, চরিতার্থ কর।

প্রকাশের কথা

বাংলায় চলিয়াছে নির্ম্মাণ! ভগবানের মহৎ ইচ্ছা ফলপ্রসূ করিবার জন্য তিনি গড়িতেছেন বাঙ্গালীজাতীকে ধীর মন্থর গতিতে, কার্য্য অমোঘ অব্যর্থ, কিন্তু তাড়াতাড়ি নাই, উত্তেজনাআড়ম্বরশূন্য কর্ম্ম অগ্রসর হইতেছে নীরবে, নিরুপদ্রবে।

যাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র কিছু করিতে চাহেন, তাঁহাদেরই চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। এই হওয়া ভগবানের হাতে গড়া নহে, নিজেকে নির্ম্মাণ করিয়া তোলা নিজেরই বুদ্ধিসাহায্যে, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে এইরূপ কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তন চলিয়াছে—পক্ষান্তরে ভাগবতসৃষ্টির ক্ষেত্র এখনও দূরবিস্তৃত হয় নাই, লোকলোচনের যোগ্য হইয়া উঠে নাই, অপরিসর ক্ষুদ্র স্থানটুকুতেই ইহার কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কর্ম্ম এখনও পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ হইবার সময় আসে নাই, কেবল আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ণ পরিণতি সময়সাপেক্ষ, ভাগবত সিদ্ধি ভগবানের ইচ্ছা-মতই সংসিদ্ধ হইবে, তবে যে কর্ম্ম চলিয়াছে উহা ভাগবতকর্ম্ম, ভগবানেরই হস্তচালিত, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র কর্ম্মশালার সঠিক অবস্থাচিত্র সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে—উহা আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই—ভগবানের কর্ম্ম যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিবরণ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নবতান্ত্রিকের দল, মিলাইয়া আপনাপন সাধনার ক্রম বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গালী তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে এক যুগেরও অধিক, কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথম কয়েক বৎসর আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক সাধনায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতে হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের সাধনা—ব্যষ্টির মুক্তিবাদকে গ্রাস করিয়া সার্ব্বজনীন সমষ্টি মানবজীবনের ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তোলা। বাঙ্গালীর প্রাণে এই মন্ত্র যেদিন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, উত্তেজনায় জীবন ভরিল বটে, কিন্তু কতশত বৎসরের অশুদ্ধ রজঃ সঞ্চিত ছিল, নিষ্কাশিত হইতে আরম্ভ

করিল, স্বদেশীযুগের পর, বাংলায় যে চমকপ্রদ বিপ্লবতরঙ্গ, উহাই তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাহার পর এই ছয় বৎসর বাঙ্গালীর মানসজগতের পরিশুদ্ধি চলিয়াছে।

বাঙ্গালীর মন জাগিয়াছে—বাঙ্গালীর মনে ভগবানের বাণী স্পর্শ করিয়াছে—বাঙ্গালী উলঙ্গ মনে ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিয়াছে—ভাবুকতার নিবিড় কুয়াসা সম্যক্ বিদূরিত না হইলেও—ক্রমে উহা অগভীর পাত্‌লা হইয়া পড়িয়াছে—এইবার মানসজগতে অবতরণ করিবে—তুরীয়ের শুদ্ধ বিজ্ঞান; বাঙ্গালী এইবার অবিকৃত আকারে জীবন দিয়া ভাগবতইচ্ছা প্রকাশ করিবার উপযোগী হইয়া উঠিবে—বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে হোমানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে—যে বাড়বানলের প্রলয়শিখা গগন চুম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উল্লম্ফনে আগাইয়া উঠিতেছে—এইবার উহা আকাশ বাতাসময় হইয়া সমগ্র জগতে আত্মপ্রকাশ করিবে, বাংলার যজ্ঞবেদী হইতে বৈদিক ঝঙ্কার ভারতের হৃদয় পূর্ণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী বিধূনিত করিয়া তুলিবে, নির্ম্মাণক্ষেত্রে বসিয়া, ভগবান্ যে যন্ত্র রচনা করিতেছেন, উহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিলে জগতের সুদিন আসিতে আর বিলম্ব হইবে না।

রচনার প্রথম প্রতিষ্ঠা, প্রথম ভিত্তি আত্মসমর্পণযোগ, সমতা প্রভৃতি, ভগবান্ তাহারই অনুশীলন বাঙ্গালীর মধ্যে করিয়া আসিতেছেন, সাধককে আরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া পুরাতন সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তুলিতেছেন, অনেক সংস্কার খসিয়াছে—যাহা এখনও শেষ হয় নাই, ভগবানের ইচ্ছাতেই তাহা অচিরে অপসারিত হইবে। বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কার—সংসার ও ভগবান্‌কে পৃথক করিয়া দেখা, সেইজন্য ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে আপনাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিতে চাহে—সে ভ্রম তাহার ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু এখনও পূর্ণ সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারে নাই, কামনাত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু আনন্দভোগের সমতাবিধানে এখনও একটু বিলম্ব আছে।

বিলম্বের কারণ হইতেছে, বাঙ্গালীর মধ্যে ভগবান্ প্রথম জাগিতে চাহিয়াছিলেন যেমন কর্ম্মে, ভক্তিতে—তেমন জ্ঞানে নয়। তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবে বাঙ্গালী প্রেম, শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ আপনার মধ্যে সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল, অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের সাধনা তাহারা অল্পদিন আরম্ভ করিয়াছে, এইবার ত্রয়ী সাধনায় বাঙ্গালী সিদ্ধ হইবে। জ্ঞানপ্রকাশ হইতে আরম্ভ

করিয়াছে—এখনও পূর্ণ হয় নাই, তবে শীঘ্রই উহা সফল হইবে। ভগবানের কর্ম্মশালায় এক ছাঁচেই যে সকলে গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই, তবে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে তিনি সকলকেই পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন, সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে নানা ভাবে, নানা মূর্ত্তিতে, কিন্তু মূলে থাকিবে একই তত্ত্ব, অহংকারকে একেবারে নিরসন করা, তুরীয় সত্তার সহিত অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া। গঠন ভিতর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, ভিতরের পূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ হইবে, ইচ্ছা করিলে তিনি দুই বৎসরের বাকী কাজ আজই শেষ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহার ইচ্ছা নাই। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাঙ্গালীর জীবনে ভগবান্ জাগিয়াছেন, পূর্ণ সিদ্ধি অবধারিত আসিবে।

এই যে বিন্দুপরিমিত পরিধিচক্রে অধ্যাত্মসাধনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, উহাই কি চক্রাকারে ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র জাতির উপর অধিকার বিস্তার করিবে—অথবা চারা তুলিয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া রোপন করিতে হইবে—মানুষের বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে—ভগবান্ এখনও ইহার উত্তর দেন নাই, তিনি করিয়া চলিয়াছেন নির্ম্মাণ, কেমন করিয়া কোন্ কাজ সুসিদ্ধ হইবে তাহা মানুষের এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার বিধান তিনিই মানিয়া চলিবেন, মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ চিরদিন কলরব কোলাহল করিয়া চলিবে—ভগবানের হস্তে সম্যক্ সিদ্ধযন্ত্র নির্ব্বিকারচিত্তে পরিক্রমণ করিবে—সঞ্চালিত হইবে, বীরহস্তে শাণিত কৃপাণের মত; যন্ত্র ভগবানের ক্রীড়নক বৈ তো নয়।

আজও যে খুঁৎটুকু আছে, যে অসিদ্ধিপূরণ এখনও হয় নাই, কাল তাহা নিখুঁত সিদ্ধ হইয়া উঠিবে, যন্ত্রের অহংকার চূর্ণ হইলেই, যে আকারে যে ভাবেই তিনি মূর্ত্ত হইয়া উঠুন না—তাহার উপর বলিবার প্রয়োজনও থাকিবে না, বুদ্ধিও তখন ভেদ কিছু অনুভব করিবে না।

এক্ষণে হে নূতন সাধক! তোমরা কি এখনও ইহাই বুঝিতেছ—ভগবানের এই কর্ম্মশালা কোন বিশেষ স্থান বিশেষ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, কোন ইষ্টকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত চূণ সুরকির গাঁথনী বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে এই নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়াছে!—না—ইহা মানুষের অন্তরের কথা, মানুষ আকৃতিগত স্বভাবগত পৃথক হইলেও, ভগবানের হাতুড়ির ঘা যেখানে পড়িয়াছে, স্থান কাল নির্ব্বিশেষে তাহারা এক হইয়া

যাইতেছে, এই একত্ববোধের অভাব অনুভব হইলে বুঝিও, বুদ্ধির ফেরে পড়িয়া দূরকে নিকট আর নিকটকে দূর বোধ করিতেছ—অধ্যাত্মসাধন চলিয়াছে, সিদ্ধি এখনও কেহ পায় নাই, যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিধান-কর্ত্তা, তাঁর সময় পূর্ণ হইলে, শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে তিনি পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে প্রকাশ পাইবেন। আজ এই মহারাসলীলার অভিসারে তীর্থযাত্রী আমরা সকলেই—আমাদের ঐক্য প্রেম সার্থক হউক, বাহিরের অভিব্যক্তি দিয়া নহে, অন্তরে যে প্রবাহ বহিয়াছে, তাহারই সূত্র ধরিয়া—আমরা অখণ্ড বঙ্গের সমুদয় সাধককে হৃদয়ের সবটুকু স্থান অধিকার করিতে আহ্বান করিতেছি—আমাদের সবখানিই আমাদের ভায়েদের, সহতীর্থের জন্য—বিরোধ বা ভেদের সৃষ্টি কে করিবে?

অন্তরীণ প্রসঙ্গ

বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে তরুণের দল জীবনপণ করিয়া রাষ্ট্রস্বাধীনতার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া তির্য্যক্ পথে ছুটিয়াছিল বলিয়া, পুনঃ পরিক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়া উঠিয়াছে—এইজন্য অশেষ ধন্যবাদ আমরা গবর্ণমেণ্টকে দিতে কুণ্ঠিত নই, উপযোগী সময়ে সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া, তাঁহারা দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে জনৈক সদস্যের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল, যে এখনও সাঁইত্রিশ জন রাজবন্দী মুক্তি পায় নাই, সম্রাটের ঘোষণাবাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত না হইবার কারণ আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বাঙ্গালী শান্তিপ্রিয় জাতি, বাংলায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অবশিষ্ট বন্দীগণকে আবদ্ধ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের কি উদ্দেশ্য সফল হইবে?

২৩এ ডিসেম্বর সম্রাটের বাণী ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে, এবং এই ঘোষণা ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্যক্ সম্মতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত—"The Royal Message was penned after due consultation with the Government of India." ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত যথোচিত পরামর্শ করিয়াই, সম্রাটের ঘোষণাবার্ত্তা সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছিল। একথা বড়লাট বাহাদুরের দরবার-কালে আমরা শুনিয়াছি, এবং এই সকল রাজবন্দী সম্রাটের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না, এমন আশাবাণীও পেটেল মহোদয়ের প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর দেশের মনে স্থান পাইয়াছে। এই অবস্থায় পনের শত আবদ্ধ যুবকের মধ্যে এই কয়েক জনকে এতাবৎকাল কারারুদ্ধ রাখা সম্বন্ধে দেশনেতৃবৃন্দের দিক দিয়া আন্দোলন আলোচনা হওয়া উচিত, এবং আগামী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোনও সদাশয় সদস্য এই সকল বন্দীযুবকের যাহাতে আশু মুক্তি হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি।

সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায়, বন্দীগণের তালিকা বাহির হইয়াছে—

উহাতে প্রকাশ শ্রীঅমৃতলাল সরকার, যোগেন্দ্র দাস ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ সেন, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আশুতোষ কালি, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র গুহ, অরুণ চন্দ্র গুহ, শিশিরকুমার দত্ত গুপ্ত, সতীশ পাকরাশি, প্রবোধ চন্দ্র দাস গুপ্ত, যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, এবং প্রভাসচন্দ্র দে এই সতের জন মাত্র ১৮১৮ সালের রেগুলেশনে আটক আছেন। কিন্তু এই তালিকা নির্ভুল নহে। সেদিন আলীপুর জেল হইতে যাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের সংবাদের সহিত, মুক্তি পান নাই এরূপ নামের মধ্যে আমরা শ্রীনিশিকান্ত পাইন ও শ্রীরাইহরণ সেনের নাম দেখিলাম। সে যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট সতের জন অথবা সাঁইত্রিশ জন যুবক, যাঁহারা সম্রাটের ঘোষণা এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা দিয়া উদারতার পরিচয় দিবেন—ইহাই আমাদের নিবেদন। আমরা এ কথাও শুনিয়াছি—১৭ই ফেব্রুয়ারী, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট—শ্রীআশুতোষ কালি, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরাইহরণ সেনকে মুক্তি দিবার জন্য গ্যারাণ্টি পত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুমতি করেন, ইহাঁরা তাহাতে অস্বীকার করায়, এখনও আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সম্রাট্ যখন রাজনীতিক অপরাধীদের মুক্তিদানে কোন কৃপণতা দেখান নাই, এবং এই অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিতে যাঁহারা অস্বীকৃত নহেন, তাঁহাদের সহি করিতে যদি আপত্তি থাকে, গবর্ণমেণ্ট এতটুকু উদারতা দেখাইতে কুণ্ঠিত কেন? সহি করিলেই রাজভক্ত হইবে—অন্যথা বাহিরে আসিয়া তাহারা রাজবিদ্রোহী হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া অবশিষ্ট এই কয়েকজনকে অধিকদিন আবদ্ধ রাখিলে, জনসাধারণ কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় লইয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্টকে আমরা বহুভাবে আমাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছি এবং দেশের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে দেশনেতাদের তেমন মনোযোগ দেখিতেছি না—এবং যাঁহারা মুক্ত হইয়া ফিরিয়াছেন, অবশিষ্ট আবদ্ধ যুবক যাহাতে অচিরে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাও তাহার জন্য কোন প্রচেষ্টাই করিতেছেন না।

এইবার আমরা মুক্ত অন্তরীণদিগের কথা আলোচনা করিব। যাঁহারা

ভারতরক্ষা আইনে আটক পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-হিতৈষী, এবং সে যুগে, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাঁহারা সংসার ছাড়িয়া আসিতেন, তাঁহারা অবধারিত জানিতেন, যে-দেশের জন্য তাঁহারা কার্য্য করিবেন, সেই দেশই তাঁহাদের অন্নমুষ্টির সংস্থান করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ হওয়া অসম্ভব হওয়ায়, অনেকক্ষেত্রে কেহ কেহ রাজনীতিক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যাঁহারা এরূপ কিছু করিতেন না, তাঁহারা কোন গতিকে পিতামাতার অথবা আত্মীয়স্বজনের ভারবাহী হইয়াই অবস্থান করিতেন। দেশসেবার উত্তেজনায় উপায় উপার্জ্জন করিয়া যে জীবনধারণ করিতে হইবে, একথা বড় কেহ ভাবিবার অবসর পাইতেন না। ঠিক এইরূপ সময়ে ভারতরক্ষা আইনে একে একে আবদ্ধ হইলেন, একটা উৎকট কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় জেলে গিয়া প্রথম প্রথম অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত দেখিয়া কেহ কেহ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, প্রথম প্রথম আত্মহত্যা, অপমৃত্যু প্রভৃতির সংবাদ যে পাওয়া যাইত, ইহা এই অবস্থারই প্রকৃষ্টচিত্র। যাঁহারা অভিভূত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জেলে থাকিয়াই, বাহিরের সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে কোন গতিকে পুনর্জাগ্রত করিয়া আপনাদিগকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, স্থানে স্থানে যে অনশন ব্রতের সংবাদ পাওয়া যাইত, উহা কেবল প্রাণশক্তিকে জাগ্রত রাখিবার প্রচেষ্টা মাত্র। তবে পুলিশের যে অত্যাচার হয় নাই, জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ যে কয়েদীদিগের উপর বহু প্রকার দুর্ব্ব্যবহার না করিতেন, এরূপ নহে, কিন্তু সে সকল কথা মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকগণের মুখেই প্রকাশ হওয়া ভাল। আমরা এ সকল কথার আলোচনা করিব না।

এই অবস্থায় জেল হইতে বাহির হইয়া, যুবকগণ অকূলপাথারে পড়িলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে চাকুরী ব্যবসা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা উপায় উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন, তাঁহারা অনেকেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছেন, আর যাঁহাদের কোন বৃত্তিই ছিল না—কেবল হয়তো অধ্যয়ন করিতেন অথবা উপার্জ্জনের ক্ষেত্রটুকু নষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাওয়া যাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে, তাঁহারা আজ নিতান্তই বিপন্ন, নিরাশ্রয়। আমরা একথা শুনিয়াছি, কোন ভদ্রলোক রাজনীতিক সংশ্রবে আত্মগোপন করায়, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে

মুক্তির পর একেবারেই ইনি সহায়সম্বলহীন পথের ভিখারী—এই সকল যুবকের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীকে যথেষ্ট কিছু করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই উদাসীন নহে। খাস্ গবর্ণমেণ্ট না হইলেও উচ্চ কর্ম্মচারীগণ কেহ কেহ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এবং এই অর্থ দেশের ধীরপন্থীগণের হস্তে প্রদত্ত হওয়ায়, ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের প্রতিনিধি মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকগণকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। যাঁহারা চাকুরী করিতে পারেন, তাঁহাদের চাকুরির যোগাড় করিয়া দেওয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্যও যথারীতি পরিশ্রম করিতেছেন; লোকমুখে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জির কয়েক সহস্র টাকা ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, সম্প্রতি, সদাশয় গবর্ণর রোণাল্ডসে ও গুর্লে সাহেব কয়েক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন, নরমপন্থীদলের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তা থাকায়, ইঁহারা এই সকল যুবকের জন্য অনেক কিছু করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বাংলায় দলাদলি সবদিক দিয়া না হইলে, আসর গরম থাকে না। চরমপন্থীদলের কেহই তেমন অর্থ সাহায্য করেন নাই, অথচ বঙ্গীয় জনসভা এই সকল বিপন্ন যুবককে সাহায্য করিবেন বিজ্ঞাপন দেওয়ায় অনেকেই ইঁহাদের দ্বারস্থ হয়েন, কিন্তু দশ পাঁচ টাকা হাতে দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবার অবস্থা বুঝিয়া, যুবকগণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন; তাই সম্প্রতি মিঃ আই বি সেন প্রভৃতি চরমপন্থীগণ, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার রাজপথে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছেন। এই ব্যাপার আমাদের প্রহসন বলিয়াই মনে হয়—নূন্যাধিক শতজন মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক লইয়া দেশের এই হৈ চৈ উপভোগ্য বটে!

অন্যদিকে আবার এক নূতন অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কয়েকজন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন যুবক উভয় প্রকার উঞ্ছবৃত্তির পোষকতা না করিয়া নিজেদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইঁহারা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া লক্ষাধিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিতেছেন, ইহারা নরম গরম উভয় দলের পক্ষপাতী নহেন, নিজেরা নূতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া, দেশকে জানাইতে চাহেন যে আমরা উপেক্ষিত নহি, অক্ষম অসমর্থ নহি। ভগবান্ ইঁহাদের সহায় হউন।

এইবার আমাদের কথা বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। দেশ-প্রেম যাঁহাদের অন্তরের শক্তি, তাঁহাদের এই শক্তিকে স্বতঃ স্বাধীনভাবে উৎসৃষ্ট করিয়া কিছু সৃষ্টি করা অযৌক্তিক নহে। অন্নচিন্তা চমৎকার হইলে অনেক সময় হৃদয়ের কমনীয় বৃত্তিগুলি শুষ্ক হইয়া যায়, সেক্ষেত্রে, স্বাবলম্বী হইবার জন্য প্রত্যেক যুবককে কিছু করিতে হইবে। এবং আমাদের মনে হয়, কয়েক বৎসর কারাবদ্ধ থাকিয়া—বড় দেশভক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবার জন্য যদি পথে পথে বা দেশের লোকের উপর প্রকাশ্যে দাবী করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচয় প্রকাশ পায়। অনেকক্ষেত্রে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক কিছু দাবী করিতে প্রতিদিনই হাঁটাহাঁটি করিতেছেন, অবশ্য ব্যক্তিগত অনেক জীবন গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনফলেই যে আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দেশসেবা করিতে সহ্য করিয়াছি—এরূপ গর্ব্ব যাঁহাদের বুকে আছে, তাঁহাদের অঞ্জলিবিস্তার আমাদের চক্ষে বড় অশোভনীয়।

অনেকেই বলিবেন, অবস্থায় পড়িলে যে-কোনরূপ একটা ব্যবস্থা করা চাই। সে ব্যবস্থা ভিক্ষা নয়, আপনার যোগ্যতাকে প্রকাশ করিয়া তোলা। পনের শত অন্তরীণমুক্ত যুবকগণের মধ্যে হয়তো শতজন একেবারেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই শতজন প্রত্যেকেই আপনাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারেন। উপস্থিত আহারসংস্থানের জন্য কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ী অবস্থান করিয়া, স্বাধীনভাবেই উপার্জ্জনের পন্থা অন্বেষণ করা ভাল। অনেকের হয়তো স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পোষ্য আছে—দেশের দিক হইতে ইহার একটা উপায় হওয়া উচিত, আর যাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দেশের কাজ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এতখানি অক্ষমতা কেন? দেশের কাজ তো এখনও অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—নিজের ভরণপোষণ ব্যাপারে কলিকাতায় ছয় মাস ধরিয়া যদি দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, তাহা হইলে দেশসেবকগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে দেশ যে ক্রমে সন্দিহান হইয়া পড়িবে।

সংসারী যাঁহারা, তাঁহারা ধীরে ধীরে নিজ নিজ পথ স্থির করিয়া লইয়াছেন। কয়েকজন মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটিনিউ কর্ত্তৃক আমরা এই প্রশ্নটি তুলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, এই যে কলিকাতার রাজপথে ডেটিনিউদিগের

সাহায্যকল্পে যাঁহারা উঞ্ছ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কাহাদের প্রতিনিধি, কোন্ কোন্ ডেটিনিউদিগের সাহায্যের জন্য এরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? তবেই দেখা যাইতেছে—নরম দলের নেতৃত্বাধীনে একদল ডেটিনিউ আছেন, এই ভিক্ষুকপন্থীদের আশ্রয়েও ডেটিনিউ, আবার "সারভেণ্ট" অফিসেও মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটিনিউ। এই সকল—রিফর্ম লইয়া যে নির্ব্বাচন আন্দোলন চলিবে, তাহারই গৌরচন্দ্রিকা নয় তো?

হায়, দেশসেবকের দল, এখনও দেশে তোমাদের মত সহস্র সহস্র কর্ম্মীর অন্নসংস্থান আছে, এখনও মাঠে সোণার ফসল বাংলার কোল আলো করিয়া বিরাজ করে, এখনও অন্নসংস্থানের স্বাধীন পথ অবারিত, জীবন চলিলে হুজুগ করিয়া সময় নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি যায় না।

দেখিতেছ কি, যমের দুয়ার কেমন খুলিয়া গিয়াছে—১৯১৩ সালে মানুষ মরিয়াছে হাজার করা ২৮·৭২, ১৯১৮ সালে মরিয়াছে ৬২·৪২, এই পাঁচ বৎসরে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির মত এই মৃত্যুর আধিক্য ভয়াবহ নহে কি?

কাজ আছে। দেশকে বাঁচাইবার জন্য আমাদের বিপ্লবযুগের মতই অনন্যমনা হইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে হইবে, রাজশক্তি ভারতের প্রাণে সে শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে না যে শক্তি আজ এই মৃত্যুকে মোড় ফিরাইয়া দিবে, যদি আমরা নিজেরা বাঁচিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া না উঠি।

আজ দেশসেবক বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে, যে কেবল বাঁচিতে হইবে না, তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে—প্রকৃত দেশসেবার অধিকার যাহার জন্মিবে জননী ভিখারিণী হইলেও, এমন লক্ষ সন্তানের সকল ভার গ্রহণে তিনি অসমর্থা নহেন। সে কোন্ পন্থায় সুসিদ্ধ হইবে—তাহা ছকিয়া দিলে, দেশের প্রাণশক্তি স্বাধীন গতি লাভ করিবে কি করিয়া? তাহাই তো তপস্যা, উত্তেজনার কুহকে হুজুগের উল্লাসে বহুমূল্য সময় অনর্থক নষ্ট করিও না, নিজের দিকে ফিরিয়া চাও, দেখিবে বিরোধহীন এক সুষ্ঠু পথ তোমার মধ্যেই দেদীপ্যমান—সেই সিদ্ধ পথে চলিবার জন্য পার্থ-সারথী অনাহত পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া ধ্বনিত করিতেছেন,—স্বদেশসেবক তোমাদের নামে আজ এ হাহাকার তোমাদের ত্যাগ নিষ্ঠা বীরত্বের ইতিহাসে কালি ঢালিয়া দিল—তোমরা ঘরে ফিরিবে কি?

আগমন

শীতান্তে বসন্তের প্রথমপদ পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছে। প্রাতঃকালে বাহিরে আসিয়াই শুনিলাম অতিথি আসিয়াছেন নীরবে গোপনে—খুঁজিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিতে হইবে।

খুঁজিয়া বাহির করিব কেমন করিয়া—অতিথির বেশভূষা গঠন আকৃতি কিছু বিচিত্র ধরণের কি? না—তাহা নহে। তবে এত ভীড়ের মধ্য হইতে অতিথিকে চিনিব কি প্রকারে? কোন বিশিষ্ট নিদর্শন থাকিলে বাহির হইতে পারি।

আকাশের কোলে স্নিগ্ধ কোমল আলোকচিত্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাছের ডাল হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া কোকিল উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, চূতমুকুলে রৌদ্রকিরণ ঝলসিয়া উঠিল, কাল কাহারও অপেক্ষা রাখে না, অতিথি কিন্তু প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য। কাজেই অন্বেষণে বাহির হইলাম।

কোথায় যাইব—মানুষের মেলা বসিয়াছে জগৎ জুড়িয়া, নাম জানিলেই তো মানুষ চেনা যায় না! সে কোন্ পথের ধারে, নদীর তীরে, গাছের ছাওয়ায় বসিয়া আছে, সারা পথ কি ডাক দিতে দিতে ছুটিব? সে যে আসিয়াছে গোপনে—খুঁজিয়া একেবারেই তার হাতখানি বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতে হইবে।

নদীর কূল কিনারা নাই। কত নাবিক অনির্দ্দিষ্ট পথের দিকে পাল তুলিয়া ছুটিয়াছে, আমি তীর ধরিয়া ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিলাম—পার্শ্বে নিবিড় বনশ্রেণী—সে কোন্ দিকে—ঐ পারের কুয়াসা, উহার পশ্চাতে যে নূতন দেশ, অভ্যাগত যদি সেইখানেই আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে! আমি নিরুপায়—নদীর কূলে কূলে ছুটিব, নদীর মত অসীমের কোলে স্থান পাইব না কি?

অধিক দূর যাইতে হইল না—তীরে খোঁটা পুঁতিয়া তরীখানি মোটা দড়িতে বাঁধিয়া, তরঙ্গের আঘাতে সে দোল খাইতেছিল—অন্তরের টান

তার পারের দিকে—কিন্তু চাহনিটী আছে, পায়ে পায়ে গড়িয়া উঠা ঘাসের বুকে এই সরু পথটীর উপর দিয়া যে পথিক ছুটিয়াছে তাহার দিকে।

চাহনি দেখিয়াই চিনিলাম, সে আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে—কত দূর হইতে সে আসিয়াছে এই দেশের মাটীকে ধন্য করিয়া তুলিবার জন্য—সংশয় একেবারেই তাহাকে ধরিতে দিল না—সেও কিছু বলিল না—আমি আরও আগাইয়া আসিলাম। কিন্তু পথ আছে সোজা—কত দূর দূরান্তরে সে-পথ বহিয়া যাওয়া যায়, আমার কিন্তু পা আর আগাইতে চাহিল না।

ফিরিলাম। একবার দুইবার দশবার তাহার চাহনির রেখার মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম—অবশেষে নিকটে আসিয়া কহিলাম—"হাঁগা, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কাহার জন্য তোমার অপেক্ষা?"

সে যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল আমার কথার উত্তর দিবার জন্য—আমার কথা শেষ হইতে না হইতে বলিল, "তুমি চাহ কাহাকে—কাহার জন্য তুমি ছুটাছুটী করিতেছ?"

"তা জানি না—তাহাকে চিনি না—তুমি কি সেই?" সে হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া তাহার নৌকায় আমায় উঠাইয়া লইল। খোঁটার দড়ি খুলিয়া দিল, "ঐ অনির্দ্দিষ্ট পারের দিক্ হইতে আসিতেছি তোমার ঘাটে নৌকা বাঁধিবার জন্য—তুমি আমায় লইয়া চল।"

আমি লগী ঠেলিয়া আমার ঘাটে আনিয়া তাহাকে মাটীতে নামাইলাম—আমার ঘাট আমার ঘর নূতন পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এই নৌকা বহা আজও আমার শেষ হয় নাই। অতিথিকে লইয়া ঘাটে ঘাটে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতেছি—তীরে দাঁড়াইয়া যে তার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে তাহারই ঘরে উৎসব আরম্ভ করিয়া দিই।

আমার এই নূতনকাজ বুঝি শেষ হইবে না—নদীর তীরও অসীম—মর্ত্ত্যবাসী, এই অচিন আতিথির পরিচয় লইবে কি?

নব তান্ত্রিক

চাহিয়াছি সহস্র সন্ন্যাসী! নবীন দলের কেহ কেহ চমকিয়া উঠিয়াছেন, ত্যাগবৈরাগ্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত "প্রবর্ত্তকে"র এই নূতন আহ্বানে।

বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। "প্রবর্ত্তক" যাহাদের চাহে, তাহারা ইহবিমুখ, আত্মমুক্তিপরায়ণ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। তাহারা আপনার সবখানি উৎসর্গ করিয়া ভরাইয়া লইবে ভাগবতভাবে, ভাবময় ভগবানকে সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মূর্ত্ত বস্তুতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করিবে।

করিবে কে? ঐ বিরাট অন্ধকারের স্তূপ অপসারিত করিয়া অজস্র ধারায় অনির্ব্বচনীয় ভাগবত জ্ঞান ঢালিয়া জগতকে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিবে কে?

সংসারের সহস্র বন্ধন গলায় জড়াইয়া স্পর্দ্ধাশীল সাধক গন্ধমাদন মাথায় বহিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। ভগবানকে সবখানি দিয়া মহা বীর হও, শিরায় শিরায় ওজঃ সঞ্চারিত কর, তিল তিল করিয়া আপনাকে ঢালিয়া চল, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এ যে তুমুল সংগ্রাম। হে দেব-সৈনিক! জয় তোমার পরম ভোগ, পরম আনন্দ—ব্যষ্টিজীবনের পরিপূর্ণতা মিলিবে সেই দিন যে দিন সমষ্টিজীবনের মধ্যে তুরীয়ের অক্ষয় সম্পদ ভারে ভারে নামাইয়া আনিতে বাধাহীন হইবে—ভরাইয়া তুলিতে পারিবে জগতকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে।

জ্বলুক জীবনখানি হু হু করিয়া অবিশ্রাম দাবানলের মত—ঠিকরিয়া পড়ুক আগুনের স্ফুলিঙ্গ আকাশে বাতাসে, বিজলীরেখার মত লক্ লক্ করিয়া—উল্কার মত ছুটিয়া চলুক অনির্দ্দিষ্ট অসীমের পথে, গতির বেগে গড়িয়া উঠুক নূতন পৃথিবী।

রমণীর পীনোন্নত পয়োধরে যে সত্য যে সুষমা আছে, ভগবানের আলোর

পাইলে নির্ব্বিকার হইয়া উহা উপভোগ করিব—বাংলার শীতল শ্যাম ছায়ায় পিরীতির যে মধুময় কলতান গুঞ্জরিত হইতেছে তাহা না-হয় পরে শ্রবণ করিব—আজ কিন্তু আদেশ আসিয়াছে জাগিতে জাগাইতে—মানুষের জীবনখানি একেবারেই অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া দিতে—আমার পথরোধ করিবে কে? কোন্ মুহকমন্ত্রে পরিপূর্ণ জীবনলাভের প্রত্যাশায় অসংখ্য বিচিত্র ভোগাধার বলিয়া আপনাকে আগাইয়া দিব? আমার জীবন পরিপূর্ণ, খুঁটিনাটী ভোগের সমাহারে নহে, ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে তিনি চাহেন কি, তাঁর চাওয়াটিকে সফল করিয়া তুলিতে।

কে আদেশ পাইয়াছ, খোল করতালের কোলাহলে জীবনের দিন তরঙ্গ আনন্দে গলাইয়া নিঃশেষ করিবার জন্য?—বাধা দিব না—অন্তরতম সত্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই দুটী বাহুনিস্তারে তাঁহাকে হৃদয়ে জড়াইয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতি যদি পাইয়া থাক—দেশকে মাতাইয়া তুলিবে—কেবল হরি হরি বলিয়া—অগ্রসর হও। জীবন-প্রদীপে অবিরত ঘৃত সঞ্চার কর—যেন উহা ম্লান স্তিমিত হইয়া না পড়ে।

সাধনার গোপন-মন্দিরে বসিয়া কে যুবতীর অনিন্দ্য-রূপ-সুধাপানে বিভোর আছ—একবার আপনার দিকে ফিরিয়া চাও, দেখ নয়নের দৃষ্টি ঐ উপরের জগৎ হইতে অবতরণ করিতেছে কি না—যদি সত্য হয় আঁখিতারা জল করিয়া ফেল, রূপে রসে, শরীর মিশাইয়া দাও ভোগালিঙ্গনে ফিরিও না—মরণের মধ্যেই অমৃতের সন্ধান মিলিবে।

চাই আদেশ—চাই অন্তরতম পুরুষের চাওয়া—আজ আমরা একদল সাধক আদেশ পাইয়াছি বিজন অরণ্য কাটিয়া সুরম্য নগরী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাংলার শ্মশানে অস্থিকঙ্কাল ঝাঁটাইয়া মহাকালীর রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। এই আদেশপ্রতিপালনই আমাদের জীবনখানি ভরাইয়া তুলিয়াছে—বুঝি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—মাথার উপর দিয়া মহাকাল হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে—সন্ধিক্ষণ আসিল বলিয়া, সে-মহামুহূর্ত্তে যদি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত না হয়, জাতির আরাধনা ব্যর্থ হইবে—বাংলার এই নূতন দলের কর্ণেই উৎসাহের বিদ্যুৎমন্ত্র ঝঙ্কৃত হইতেছে।

চল—চল—আগাইয়া চল—এবার আর বিদ্বেষ নয়, বিদ্রোহ নয়—মহা সমারোহে জাতির মানস-ঠাকুর জাগ্রত হইবে উদ্বুদ্ধ হইবে। যে পথ বহিয়া জাতি নাচিবে ছুটিবে চলিবে, সে পথ যে আজিও নির্ম্মাণ হইয়া উঠিল

না, যে চন্দ্রাতপতলে মহামেলা বসিবে, তার স্তম্ভ যে আজও প্রোথিত হয় নাই, মণিমুক্তা সংগ্রহে এখনও তোমরা উদাসীন কেন, ঝল্‌মল্ করিয়া ঝালর দুলিবে, পতাকা উড়িবে, বাংলার মাটীর উপর গালিচা বিছাইয়া দিবে—কাজ যে এখনও অনেক পড়িয়া আছে—তোমাদের উপর যে কাজের ভার পড়িয়াছে নিখুঁত করিয়া তাহা প্রতিপালন কর, ভগবানের আদেশ পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইলেই তোমাদের দেবজীবন সফল হইবে।

কে তুমি গাছের ছাওয়ায় বসিয়া পড়িলে? মুখখানি তোমার মলিন কেন, সংশয়ে ললাট কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে—কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া সরিয়া বোস; আদেশ পাইলে আবার আসিও—আমাদের জীবন আদেশময়—আমাদের ক্লান্তি নাই শ্রম নাই সংশয় নাই; নদী-তরঙ্গের মত আনন্দের তুফান তুলিয়া ছুটিয়াছি।

দলে দলে আসিতেছে প্রথম দলের সৈনিক—এস, ললাটে তোমাদের বিজয়-টীকা—তোমাদের চোখের আলো আমার অন্তরে পৌঁছিলেই বুঝিতে পারি, তোমরা আমাদেরই—এক্ষেত্রে তর্ক নাই, প্রশ্ন নাই, বিরোধ নাই—আছে শুধু কাজ, তাহাও নিষ্পন্ন হইতেছে উপরের অজস্র শক্তিপ্রবাহে—সাধক কেবল সকল ইন্দ্রিয় ছড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে ধুর্জ্জটীর মত; উপর হইতে গঙ্গাপ্রপাত সহস্রধারায় ঠিকরাইয়া পড়িতেছে আর ছুটিতেছে মত্ত মাতঙ্গের মত বাংলার বুক বহিয়া—সাধনা সিদ্ধি আমাদের কিছুই নাই, ভগবানের চাওয়া দিন দিন সফল হইয়া উঠিতেছে, আনন্দই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এ যে আনন্দের ঢেউ—হরে মুরারে! হরে মুরারে!!

নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে আজ যাহারা তাহারা তো কূলের আবর্জ্জনায় আটক থাকিবে না—অহং-এর ছাপ তাহাদের অঙ্গে টিকিবে কেমন করিয়া? তাহারা দেখিতে তরঙ্গের মত, স্পর্শে জল ভিন্ন কিছুই নহে, লীলার উল্লাসে পুলকিত উচ্ছ্বসিত আকার লইয়া ছুটিয়াছে মাত্র। বাংলার সকল তরঙ্গ একই নদীর প্রবাহ, পরস্পর পরস্পরের উপর আছাড় খাইয়া এক হইয়া যাইবে—বাংলায় বিপুল ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে সাধিত হইবে—বাংলার যজ্ঞবেদীতে যে প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, জগৎ জুড়িয়া উহারই প্রতিধ্বনি উঠিবে—আমরা এক্ষণে বেদী রচনা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র।

ভাগবত-জীবন

চাই ভাগবত-জীবন। তার জন্য যে তপস্যা, তা মানুষকে করতে হয় না, মূলে যিনি সেই "ব্রহ্ম নিষ্কলম্, শুভ্রম্, জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ" আপনি প্রকাশ হবেন—সাধনা তাঁর, মানুষের নয়। আত্মসমর্পণ-যোগের সাধক স্বয়ং ভগবান।

* * *

ভগবান্ যখন বুদ্ধির মনের প্রাণের শরীরের সবখানি ভরিয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ হন, তখনই কানায় কানায় ভাগবত জীবন উপছিয়া উঠে। এইরূপ জীবনের যে সমষ্টি, তাহাই দেবজাতি, জগতের সকল মানুষেরই ইহাতে অধিকার আছে।

* * *

যেখানে সাধনা আরম্ভ অহং-জ্ঞানের উপর, চরমে ইহার একান্ত নিরসন ঘটলেও, সাধনকালে ইহার প্রকাশ, আত্মসমর্পণ-যোগীর সঙ্গে আদৌ মিলে না। মানুষের সাধনা অঙ্গ বিশেষের অনুশীলন করে, একটির পর একটি, এমনি ভাবে সে সবখানিকে বিশুদ্ধ করে' তোলে। ইহাতে অঙ্গবিশেষের পূর্ণ পরিণতি না আসতেও পারে, কেননা দর্শন আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করায়, দৃষ্টির পরিধি অনুসারে উহা সংসাধিত হয়। দৃষ্টি যতই প্রসারিত হবে, ততই নিখুঁত সৃষ্টির সম্ভাবনা।

* * *

আত্মসমর্পণ-যোগীর সাধনা ভগবানের হাতে, কাজেই সাধকের অজ্ঞাতে একেবারে মূল থেকে শুদ্ধি আরম্ভ হয়, ভগবানের পূর্ণ দৃষ্টিকে কোন অশুদ্ধতাই অতিক্রম করে' যেতে পারে না। সিদ্ধি যখন আসে একেবারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তার আগে কেবলই হয়তো একই প্রকারের সাধনা বহুবার চলতে থাকে—ঠিক যেন নালি ঘায়ে আঙ্গুল দিয়ে কুরে কুরে পুঁজ রক্ত বার করে আনা—সকল যন্ত্রে যত প্রকারের অশুদ্ধতা আছে তার সমস্তটুকুকে নিঃশেষ না করে, এ যোগের

শেষ নাই। ইহা চলে যুগ যুগ জন্ম জন্ম—সেইজন্য, ভগবান স্বয়ং সাধক হলেও অহঙ্কারকে অনন্ত ধৈর্য্য দিয়ে নিশ্চেষ্ট রাখতে হয়, সাধনার প্রথম ক্রমই হচ্ছে বাসনাশূন্য এবং নিশ্চেষ্ট হওয়া।

* * *

আত্মসমর্পণ-যোগীর ভাবের সঙ্গে অপরাপর সাধনার ভাবে মিল হয় না বলেই স্বভাবতই এই যোগীর থাক ভিন্ন হয়ে পড়ে, তার মানে এই নয় যে অন্যের সাধনা ভুল। আর সাধনকালে ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির পরিচয়ে যে অন্তরগত মিলন দেখা যায়, ঐ মিলনের ফলেই বষ্টির সাধনা ব্যাপক আকারে সমষ্টিগত হয়ে পড়ে, ক্রমে এমন হয়, সিদ্ধ ব্যক্তির স্মরণাগত হলেই, ভগবান্ একের সিদ্ধি দিয়ে অপরের শুদ্ধি দ্রুত সংসাধিত করেন। সম্মুখে যে যুগ আস্‌ছে তাতে এমন অসংখ্য অসংখ্য লোকের মুক্তি সিদ্ধের সংস্পর্শেই সাধিত হবে, প্রতি ব্যক্তিকে আজকার মত এমন করে' মন্থর গতিতে চল্‌তে হবে না!

* * *

এককে অবলম্বন করে' যে তুরীয়-বোধ মর্ত্ত্যে নেমে আস্‌ছে—মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়্‌বার তার একটা ধারা আছে। প্রণালীর কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আকার না থাক্‌লেও একটি মূল ভাব ইহাতে বর্ত্তমান আছে, সে মূল ভাবটি আর কিছুই নয়, সবাইকে প্রথম থেকেই একান্ত ভাবে অহঙ্কারকে ছেড়ে চল্‌তে হবে। উপরের সত্য প্রেরণার সঙ্গে অহংএর এমন পরিচয় হওয়া চাই, যেন তার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান এক তিলও না থাকে।

* * *

বিপুল মানবসমাজে সকল মানুষ একেবারেই তো তাদের স্বভাব সংস্কার ছেড়ে ভাগবত জীবন লাভ কর্‌তে পারে না—ব্যষ্টির পর ব্যষ্টি যেমন এই যোগ গ্রহণ কর্‌তে থাকে, ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির পরিচয়ে খণ্ড খণ্ড মণ্ডলী সৃষ্টি হওয়া তদ্রূপ বিচিত্র নয়, তারপর মণ্ডলীর সহিত মণ্ডলীর পরিচয়েই, ক্রমশঃ বৃহৎ মণ্ডলী গড়ে' উঠ্‌তে থাকে। কোন ক্ষুদ্র মণ্ডলী এরূপ বোধ কর্‌তে পারে না, যে তাদেরই পরিধিচক্রে আর সব মণ্ডলী ক্রমে প্রবেশ করুক—এরূপ বোধ যেখানে আছে বুঝ্‌তে হবে সেখানে ভাগবত জ্ঞান তেমন মূর্ত্ত হয়ে নেই, কর্ম্ম বা ভক্তির অনুশীলনে ভাবগত

মিলনের ফলে—সেগুলি এক একটী দল বা সম্প্রদায়। নূতন যোগের যে মণ্ডলী, উহা ভাগবতসৃষ্টির এক একটি ক্রম মাত্র। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমের পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী।

* * *

মণ্ডলী কিন্তু গড়িবেই। উষাসমাগমে দিগ্‌চক্রবালের গভীর অন্ধকার-পটে ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া যেমন আলোর আঁচোর ফুটে উঠে, তেমনি মানব-মণ্ডলীর মধ্যে, ভাগবত জীবন জাগরণের সন্ধিক্ষণে, জ্ঞানপ্রকাশের এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন রেখার টান প্রতিভাত হবেই, ইহার অর্থ এরূপ নয়, যে ঐ রেখাগুলির টানাটানিতেই মানুষের জীবনে ভাগবত প্রকাশ বিপুল আকারে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—মানব আধারের অন্তরতম প্রদেশে যে অজানিত শাশ্বত পুরুষ জেগে উঠ্‌তে ইচ্ছা করেছেন, তাঁর ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ দেবসমাজ গড়ে' উঠ্‌বে।

* * *

আমরা এই নূতন যোগের অসংখ্য ক্ষুদ্রসমষ্টির সৃষ্টিকামনা করি। সমষ্টি-গুলি অহঙ্কারের ঢিপি না হ'য়ে, ভগবান্‌কে পাবার ও জান্‌বার কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ যুগে ব্যক্তিগত সাধনার অনুমতি নাই, ভগবানের ইচ্ছা মানবজাতির মধ্যে একটা ঐক্য এবং সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হোক—সর্ব্বকামনা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত ভোগের সমতাবিধান করাই বর্ত্তমান সাধনার লক্ষ্য।

* * *

ভাগবত সাধনার ফলস্বরূপ, এক একজনকে ঘিরে যে অসংখ্য মণ্ডলীর সৃষ্টি, সেগুলি ব্যষ্টিসাধকের মতই একটি হ'য়ে গড়ে' উঠা চাই, ব্যষ্টি যেমন ব্যষ্টির সঙ্গে অনায়াসেই মিলেমিশে সমষ্টির আয়তন বৃদ্ধি কর্‌তে পারে, সেইরূপ সমষ্টিতে সমষ্টিতে মিলে বৃহৎ সমষ্টির রচনা করুক। এই মিলনের অন্তরায় বিচিত্র সাধনভঙ্গী নয়, অন্তরায় আপনার সৃষ্টিটিকেই সত্য ও দিব্য বলে বোধ, আর সব মিথ্যা ও মায়ার রচনাজ্ঞানে উপেক্ষা।

* * *

আত্মসমর্পণযোগে সমষ্টি রচনার পরও যে অহংকার থাকে, উহা সাত্ত্বিক অহংকার। আপনার সবখানিকেই বড় বলে' দেখা। এই অহং একেবারেই যখন ত্যাগ হবে, তখন সমষ্টির মিলনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে না।

আজ বাংলাদেশে অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করে' যে সকল ক্ষুদ্র সমষ্টি মাথা তুলে উঠ্‌ছে—তারাও যে-বিশ্বশক্তির দ্যোতনায় পা বাড়িয়ে ছুটে চলেছে, দেশের অন্যান্য অসংখ্য সমষ্টিও সেই মহাশক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। স্বভাবানুযায়ী বিকাশের তারতম্যে অন্তরগত মিলনের কোন বাধাই নাই। বাংলায় ভাগবত ইচ্ছাসম্ভূত এই সকল সংঘগুলি যতই একত্র হবে, আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—শক্তিসঞ্চারণ ততই প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌বে।

* * *

এইরূপ সংঘসৃষ্টির প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। জগতে জাতিসৃষ্টির যে ছাঁচ, তাহা এখনও অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ; যখন মানুষের প্রাণে এক দিব্য অধ্যাত্ম তপস্যা জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন জগতজোড়া এক মহা-জাতির সৃষ্টি হবে, এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের উপর তখন আজকার মত এতটা নির্দ্দয় ও মমতাশূন্য হবে না, মানবজাতির মধ্যে যে একতার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতে সম্ভব হয়ে উঠ্‌বার কল্পনা সকল দেশে জেগেছে তার বীজ ভারতের বুকেই পড়েছে, বাংলাদেশেই তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। বৃহৎ বনস্পতির অঙ্কুর উদ্গম সময়ে ইহার বৃহৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দি-হান্ হতে পারেন, কিন্তু জগতের সত্যপ্রকাশের সাধনা বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছে এবং ইহা ক্রমবর্দ্ধিত হ'য়ে সারা বিশ্বে একদিন ছড়িয়ে পড়্‌বে—ইহা ধ্রুব সত্য।

দেব সংঘ

যাহারা দেবজীবন চাহে তাহারাই দেবসংঘ। দেবত্ব কোথাও হইতে অর্জ্জন করিতে হয় না, মানুষের জীবনে ইহা স্বতঃমূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের শরীর প্রাণ মন পরিচ্ছদ মাত্র, ইহার ভিতরে যে সত্তা আছেন, তিনিই দেবতা, তাঁর প্রকাশ রোধ করিবে কে?

যদি দেবচরিত্র লাভ করা মানুষের সত্যস্বভাব হয়, উহা তো সংসিদ্ধ হইবেই, মানুষের ইহার জন্য করিবার কি আছে! এক দিক দিয়া দেখিলে প্রকৃতই কিছু করিবার নাই, সেই জন্য মানুষকে হইতে হইবে নিশ্চেষ্ট, প্যাশিভ। অপর দিক দিয়া দেখিলে, করিবার তাহার অনেক কিছু আছে।

করিতে হইবে না—কিন্তু জানিতে হইবে যে সে ভগবানেরই বিগ্রহ। মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে—যে ভগবান্‌ই সব—মানুষ নশ্বর মায়াচিত্র; কাজেই, মহামায়ার ফাঁদে পড়িয়া ব্রহ্ম কাঁদিয়া সারা হইতেছেন।

মানুষের অন্তরতম পুরুষ যিনি, তিনি ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময়। দ্বন্দ্বরহিত অজর অমর এই বিশ্বসত্তা অখণ্ড, কোথাও তার ছেদ নাই, ভিন্নতা নাই, কিন্তু শরীর প্রাণ মনের বাঁধনে যে চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে—উহা বদ্ধ, জরামরণশীল, শোকদুঃখকাতর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে জীবাত্মাকে শান্তি পাইতে হইলে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, আপনার বিশিষ্টতা বর্জ্জন করিয়া। কেননা ভেদ থাকিতে ভগবানের সহিত মিলন একেবারেই সম্ভবপর নহে। আর এরূপ যদি হয়, ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারিলে, আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও মুক্ত ও দ্বন্দ্বরহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুকে বর্জ্জন না করিলেও, মানুষ আনন্দময় হইতে পারিবে।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দময়, আর মানুষ চিরদুঃখী, এরূপ অবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাওয়াই মঙ্গল, অথবা মানুষের চেষ্টা যদি মর্ত্ত্যের অশেষ যন্ত্রণা দূর করিয়া ইহাকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে, তাহাও

কল্যাণজনক। য়ুরোপের বিজ্ঞান এই দিকেই মনোযোগ দিয়াছে। ভারত কিন্তু মায়াবাদকেই শ্রেয়ঃ করিয়া লইয়াছে। এই দিকে বিশেষ কোন গোণযোগ নাই, আপনাকে চিরদিনের জন্য ধরাবক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলেই সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। নির্ব্বাণ, পরামুক্তি, মোক্ষ—ভারতের সাধনা।

যাহারা জীবন চায় এবং জীবনের মধ্যেই ভগবানকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিবে এমন সঙ্কল্প রাখে, তাহাদের সাধনা বিভিন্ন প্রকারের। তাহারা জানিতে চাহে ভগবানকে এবং এই জানার সঙ্গে তাহার নিজের যদি কোন অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দেবজন্মের স্বপ্ন সার্থক হইবে।

আত্মা এক অখণ্ড। মানুষের জীবনে উহার খণ্ডতা অনুভূত হইলেও, ঐ বোধ সত্য কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। অসীম, উপাধি-আকারবিশিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, তিনি যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকিবেন এমন কোন কথা নাই—অসীমের স্বভাব সীমার মধ্যেই যে জাগ্রত না হইবে, এ কথা কে বলিতে পারে!

শরীর মন প্রাণের বন্ধনে অখণ্ড সত্তার যে অংশ, উহা প্রকৃতির অধীন। কিন্তু এই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে যে তুরীয় জ্ঞান, উহা বিশ্বের সবখানি, সুতরাং জগৎ সৃষ্টির মধ্যে কোথাও যদি এই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, সৃষ্টির মধ্যেই অনন্ত ভগবানের বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

জড় রচিয়া তুলিয়াছে যে জীবন, উহা তাহারই অন্তরস্থিত সুপ্ত সামগ্রী। এই জীবন লাভের জন্য জড়ের মধ্যে যে বিবর্ত্তন, যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ, উহার তলে তলে জ্ঞানের প্রবাহ বিদ্যমান, কিন্তু বাহির হইতে ইহার সাধন একেবারেই বুঝা যায় না।

কিন্তু জীবনের খেলায় জ্ঞানের এই অস্ফুট আলোকরেখা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। জীবন সংগ্রাম করে—প্রকৃতিকে জয় করিয়া অমর হইবার জন্য। ঘন ঘন আধার পরিবর্জ্জন ও পরিগ্রহণে, সে অমর প্রবাহের সন্ধান পায়, জীবনের শেষ নাই ছেদ নাই, ইহা সে জানিতে পারে। এই জানাতেই মনের সৃষ্টি, মনে যে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, তাহাও পরিপূর্ণ নহে; খণ্ড জ্ঞানালোকে মন যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, তাহাই গুছাইয়া সাজাইয়া সে এক রাজ্য গড়িয়া বসে, ইহাই তাহার Self-formulative অহঙ্কার। এই অহংএর দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টনে যে

চৈতন্য, তাহাই জীবাত্মা, পরন্তু উহা সত্যের সবখানি নয়, সেই জন্যই বন্ধনের মধ্যে যে অতৃপ্তি দুঃখ উহা আর কিছুই নহে, অহংএর লৌহ কপাট চূর্ণ করিয়া বদ্ধজীবনকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

অতএব সত্য ও ঋতময় জীবনলাভের জন্য, আধারের কোন অংশই পরিবর্জ্জনীয় নহে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কলেবরাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যেমন স্বাভাবিক, অন্তঃকরণ সমূহকেও তদ্রূপ অধিকতর শক্তি আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উপযোগী আকার পরিগ্রহণ করিতে হইবে—প্রকৃতিই ইহা করিয়া চলিবেন—মন দিয়া ইহা জানিতে হইবে মাত্র।

ভগবানের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির সৃষ্টিরচনা। প্রকৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন মানুষের শরীর—ভগবানের বিপুল আনন্দের প্রতীকরূপে; উহা চিরদিনই অনন্তের ইচ্ছাকে এরূপ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিবে না। মানুষের খণ্ডজ্ঞান অসীমের জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে অহঙ্কাররূপে, ভগবানের আলোকপাতে খণ্ডজ্ঞানী সৃষ্টি করিতেছে ঘোরতর অজ্ঞানতা।

এই অজ্ঞানতা একেবারে অলীক নহে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে জ্ঞানসূর্য্য। মনের প্রসারণে এই দিব্যকিরণ যতই অধিক প্রতিভাত হইবে, ততই মনের গতি ঊর্দ্ধপথে পরিচালিত হইবে এবং এই মন দিয়াই আমরা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইব।

অহঙ্কারের মধ্যেও সত্য নিহিত আছে। অনন্ত ভগবান ইচ্ছা করিয়াই বহু হইয়াছেন। বহুর আনন্দ একে, ও একের আনন্দ বহুতে উপভোগ করিবার জন্য। একের মধ্যে তাঁর যে আনন্দ, ইহাতেই সৃষ্টি হইয়াছে ব্যষ্টি ভগবান। মানুষের অহঙ্কার ইহারই বিকৃত প্রকাশ। কেননা অনন্ত চৈতন্যের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন বোধেই ইহা আত্মপ্রকাশ করে।

দেবজীবন লাভ অলৌকিক বা রহস্যময় কিছু নহে। মানুষের জীবনে যে বীজ সংগোপিত আছে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া জীবন ছাইয়া ফেলিবে—মানুষের বর্ত্তমান স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। জীবন মরণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য, দেব নর, এই সকল পরস্পর বিরোধী নহে; মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের অভিব্যক্তি, মর্ত্ত্যেই স্বর্গের আনন্দ লীলায়ত, নরের মধ্যেই নারায়ণের প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত।

জীবন ছাড়িয়া যদি অমৃত আহরণ করিতে হয়, অজ্ঞানের ক্ষেত্র

মনকে লয় করিয়া যদি জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ সম্ভব হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠান ভঙ্গ করিয়া যদি মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে দেবজীবন দুরাশা মাত্র। জীবন দিয়াই আমরা পাইতে চাই অমরত্বকে, এই মনের প্রসারণে অবধারণ করিতে চাই অসীমের জ্ঞানকে—জরামরণশীল আধারকেই পরিপূর্ণ করিতে চাই মুক্তির আনন্দে।

আমাদের আধার হইবে সবল সুস্থ পুলকপূর্ণ, প্রাণ হইবে অমৃতসিঞ্চনে নবীন উৎসাহচঞ্চল, আর মন অনন্ত জ্ঞানরশ্মি সমীকৃত করিয়া, সমস্ত-খানিকে ছুটাইয়া চালিত করিবে সচ্চিদানন্দময়ের মন্দিরে। উপরের আনন্দ শুধুই স্পর্শ করিবে না নিম্নের এই প্রতিষ্ঠানটিকে—পরন্তু তুরীয়ের ঐশ্বর্য্যে মানবপ্রতিষ্ঠান ঐশ্বর্য্যান্বিত হইবে।

এই অসাধারণ জীবনলাভের অন্তরায়—আসক্তি, অজ্ঞানতা; অনুকূল ভিতরের ইচ্ছাশক্তি, বাহিরকে ভেদ করিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া তুলিবে, অন্তরের প্রকাশ বাহিরে প্রতিভাত হইবে।

জীবনরথ ঊর্দ্ধপথে পরিচালিত হইলেও, আর এক বিঘ্ন আছে। নিম্নের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ আনিয়া দেয়, কেননা উহা আনন্দের সত্যরূপ নহে, আমরা চিরদিন নিম্নে পড়িয়া থাকিতে পারি না, প্রকৃতির কষাঘাতে উপরে উঠিতেই হইবে—উপরের আকর্ষণ কিন্তু মধুময় অনির্ব্বচনীয়, উহার শেষ নাই অবধি নাই। ঊর্দ্ধগতির উল্লাসে আনন্দে, অনেক সময় সাধক দেবজীবনের কথা ভুলিয়া যায়, জীবন ছাড়িয়া তুরীয় সত্তায় অস্তিত্ব লোপ করিয়া বসে—ইহাতে সেই সংসার ছাড়িয়া ব্রহ্মে আপনাকে হারা-ইয়া ফেলাই হয়। অনন্ত ব্রহ্মের অসীম তরঙ্গে, প্রতি ভঙ্গীর মধ্যেও যে বিপুল আনন্দ আছে, তাহা উপভোগ করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানবজীবনের সাফল্য।

তিনি হইয়াছেন—হওয়ার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য, মানুষেরই প্রাণ মন দেহ লইয়া; এই প্রতিষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হইলে দেবজন্ম সার্থক হইবে না, দেবজীবন আকাশকুসুম হইয়া থাকিবে।

কিন্তু ইহা হইবেই, কেননা ভগবানের উদ্দেশ্য আজ মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, সত্যকে খণ্ড করিয়া মানবমন আর জগতকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে না, মন আরও উন্নত হইলে দেবজন্মের কথা সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

কুরু-ক্ষেত্র

কেন রে প্রাণ আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে? পথ কি ভুলিয়াছি? আকাশের গভীর আঁধার আমার স্বচ্ছ মানসদর্পণে কি কালী ঢালিয়া দিয়াছে? দেবতা কি মলিন? সঙ্কেত উপেক্ষা করিয়াছি? ওগো গুরু! দেবতা! শিক্ষক! "শিষ্যস্তেঽহং" শ্রেয়ঃ আমায় নিশ্চয় করিয়া বল।

কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথির পাঞ্চজন্যশঙ্খ অনাহত। সে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন নাই, সে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব নাই, সে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চমূ নাই, সে রণসমুদ্যমে ভারতের বীরবৃন্দ আজ রণসজ্জায় সজ্জিত নহে—কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, ভারতের সে মহাযুদ্ধ আজিও সমানভাবে চলিতেছে, স্বধর্ম্ম আজিও ভয় হয় নাই, অর্জ্জুনের অবিচ্ছিন্ন আত্মা তরঙ্গে তরঙ্গে আজিও প্রবাহিত, আজিও অশ্রুপূর্ণ লোচনে, সারথি শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; হে কেশব! কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি।"

শুনিতেছি শাস্ত্র, জীবনদেবতার উৎসাহবাণী, কিন্তু রণকোলাহলে কর্ণ আমার বধির, শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া যাই, আবার পিছু ফিরিয়া তাকাই; কর্ণধার আছেন তো—তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে চলিয়াছি তো—কেন এ সংশয় কেন এ দ্বন্দ্ব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয় গলিয়া গেল, অহমিকা দূর হইল না!

চিত্রখানি আর একবার দেখিয়া লই। যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের সাধনা বিগ্রহান্বিত হইয়াছিল। উভয়দিকে বিপুল সেনা. হয় রথ গজ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া, মধ্যপথে শ্বেতাশ্বদ্বয়যুক্ত রথে বীরবেশে পার্থ আর রথের চালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ। মরি মরি, অন্তরের ছবি মর্ত্ত্যের বুকে এমন করিয়া বর্ণে বর্ণে কে আঁকিয়া তুলিল রে? জীব ও আত্মার অতুলনীয় রূপটী দেহীর আকারে এমন কোন্ দেশে কোন্ কালে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভারতের তপস্যা সে তো শুধু মানসকল্পনা নয়, ভাবঘন চিন্ময়রূপের গোধূলিছায়া নয়; এই লোকলোচনগোচর বিশ্বছবির মত স্পষ্ট জাগ্রত জীবন্ত, এই দিনমানের মত উজ্জ্বল ফুটন্ত—অধ্যাত্মসাধনার মৃণ্ময় মূর্ত্তি ভারতের বুকেই গড়িয়া উঠে, এমন নিখুঁত সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র আর কোথাও সম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণ নেতা, অর্জ্জুন কর্ম্মী, সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। স্বভাব ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের স্বভাব সত্য আকারে বিকশিত করিতে চাহেন, কেননা তিনি গুরু নরনারায়ণ। অর্জ্জুনের অহংকার স্বধর্ম্মের পরিপন্থী, অনন্তকে গণ্ডীবদ্ধ করায় উহা অবিশুদ্ধ নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে জীবরূপী অর্জ্জুনের মধ্যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাই সর্ব্বগত হইয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলিবে, ভারতের কুরুক্ষেত্রে এই মহাযজ্ঞের আদর্শ অভিনয়।

ঘটনা রূপক নহে। ভারতের তপস্যা এইখানেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনাহত বংশী আজও বাজিতেছে, অর্জ্জুনের মধ্যে সে বাঁশীর সুর জমিয়া জমিয়া নূতন দেহ মন গড়িয়া তুলিতেছে; ভগবান্ জীবের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে চাহেন, অসীমের সহিত সীমার এই যোগেই নবধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সে ধর্ম্মের আরম্ভ জগতের প্রচলিত সকল ধর্ম্মসাধনার ভিত্তির উপর, কিন্তু উহার পরিণতি কোন সাধনারই ফল নহে—ইহা স্বধর্ম্ম, ভাগবত লীলা। সেইজন্য মহাভারতের এই অংশ ধর্ম্মোপদেশ নহে, জগতের জীবন জয়যুক্ত হইবার পক্ষে দিব্য অস্ত্র, জীবনসংগ্রামের তীক্ষ্ণ আয়ুধ। ভারতের সভ্যতা, ভারতের আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম, যদি কখন সার্ব্বভৌম হয়, তাহা হইলে এই গীতার ভাণ্ডার হইতেই যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

য়ুরোপের যজ্ঞবেদীতে লক্ষ নরবলীর পর মানুষের একটী স্বভাবই ফুটিয়া উঠিল, উহা Liberation and unity—মুক্তি ও ঐক্য। কিন্তু কোন্ আধারে উহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে? যোগজীবন য়ুরোপের পক্ষে সম্ভব কি না? ভগবানের বাণী কোটী অর্জ্জুনের কর্ণগোচর হইলেও—অহমিকার যুক্তিবাদে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া অপরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ পাইবে। য়ুরোপের বহিঃসংগ্রাম শেষ হইয়াছে। জাতিবিশেষের ভিতর যে প্রলয়ানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, জাতিবৈশিষ্ট্য বজায় হইলেই উহাও নির্ব্বাপিত হইবে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের শেষ হইবে না—কেননা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আজিও শেষ হয় নাই, আজিও ধর্ম্মরাজ্য মর্ত্ত্যের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, আজও মানুষ ভাগবদানুগত হইতে পারে নাই।

যুদ্ধ দেশ সাম্রাজ্য সম্পদ সম্মান প্রভৃতির জন্য নহে, বাহির হইতে ঐরূপ দেখাইলেও, মূলে উহার কোন সত্যই নাই। ভারতের কুরুক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্য জয় হইয়াছিল তাহার চিহ্ন আজ কোথায়? রোম, গ্রীসের সভ্যতা কেমন করিয়া লোপ পাইল? জর্ম্মণীর পৃথিবীজয়ের আশা এমন

নিষ্ফল হইল কেন? মানুষ ভ্রান্ত, সেইজন্য বাহিরের কারণ ধরিয়া দ্বন্দ্ব করে এবং বাহিরের সামঞ্জস্যে শান্ত হয়; হিসাবনিকাশ প্রতিপদেই ভুল হইতেছে, প্রতিপদেই রাশিচিহ্নের পরিবর্ত্তন, মানুষের জীবনক্ষেত্র কাটাকুটিতে মলিন ও বিশ্রী হইয়া পড়িতেছে; নূতন জীবনের প্রেরণা দ্রুত অনুভূত হইবে, আধারে সংগ্রাম চলিবে, ধর্ম্মরাজ্যের স্বপ্ন সফল না হইলে কুরুক্ষেত্রের শেষ নাই।

এই ধর্ম্মরাজ্য বা দেবজীবনের প্রথম মন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়াছিল ভারতের কুরুক্ষেত্রে, খৃষ্ট মানসজগতে ইহার বনিয়াদ্ রচনায় তপস্যা করেন। সেণ্টপলের মধ্য দিয়া এই মন্ত্র পোপের অন্তরে অঙ্কুরিত হয়। যোগসিদ্ধ আধার না হওয়ায়, খৃষ্টের ধর্ম্মরাজ্য য়ুরোপে কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

য়ুরোপের বিকৃত সভ্যতা জগতের সভ্যতা বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, য়ুরোপ যাহা পাইয়াছে তাহা একেবারেই জড়বাদমূলক, কাজেই জড়ের উপর আঘাত দিয়াই উহারা জয়ের কামনা করে। "ক্রুশেড্" উহাদের ধর্ম্মপ্রচার। অন্ধ য়ুরোপ এসিয়াকে জোরজবরদস্তি করিয়াই সভ্যতার কিরণ বিতরণ প্রয়াসী, কিন্তু আদি সভ্যতার লীলাভূমি এসিয়া য়ুরোপের জড়ঐশ্বর্য্যে সম্মোহিত হইলেও মূলগত সত্যকে উহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না—প্যান—ইসলাম, পীতাতঙ্ক য়ুরোপের আদর্শপ্রচারে ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ভারতের শক্তি কোথায়? ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ভারতের বীরবৃন্দ একত্র হইয়া যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, নরশোণিতলিপ্ত ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যে জীবনসঙ্গীত উত্থিত হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মহামন্ত্র অর্জ্জুনের কর্ণরন্ধ্রে প্রদান করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্রশক্তি কি নির্জ্জীব নিষ্ফল হইয়া আছে?

না। বিপুল জড়স্তূপ হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করিয়া নূতন সভ্যতায় জগৎ ছাইয়া ফেলিবে এমন গর্ব্ব করিলেও উহা প্রাণহীন তপঃবলশূন্য। ভারত এই পাঁচ হাজার বৎসর পঙ্গুর মত যে নীরব হইয়াই ছিল, মনে করিও না। ঐশ্বর্য্যবল, অস্ত্রবল, পশুশক্তি যতই প্রবল হউক, অধ্যাত্ম শক্তির তুলনায় উহা নগণ্য, অমূলক। কুরুক্ষেত্রে একদিকে দুর্য্যোধনাদির সহিত ভারতের ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির মত যোদ্ধা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও, পবন সংঘাতে ছিন্ন পল্লবের মত উহা কোথায় উড়িয়া

গেল, উহাই যোগবল শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিশক্তি।

ভারতের সাধারণ জীবন অজ্ঞাতে কৃষ্ণঅভিসারে ছুটিয়াছিল, সাধারণ জীবনে সংগ্রামলক্ষণ পরিদৃষ্ট না হইলেও ভারতের অন্তরাত্মা চিরদিন খণ্ডধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ভগবান্ ব্যষ্টিরূপে যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার করিয়াছেন, এইবার ভারতের জাতিকে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইয়া পরধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, স্বধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জন হইলে স্বরাজ্য ও সাম্রাজ্য স্বতঃ প্রকাশ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি?

য়ুরোপের যুদ্ধ মানুষের দেহ লইয়া। সুতরাং বীভৎস এবং নিদারুণ। মেদ মজ্জা রুধির লইয়া নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলাই এখানে পরম আনন্দ। মানুষের জীবন সংহার উভয় পক্ষের চরম লক্ষ্য। এইরূপ যুদ্ধের অন্ত আসিয়াছে, ভারতবর্ষ এইবার জগতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধঘোষণা করিবে তাহা জগতের বাহিরটাকে বিদলিত করিয়া হাহাকার তুলিবার জন্য নহে, অন্তরের দেবতাটীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহারই গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিবার জন্য। এই মানসযুদ্ধে ভারতের অসংখ্য সেনা অভিযান করিয়াছে।

জয় করিতে হইবে মানুষের অন্তরকে। মাটীর খানা কাটিয়া কামান বন্দুক কাঁধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, মানুষকে হত্যা করিবার জন্য—আমরা মনের দুর্গে আত্মগোপন করিয়া মানুষের মনকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িব, মানবমনকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে। বাহিরের সংগ্রামে ছেদ আছে, বিশ্রাম আছে, আপোষ আছে, কিন্তু অধ্যাত্মযুদ্ধে বিরাম নাই, অবকাশ নাই, মিটমাট নাই; আত্মা দিয়া আত্মাকে জয় করা ইহার উদ্দেশ্য, অতএব আমাদের চাই যেমন অসাধারণ ধৈর্য্য, তেমনি অসামান্য সাহস আর অপরিসীম শক্তি।

বর্ত্তমান যুদ্ধের উপকরণ ভগবানের ভাণ্ডার হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। মর্ত্ত্য-মানুষের নিকট গীতাই তার সিংহদ্বার। ভগবানকে মানুষের বুকে নামাইয়া আনিতে হইলে কায়-মন-প্রাণে ভগবানের হাতেই আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ভগবান, জীব এবং তার ধর্ম্ম, এই তিনটিকে একের মধ্যে, এবং এককে তিনের আকারে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমিই আমার গুরুরূপে অভেদ, এবং আমার কর্ম্ম আমার স্বধর্ম্ম, ইহাতে যেমন কোন ভেদ থাকিবে না, দ্বন্দ্ব থাকিবে না, তদ্রূপ গুরুকে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণকে আমা হইতে পৃথকজ্ঞানে পূজা করিলেও তাঁর আদেশ ইঙ্গিত

আমার জীবনে অবাধে খেলিয়া যাইবে আমার অহং কোথাও তারে বাধা দিবে না। উপরের সহিত নীচের এইরূপ যোগসাধন হইলে জীবের মধ্যে যে লীলা খেলিবে—তাহাই দেবলীলা তাহাই স্বধর্ম্ম; প্রতি ব্যষ্টি এইরূপ ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইলে সমষ্টিআকারে যে কর্ম্ম সৃষ্টি হইবে, তাহাই ভাগবত কর্ম্ম। জগতে যত জাতি আছে, যত ধর্ম্ম আছে, যত আদর্শ আছে, সকলই সত্য ও সুন্দর, যদি মানুষের ভেদবুদ্ধিতে ঠেকা খাইয়া উহা বিকৃত করিয়া না তুলে। ভারতের সংগ্রাম—মানবজীবনে এই অমরভাব-প্রবাহের স্রোত বহিয়া আনা। মানুষ যেদিন ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ আপনাকে উপলব্ধি করিবে, সে মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু—ত্যাগী ভোগী সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—যাহাই হউক না ভাগবত লীলা প্রকাশের কেন্দ্র বৈ ত নয়, এই ভাগবত অনুভূতি প্রকাশ পাইলে—উহা ই হইবে তাহার স্বধর্ম্ম, চরম সভ্যতা চরম আদর্শ। এই সমন্বয়সাধনই ভারতের তপস্যা।

ভারত তপবিমুখ নহে। সব্যসাচী বাঙ্গালীর পশ্চাতে আজও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া জগতের কুরুক্ষেত্রে রথ হাঁকাইয়া ছুটিয়াছেন—বাঙ্গালীর জীবনে নারায়ণের লীলাপ্রকাশ দিন দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

চিকাগো ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সনাতন ধর্ম্মপ্রচার, সেও একটী অব্যর্থ শরসন্ধান, জগৎ সেদিন হইতেই বুঝিয়াছে ভারতবর্ষকে শিখাইবার কিছুই নাই—ভারতই সমগ্র বিশ্বের ধর্ম্মপুরোহিত হইবে। তারপর অবনীন্দ্র নাথের ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষসাধন, রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রকাশ, জগদীশ চন্দ্রের মনীষা জগতের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিয়াছে। ভারত বুঝি এইবার সনাতন আদর্শের হিরণ্ময় মুকুট মাথায় পরিয়া জগত জয়ে বাহির হইবে—বাংলার রাষ্ট্রসাধনার মধ্যেও নূতন শক্তি দেখা দিয়াছে—বাঙ্গালী চলিয়াছে দলে দলে কাতারে কাতারে বিশ্বের আরাধ্য সামগ্রীটিকে বিলাইয়া দিবার জন্য। পাশ্চাত্যের দিবার পদ্ধতি অপরকে হৃতসর্ব্বস্ব করা—কেননা দিতে আসিয়া সে আপনার দৈন্য অনুভব করে, নিজের ঝুলি পূর্ণ করিয়া লয়; ভারতের জীবন ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, অকাতরে অঞ্জলি পুরিয়া দান করিলেও ইহা ফুরাইয়া যায় না। ভারতের অভিযান জয়যুক্ত হইবে, অর্গল মুক্ত করিয়া ভগবানের অসীম দান মাথা পাতিয়া লও, আপনাকে ভাগবতময় করিয়া তোল, ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক; আমার ক্রন্দন তাঁহাকে ভুলিয়া যাই বলিয়া তিনি আমার হৃদয়ে বিরাজ করুণ, আমার জীবনকুরুক্ষেত্রে তাঁহার ইঙ্গিতেই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

কর্ম্মবেদ

বাংলায় ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ লোকের বাস। উহার এক আনা লোক সহরে বাস করে, বাকী পনের আনা লোকের বাস পল্লীগ্রামে। সহরের সংখ্যা ১২৫টী, গ্রাম আছে ১২৫০০০টী। তবেই দেখা যাইতেছে, বাংলার জীবন পল্লীকোলেই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হয়।

অথচ আমাদের সকল কর্ম্মই সহরের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ লোকের মধ্যে যখন প্রায় ৪৷৷০ কোটী লোক গ্রামবাসী, তখন বাংলার প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে, বাংলার পল্লীজীবনের উন্নতিবিধান করিতে হইবে। এই সাড়ে চার কোটী লোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষার উপযোগী আহার ঔষধ পথ্য প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করা বড় সহজ কাজ নয়।

আমরা দেশের জন্য যাহা করি, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র জিলা-টাউনগুলিতে। এক একটী জিলা-টাউনের অধীনে যে সকল গ্রাম আছে, তথাকার শিক্ষিত সম্পদশালী লোক সকলেই প্রায় এই টাউনে আসিয়া সমবেত হন। সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই সকল টাউনে যে আন্দোলন আলোচনা চলিতে থাকে, তাহার অতি অল্প অংশই গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামের লোক অধিকাংশই কৃষক, শ্রমজীবী, এবং দরিদ্র, অথচ ইহারাই বাংলার প্রাণশক্তি। এই সকল সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন নূতন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে, গ্রামে গ্রামে কার্য্য করিবার জন্য অসংখ্য চারণের প্রয়োজন হইয়াছে।

সহরের মধ্যে দেশসেবার প্রবল প্রবৃত্তি অনেক যুবকের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। সভাসমিতি করিয়া, নেতৃবৃন্দের উপদেশ মত চাঁদা সংগ্রহে, সেবা, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, সহরের দেশসেবক আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মরণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইবে, দারিদ্র্যের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া জাতির ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে হইবে, সে কাজে বড় কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। সহরে থাকিয়া জীবনযাপন করা অধিকতর আরামপ্রদ, পল্লী-

জীবন গ্রহণ করিয়া দেশের শ্রমজীবী কৃষকদিগের সহিত একত্র অবস্থান করা কঠোর সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু দেশকে মানুষ করিতে হইলে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

বাংলার গ্রামগুলি দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। দারিদ্র্য, মহামারি, কুসংস্কার, সকলবিধ অজ্ঞানতা, এই সকল স্থানেই জমা হইয়া উঠিতেছে; এক্ষণে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে, খুব স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দভাবেই গ্রামগুলির মধ্যে আপনাদিগকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। কোথাও হলচালনার সুবিধা থাকিলে, সেই কার্য্যেই প্রথমতঃ আপনাকে নিয়োজিত করিয়া কৃষকদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ধীরে ধীরে জীবনের সত্য তত্ত্ব উহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে; যেখানে বিদ্যালয়স্থাপনের সুযোগ আছে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলেও, কৃষক বালকগণকে বাংলাভাষা শিক্ষার সঙ্গে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আত্মোপলব্ধির সরল প্রণালী, খুব অল্পদিনের মধ্যেই শিখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করা অসম্ভব হইবে না।

কাজ তো অনেক পড়িয়া আছে, কিন্তু করে কে? আমরা কেবল বড় বড় Institution গড়িতেই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছি—অথচ নাম রূপের কোন রেখা না কাটিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে, সহকর্ম্মীদের মধ্যে অন্তরগত মিলন অটুট রাখিয়া, দেশের শিক্ষার ভার আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। চাই, অসাধারণ ত্যাগ এবং নামযশে উদাসীন হওয়া। স্বামীজি বলিয়াছিলেন —Ninety-nine per cent of Sadhus after renouncing lust, wealth, get bound at last in the desires for name and fame. অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জন সাধু সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াও অবশেষে নাম যশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—নবজাতি গঠনের বনিয়াদের ইট্ আমরা, আমাদের মাটীর তলে ঢাকা পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু আমাদের উপরেই ভর করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ বিরাট সৌধ গগন চুম্বন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

জাপান হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চাশজন ছাত্র বিদেশে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়; আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট কেন কোন প্রতিবিধান করিবেন না, এই লইয়া অনর্থক তর্কাতর্কির সময় আর নাই।

আমার দিক হইতে সকল দিক পূরণ হইয়া না উঠিলে, চিরদিন যে আমাদের আন্দোলন আবেদন করিয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাহা করিতে হইবে তাহার তুলনায় আমাদের শক্তি অপ্রচুর বটে, কিন্তু তাই বলিয়া করিতেছি কি? কার্য্য করিতে করিতেই বিপুল শক্তি অর্জ্জন করা অসম্ভব হইবে না—আমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে।

যাঁহারা কার্য্য করিবেন—তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, কেননা শক্তি আমাদের প্রবল নহে; এরূপ অবস্থায় বৃহৎ কর্ম্মের জন্য কৌশল চাই। সংহতিশক্তিই সকল কৌশলের মূলমন্ত্র। কিন্তু এই ঐক্য কর্ম্মের ছকাছকির উপর নির্ভর করিবে না, কেননা কর্ম্মের ধারা অসংখ্য—কাজেই কর্ম্মীকে কর্ম্মনির্ব্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে, যাহা সৃষ্টি হইয়া উঠিবে, তাহা অনেক কিছুকে ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ আকারেই প্রকাশ পাইবে—বৃহৎ কর্ম্মের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি বা লিপিবদ্ধ শৃঙ্খলার অনুগত হওয়া একেবারেই মারাত্মক।

সকলেই কিছু এক কর্ম্ম করিবেন না, কিন্তু অন্তরের যোগ থাকায়, সমষ্টির তপস্যা পরস্পরের কর্ম্মে সহায়তা করিবে। একেবারেই অসংখ্য কর্ম্মীর প্রয়োজন নাই, নূন্যাধিক সহস্র দেশসেবক জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ করিলে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে, কালের অন্ধকারে যে চিন্ময়ী দশভূজা আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাঁহাকে মূর্ত্ত করিয়া জাতির কর্ম্ম-মন্দিরে রাজরাজ্যেশ্বরী জগদ্ধাত্রীবেশে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তখন আবার বাংলায় নূতন করিয়া শারদ-উৎসবের মহাধুম পড়িয়া যাইবে, বাঙ্গালীর জীবনে নূতন উৎসাহ, নূতন আশা নূতন প্রেরণা অজস্রধারে প্রবাহিত হইবে—শক্তির বরপুত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে নূতন বেদ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে।

আজই আমাদের যে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে তাহার জন্য চাই সিদ্ধ আধার, সিদ্ধ প্রণালী, সিদ্ধ সম্পদ্। দেশের জাগরণ যদি পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অমর প্রেরণা জীবন ভরিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের সবখানি ভাগবত ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, আধার ভাগবত কর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠিবে। ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন

আদর্শ থাকিবে না, উদ্দেশ্য থাকিবে না; ইহাদের সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, সকলই ভিতর হইতে নূতন করিয়া উদ্ভূত হইবে, জাতি, সংস্কার, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, কিছুই রাখিলে চলিবে না—একেবারেই "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এই সকল সিদ্ধ আধারে যে কর্ম্ম সৃষ্ট হইবে এবং যে প্রণালীতে ইহারা গমন করিবেন তাহাই ভাগবত পথ। কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রণালী ছকিয়া লইলে কল্পনার ছায়ায় উহা সঠিক হইবে না। ভগবানে জীবন উৎসর্গ সত্য হউক আর নাই হউক, মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ভাগবত শক্তির সহিত আপনাকে যুক্ত করাই উৎসর্গ-মন্ত্রের লক্ষ্য। উৎসর্গীকৃত আধারে ভগবানের প্রেরণা ভাগবত শক্তির দ্বারাই অবিকৃত আকারে প্রকাশ পায়, অন্যথা কর্ম্মের মূলে ঐশীশক্তি থাকিলেও, উহা মানুষের অহমিকার ধাক্কা খাইতে খাইতে বাঁকিয়া চুরিয়া শিবের মূর্ত্তি বাঁদর আকারে গড়িয়া উঠে—ইহাই ব্যর্থতা, অসিদ্ধি।

ভগবান্ যে কর্ম্ম করিবেন তাহার সামর্থ্য তাহার উপকরণ অনুষ্ঠান সাধকের মধ্যেই উপচিত হয়—ইহাই সিদ্ধ-সম্পদ্। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চাওয়া ধারকরা, জোড়াতাড়া দিয়া কোন গতিকে কিছু গড়িয়া তোলা কর্ম্মসাফল্যের পরিচয় নহে।

যাঁহারা ভগবান্‌কে অন্তরে পাইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা একত্র হউন। স্ব স্ব জীবনে যে আনন্দ, উৎসাহ, শক্তি, সম্পদ্ নিত্য প্রকাশ পাইতেছে তাহার সমবায়ে নূতন জাতির কর্ম্মক্ষেত্র রচিত হউক। শক্তি ও সম্পদের পরিমাপ অনুসারেই কর্ম্মের বেগ নিয়ন্ত্রিত হইবে। কতখানি করিব, কতটুকু আগাইয়া যাইব ইত্যাদি শূন্যগর্ভ আন্দোলনে চিত্ত দোলাচল হইবে না, আপনার সামর্থ্যের কৈফিয়ৎ অন্তরের খাতায় নিত্য দেখিতে পাইবে—ভগবান্ তোমায় তাঁর কর্ম্মসাধনের জন্য কতখানি উপযোগী করিয়া তুলিতেছেন তাহার হিসাব নিজের চক্ষে দেখিয়াই তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে—উৎসর্গমন্ত্রের সাধক সেইজন্য ধীর অপ্রমত্তচিত্ত অথচ তার কর্ম্ম অব্যর্থ, পদক্ষেপ অভ্রান্ত।

আমরা অন্তরের দিকটা একেবারেই দেখি না। ভাগবত ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে কোন কৃচ্ছ্রতা নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ; উহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, Rule of three কষিয়া মাথা ঘামাইতে হয় না, নদীপ্রবাহের

মত মানুষের জীবন বহিয়া উহা আপনি প্রকাশ পায়, প্রণালী আপনার বেগেই আপনি রচিয়া লয়, মানুষ কেবল চিত্রপট মাত্র, সকল আয়োজনই ভগবান্ করিয়া লন।

মানুষের কার্য্য, কসরত—কেবল ডিগ্‌বাজী খাওয়া—রঙ্গরহস্যের মত চমকপ্রদ এবং নয়নপ্রীতিকর। বুদ্ধির আঁচরে যে ছবি আঁকিয়া তোলা হয়, উহার সকল উপকরণই পরের নিকট হইতে ধারকরা এবং একেবারেই সামঞ্জস্যশূন্য, কোথায় কি রঙ লাগাইতে হইবে, তাহারও একটা হিসাব জ্ঞান নাই, যেন মোটা তুলি দিয়া আময়দা রঙের শ্রাদ্ধ।

যাহা করিতে হইবে তাহাও হইবে নিজস্ব সামগ্রী—যাহা দিয়া উহা সুসিদ্ধ হইবে তাহাও পরের নিকট হইতে চাহিয়া আনিব না, এইরূপ একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব কর্ম্মীর অন্তরে না থাকিলে, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান অটুট হইবে না এবং জাতির জীবনও শক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না।

একটা উদাহরণ দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। দেশের অভাব অভিযোগ যথেষ্টই আছে, তাহার যে কোন একটি অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ভিতর হইতে উহা করিবার আদেশ পাওয়া যাইতেছে কি না, যদি প্রেরণা সত্য হয়, আপনাকে বিস্তৃত করিয়াই উহা সার্থক করিয়া তুলিব। তদ্বিপরীতে আদর্শ স্থির হইলে, আপনাকে উহার জন্য পূর্ণ উপযোগী করিয়া তোলার যে সাধনা তাহা উপেক্ষা করিয়া ঐ কার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহে বাহিরে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিব, এবং টানাটানির ফলে পরস্পর বিরোধী উপকরণ-সমূহ একত্র করিয়া হয়ত শীঘ্র শীঘ্র কিছু করিয়া তুলিলাম, পরিণামে উহা টিকিল না; তাহার কারণই হইতেছে, যে মালমসলা সহযোগে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে তাহার ভাবটি প্রতি মালমসলার ভিতর সুপ্ত থাকে। কালক্রমে স্বার্থপর লোকের অর্থে যে পরার্থ সেবার সৌধ নির্ম্মাণ হয়, সে অর্থ ভিন্ন উদ্দেশ্যে উপার্জ্জিত হওয়ায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভিৎ উপাড়িয়া আপনার স্বধর্ম্ম প্রকাশ করে। দেশে এই যে অসংখ্য সদনুষ্ঠান অঙ্কুরে শুখাইয়া যায়, ইহার কারণই হইতেছে—সিদ্ধ আধার সিদ্ধ প্রণালীতে সিদ্ধ অর্থে উহা গড়িয়া উঠে না।

নবীন যুগের সাধক আপনার শুদ্ধি দিয়া যে কর্ম্ম সৃষ্টি করিবেন তাহার গতি মন্থর হইলেও তাহার বনিয়াদ হইবে শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী, কেননা

এক্ষেত্রে কর্ম্ম করাই তো জীবনের সার্থকতা নয়, ভিতরের সত্যরূপটীকে অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিয়া তোলাই তপস্যা। এই তপঃপ্রকাশই সনাতন সৃষ্টি। ভবিষ্যৎ ভারতে যে বিপুল রচনা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, উহা ভগবানেরই মূর্ত্তরূপ—ভারত ভগবানের লীলাভূমি।

আজ বাংলায় যে বিপুল কর্ম্মপ্রেরণা দেখা দিয়াছে এবং যে সকল কর্ম্মী কিছু করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন করিবার তো যথেষ্টই আছে কিন্তু করিবে কে? তপঃসিদ্ধ সাধকের দল কোথায়? য়ুরোপের বিজ্ঞান অনেক রচনা করিতেছে, তোমরাও কি ভারতকে একটি য়ুরোপে পরিণত করিতে চাও? অনেকেই বলিবেন, আমাদের হেঁয়ালী বোধগম্য নহে কিন্তু যদি নূতন সৃষ্টি চিরস্থায়ী করিতে চাও তাহা হইলে আপনার ভিতর হইতেই যাহা জাগিয়া উঠে আপনার সামর্থ্য দিয়াই তাহা প্রকাশ কর।

এইরূপ অসংখ্য প্রকাশের সমবায়ে বাংলার বুকে যে দিব্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই ভারতের নূতন মন্দির নূতন আদর্শ—এই মন্দিরশীর্ষে যে সত্যতার নিশান উড়িবে, মানবজাতির ধ্বজা বলিয়া সারাবিশ্ব তাহা স্বীকার করিয়া লইবে।

ভ্রম সংশোধন

২০৫ পৃষ্ঠায় ৪ লাইনে 'অবিশুদ্ধ নহে' স্থলে 'বিশুদ্ধ নহে।'

মিঃ চ্যাটার্জ্জির পত্র

গত সংখ্যায় "প্রবর্ত্তকে" অন্তরীণ-প্রসঙ্গ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি আমাদিগকে যে পত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত করিলাম—

I read your article to-day in Prabartak about what the Indian Association has been doing for the released detenues. I am afraid you have been wrongly informed about what Government have done. I have sought no Govt. help or patronage in organising this movement. I wanted to help these boys because I love them like my own brothers. I knew, however, it would be impossible to do anything for most of these men unless they came to Calcutta and were personally interviewed by me regarding their qualifications &c. And it was no use asking them to come to Calcutta unless we could arrange to put them up and feed them at some fixed residence. It meant getting together a lot of money to start with, and I found it impossible to persuade my countrymen to pay so much money. I therefore approached the Y. M. C. A. authorities (not Govt.) with the proposal that they should provide a residential hostel for these men, and thanks to the wide outlook of the President, Secretary and Treasurer of Y. M. C. A., my idea was accepted. But the Y. M. C. A. money is not Govt. money. After boys began coming in, I took up the task of getting them employment in various avenues, and you will find the full report of the work in a letter published in the Bengalee and the Indian Daily News to-day. You will see from the report, that of the 100

boys helped hitherto, Govt. have paid the training expenses of the motor-men only, all the rest of them having been helped by Indians and the Indion Association. Not that I should mind Govt. subscribing to our fund, but they have not yet, nor do I wish to depend thereon. The Jana Sabha have repeatedly asked Govt. for money, but with no effect, and the amount paid for the motor-men has been at the instance of the Y. M. C. A. authorities. I have not asked Govt. for any monetary contribution yet, because I have felt that I should not ask them for any help until I can show that my countrymen can substantially help these boys without their aid. The account I have published to-day gives us a little claim now, I think, to say that we have been able to do something on our own strength and initiative.

But an enormous amount of work is yet before us, and I am thinking of now asking Govt. to make a contribution to our fund to facilitate the further task to which we must now address ourselves of launching constructive schemes of work on the country with the labour and co-operation of ex-detenues. My idea is that the best of these men will do well to pioneer the movement for scientific agriculture in this country, as this is one of the types of industry that may yet save this country economically and morally. But much money would be wanted for this, and I have been contemplating an appeal to the public and Govt. for help. But up till now we have done all the work on our own.

As regards the hostel, Y. M. C. A. people started with the idea that they would have to pay up to 1000 a month, but expenses now amount to nearly 2000 monthly, and the I. A. and the Y. M. C. A. are now jointly appealing to the country for funds for this special purpose. But this is separate from the appeal that I contemplate.

29-4-20.



মীরা রিশার।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

প্রতিজ্ঞা

প্রবর্ত্তক নারীকে অস্বীকার করিতেছে না,—অস্বীকার করিতেছে অস্বাভাবিকের পথে ধাবিত এই সংসারকে। যদি নারী এই বাণ্ডরায় আকর্ষণী না হইয়া মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ক্ষমতাবতী হইত—নূতনের সন্ন্যাসীর বামে সন্ন্যাসিনীসাজে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত, সে উপেক্ষিত হইত না বরং আদৃতা হইত শক্তিরূপে। কে জননী ভগিনী মমতাময়ী আছ—সন্তানকে ভাইকে ঘরের মধ্যে রাখিতে চাও না? বধূ ঘরণী না হইয়া সহকর্ম্মিণী—একপথে একমতে এক ধর্ম্মচারিণী, অনন্তের নিবিড়ের আহ্বান প্রাণ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে দেখিতে কুণ্ঠিত নহ? কে আছ নূতনের সঙ্গে নারীজীবনকে নবতন্ত্রে এক করিয়া গাঁথিতে প্রস্তুত? জাতীয় চরিত্র না বুঝিয়া নূতন আপন পথে বাহির হয় নাই। সে জাতীয় স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ়—সবখানিই চিনিয়া লইয়াছে। ধাপ্পাবাজি তাহার কাছে চলিবে না। সে জানে করুণার সম্মোহনে একবার নত হইলে তাহাকে চিরদিনের মত নত হইতে হইবে। এখানে বিনয় মাথা হেলান নহে, মুখ থুবড়িয়া পড়া।

আর্ত্তস্বরে কন্যাদায়ীর অনুরোধ যদি তাহার কর্ণপটাহে ধ্বনিত হয় সে অসাড়তার পৃষ্ঠে উপযুক্ত কষা বর্ষিত হইতেছে বুঝিয়া, আশায় আনন্দেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। সে বিধাতার ব্যঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দ্বিগুণ ব্যঙ্গভাষে খণ্ড বিখণ্ড করিতে চাহিবে তাহার অন্তরের স্বার্থ ক্ষুদ্রতা সংস্কার! সে জানে অসুরস্বভাব কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাহার দেবস্বভাবকে ভাবোদ্রেকে বিচলিত করিতে চাহিতেছে মাত্র—আত্মসমর্পণ করিতে আসে নাই। অর্থচায় নিরাশাশুষ্ক ক্ষুণ্ণমুখ তাহার প্রাণে নিথর গম্ভীর নিস্তব্ধতাই আনিবে! সে যে আপনিই দুঃখভোগ করিতেছে। জ্বলিয়া জ্বলিয়া দহিয়া দহিয়া মানুষ হইতেছে। দুঃখ কত মমতাময়ী সে ত জানে। তাহাকে দুঃখের মুখে দেখিয়া বিচলিত হইবে কেন? বুঝিবে ইহাদেরও জন্য ভগবান্ মনুষ্যত্ব-

সম্পদ্ সৃষ্টি করিতেছেন।—এবার ইহারাও জাগিবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃখই যে চাই। আমরা ত সুখের উৎপাদন উপভোগ-ক্ষম আধার নই! অঙ্গনের সুখবাঞ্ছা—সে ত বিষ্ঠা, সে ত নরকের দ্বার। অধিকার বিবেচনা করিয়া সুখ নিব আর দিব। দেবজাতি নরকের পাপ-পঙ্কিল কালীমা ধৌত করিতে জগতে আসিয়াছে—তাহাদের নিমজ্জিত করে সাধ্য কার?

আজ প্রবর্ত্তকের অনুপ্রেরণায় সহস্র নয়, জাতির ভগবানের অনুপ্রেরণা-বোধে লক্ষ লক্ষ যুবক ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা লইয়া সমস্বরে উচ্চারণ করুক দেখি "বিবাহ করিব না। তোমাদের ঘর তোমাদের সংসার তোমাদের জীবনযাত্রা আমাদের নয়, আমরা অমৃতের সন্তান, অনন্ত আমাদের ঘর—আমরা নূতন দেবস্বভাব উদ্বুদ্ধ করিতেছি, সে চরিত্র তোমাদের স্পর্শ লাগিলে মলিন হইবে, আমরা ভিন্ন রহিব। তোমাদের সহিত এক হইব না।" দেখিবে গতানুগতিকের দুর্জ্জয় দম্ভ দিশেহারা হইয়া থর থর কাঁপিতে থাকিবে। দেখিবে জাতীয় স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তনের সাড়ায় মুখরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে অবশ নিশ্চেষ্ট পাষাণ শোণিতস্রাবে গলিতে থাকিবে!

জগদ্বিকাশের আদিরূপা নারী গতানুগতিকের সহায় হইয়া নির্ম্মাণের পথ বরং রোধ করিয়াই রাখিয়াছে, তাহারই ভারে অবসন্ন জাতি অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এ ভার যতদিন না সরিবে ততদিন ত তাহাদের লইয়া সমাজের সহিত আমাদের কোনও সন্ধিই হইতে পারে না। আপনার দেবদুর্লভ চরিত্র বিকাশোদ্দেশ্যেই তাঁহাদের মাতৃত্ব ভগিনীত্ব স্বীকার করিব। স্নেহের কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে আপন আপন মহামূল্য সুস্পষ্টরূপে বরং ফুটাইয়া তুলিয়াই চলিব,—কেন? তাহার উদ্দেশ্য আছে।

আমরা বীর সাধক। কাজ আমাদের বীরভাবে। ক্রন্দনে কাহাকেও জাগাইব না। জাগাইব গতির বেগে। জাগাইব আপন আপন অসীম চাঞ্চল্যে। জাগাইব প্রাণের উন্মাদনার আদর্শপ্রকাশে। জানিনা কোন্ সম্পর্কে নারীর সহিত নর একসূত্রে জগৎ-মালিকার পরস্পর সন্নিহিত হইয়া গ্রথিত? জানি না নারীর সহিত নরের মুখ্য সম্পর্ক কি? জানি না কোন্ সম্পর্ক ছিন্ন হইলে মাতৃত্ব ভগিনীত্ব সকল সম্পর্কের মূলাধার নারীর নারীত্বে গিয়া বাজিবে? সর্ব্বত্র প্রকৃতি বাঁধিয়া দেন—কেবলমাত্র ঐ বাঁধনই ত ইচ্ছার বাঁধন। যেখানে ইচ্ছা চলে সেখানেই সমগ্র ইচ্ছাকে এককেন্দ্রে

সন্নিবেশিত রশ্মির মত আমার সঙ্কল্পসাধনে নিযুক্ত করিব, এ যে অধিকার তা দেখি দাবানল জ্বলে কি না।

অথচ কত নিরুপদ্রবে কত গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্য তিতিক্ষার মধ্য আমাদের সমগ্র উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে! এখানে কাহারও সহিত বিরোধ নাই কাহারও সহিত যুদ্ধ নাই। করিতে হইবে কেবল বিরাট হইতে বিরাটতররূপে আপনাকে প্রকাশ।

জগতকে গতানুগতিকের বন্ধনজাল হইতে মুক্ত করিতে মিথ্যার এই বিরাট পরিবেষ্টন উন্মোচন করিতে নূতন অবতীর্ণ, সে মিথ্যা হইতে চিরদিনই দূরে থাকিবে। জ্ঞানালোক যেখানে হৃদয়ের প্রত্যেক কোণটী পর্য্যন্ত হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া কোনটার প্রকৃত মূল্য কি নির্ণয় করিতে থাকিবে—চাওয়া ও পাওয়ার পরিমাণ সর্ব্বত্রই মানদণ্ডের তৌলে নিরূপিত করিতে থাকিবে—শক্তি শৃঙ্খলার বাহিরে সীমার বাহিরে তিলার্দ্ধও পদার্পণ করিতে দিবে না—প্রেমনির্ম্মাণের তূর্য্যধ্বনিতে হিংসা স্বার্থের বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় দিবস নিশি প্রস্তুত রাখিবে—মানুষ কখনই ভুলিবে না যে দেহে মনে প্রাণে আপনি নির্ম্মিত হইয়া উঠিয়া সকলকে নির্ম্মাণ করিয়া তোলাই মানবজীবনের লক্ষ্য, জন্মগ্রহণের সার্থকতা। সেখানেই বুঝিতে হইবে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ সন্ন্যাসী, আত্মস্থ হইয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ; দেখ সত্যলোকে তুমি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছ কি না? এখানে অচল প্রতিষ্ঠা না পাইলে ব্রতগ্রহণ ব্যর্থ।

কোনও উত্তেজনা বা আবেগ হৃদয়োচ্ছ্বাস নূতনের সমরসজ্জা নহে। সেই দেবসেনা যে সত্যই গতানুগতিক হইতে বিভিন্ন জাতি। ভাষার স্বপ্নকুহক ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া কেহ মোড় ফিরাইয়া দেয় নাই, আপনা হইতেই বিপরীত সে, যেন বিরুদ্ধ মত হৃদয়ে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যতদিন না মিথ্যা মরিবে, মিথ্যা যেদিক দিয়া বাঁচিতে চায় ও বাঁচিয়া প্রভুত্ব করিতেছে, সেদিক হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে তাহার বিপরীত দিকে অখণ্ডরূপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে। এই পরিপূর্ণ হইয়া উঠার আকাঙ্খার বীজ আপনা হইতেই যাহার নাই সে সমরে অবতীর্ণ হইতে পারে কিন্তু জয়টীকা ললাটে আঁকিয়া সেখানে যাওয়া তাহার বিড়ম্বনা। সে হারিতে যাইতেছে কি জিতিতে যাইতেছে সে ত অগ্রেই নিরূপিত নহে, সে যে কি হইয়া উঠে দেখিবার।

বাহিরে আমাদের কাজ যথেষ্ট আছে জানি—সেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত চিরঅক্ষম অনাটনগ্রস্ত মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেবতার দিব্যবিকাশ কমলার উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখাইতে হইবে! থরে থরে শয্যসম্ভার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিকশিত করিয়া বাঙ্গালামায়ের হারাণ স্নেহখানি ফিরাইয়া আনিয়া মায়ে পোয়ে কোন্দলের ফলে এই পরস্পর ঔদাসীন্যকে দূর করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যেখানে আমাদের কাজ বিপুল বিস্ময় আরো চমক লাগাইবে সে এই অন্তররাজ্য! এখানে আমরা মহাবিপ্লব আনিব। আর তাহার জন্য যতকিছু উপায় প্রয়োগ সমস্তই অন্তরে অন্তরে। বাহিরের চেষ্টা আর বিপ্লব আনিবার চেষ্টা নহে—সম্পদ্ বিকশিত করিয়া তুলিবার। যত বিপ্লব প্রচেষ্টা সমস্তই আমাদের অন্তর অবলম্বন করিয়াছে। এখানে আমরা ভাঙ্গিব। যে রাজার সাম্রাজ্য, সে প্রথম চার্লসের চেয়ে শতগুণ অত্যাচারী। সে যে শুধু আমাদের দাস করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে, আমাদের দাস করিয়া ভাড়া খাটাইতেছে। তাহারই নিয়োগে আমরা পাঠানের মোগলের দাস হইয়াছিলাম—আজ ইংরাজের দাস হইয়াছি। আপনার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া বিধাতার রুদ্ররোষে ইংরাজের যদি পতন হয় আমাদের দাসত্বের অবসান হইবে না সেই সঙ্গে, যদি সে সাম্রাজ্যের তৎপূর্ব্বে পতন হইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকে। হৃদয়াসনে অটল প্রতিষ্ঠিত এই অত্যাচারী সম্রাট আমাদের কোথাও না কোথাও ভাড়া খাটাইবেই। সে আবার অপর কোনও আগন্তুকের দাস করিয়া দিবে।

এই মহা অত্যাচারীর বুরোক্রেসী আমাদের অন্তরে। ইহারই শাসনে ভিতরে আমরা বিচ্ছিন্ন, বাহিরে আমরা দুর্ব্বল। প্রচণ্ড বিপ্লবে অন্তর্যুদ্ধের প্রভঞ্জন বহাইয়া ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমরা মনোরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এই অন্তর্যুদ্ধে বলি দিতে হইবে বাসনা। সহ্য করিতে হইবে দুঃখ। সে সেই দুঃখ বাসনা মরিবার সময় মরণ-চিৎকার তুলিয়া যাহাকে প্রাণের মধ্যে জাগায়।

গতানুগতিকের সমাজ বিন্যাস এই বাসনারই সম্ভোগপদ্ধতি। অবস্থার পর অবস্থার মধ্য দিয়া সমস্ত জীবনে সমাজ প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ মানব এই বাসনারই সেবা করিয়া থাকে। বাসনা ক্ষয় করিবার চেষ্টা ইহার মধ্যে জড়ের মত অচেতন ভোগে নিমজ্জিত থাকিয়া বাসনাক্ষয় অসম্ভব। জড় অচলায়তনে চৈতন্যের কোনও বিকাশচেষ্টাই কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয় না।

সহসা স্বর্গরাজ্য হইতে চৈতন্যের অমর সত্তায় উদ্বোধিত হইয়া দেবজাতি পৃথিবীতে আসিতেছে। তাহারা আপনাদের আগমনে বিধাতার যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিবে? সে জাতি আপনার message দিয়া যাইবেই।

এই দেবচরিত্র লাভের যাহারা সাধনা করিতেছ, যাহারা আত্মার অলৌকিক ক্ষুধায় সংসারের কোথাওই তৃপ্ত হইতে পারিতেছ না, ভাবিতেছ এ জন্মে স্বরূপ বুঝি প্রতিফলিত হইল না। সকলে শোন, তোমরা গতানুগতিকের মানুষ নও। আস নাই দাসত্ব করিতে। জাতিকে জাগাইবার জন্যই আসিয়াছ। এস এস ছুটিয়া এস, প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া তোমাদেরই জন্যই অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস, তোমায় চিনাইয়া দেই তোমার আত্মস্বরূপ। এস বন্ধু, কে তুমি আমার প্রাণের আলোকপাতে তাহা দেখিয়া চিনিয়া যাও। এস, নন্দনের সঞ্জীবনী অমিয়া হৃদয়পাত্রে ঢালিয়া দু'জনে নিঃশেষে পান করি। প্রবাসে স্বর্গের গৃহসুখের কথা আবার মনে পড়িবে! চকিতে বুঝিবে কোন্ ভুলে জগৎ ভুলিয়া আছে।

তুমি নারী! আপনি বিশ্বের নাথ আপন মাধুরী তোমার মধ্যে পান করিবেন বলিয়াই ঐ দেহপাত্রখানি অমন স্থির চপলদ্যুতিতে ছানিয়া দিয়াছেন। তুমি আজ সে মহোৎসবের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ আমাকে মজাইতে, মোহে অহঙ্কারে বিস্মৃতিতে তোমার চারিদিকে অস্বাভাবিকের সংসার রচনা করিব বলিয়া। তোমার ভুল আমার উপেক্ষাতেই তোমার মধ্যে শুকাইয়া যাক্। এই সূক্ষ্ম রূঢ়তাই আমি তোমার উপর প্রয়োগ করিলাম। যাও মোহিনীমোহের অবগুণ্ঠন সরাইয়া আত্মমুকুরে আপনাকে চিনিতে প্রয়াস পাও গে! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তোমার স্বামীকামনায় নমস্কার, সতীত্বে নমস্কার, নারীধর্ম্মে নমস্কার,—বিদায়।

দক্ষিনে বাতাস

ধর্ম্মের উপরেই ভারতের নূতন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। যোগই ধর্ম্ম-লাভের প্রকৃষ্ট প্রণালী। যোগসিদ্ধ ব্যষ্টিশক্তি আপনাকে গুণান্বিত করিয়াই আত্মপরিধি বিস্তৃত করিবেন, তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমষ্টিবোধের মধ্যে হারাইয়া ফেলিবেন না; বহুযন্ত্রের সুরসহযোগে যেমন ঐক্যতানের উৎপত্তি, তদ্রূপ বহুব্যষ্টির ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিবে, উহাই হইবে আত্মার ঐক্যমূর্ত্তি দেবসমাজ।

* * *

আত্মাকে না জানিলে না পাইলে যে নূতন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছি উহা সফল হইবে না। আত্মাকে ধারণ করিয়াই মানবজীবন। জীবনের আড়ম্বরে অন্তরের সত্যবস্তুটী প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জ্ঞানবিকাশে আত্ম-জ্ঞান হইবে—ইহার জন্য চাই শিক্ষা। সে শিক্ষা যোগ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যোগের পথে অগ্রসর হইলেই যে সমৃদ্ধি ও সম্পদ্ উদ্ভূত হইবে, উহারই বাহ্য রূপ সাম্রাজ্য। আপনাকে পাওয়ায় ও জানায় স্বরাজ্যলাভ হয়। স্বরাজ্যলাভের পরই সাম্রাজ্যের সৃষ্টি।

* * *

বুদ্ধি হইতেছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। এই বুদ্ধি হইতে থরে থরে নামিয়া দেহরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধি তার হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা কোটীসূর্য্যসম অন্তরাত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে, উহাকে অপসারিত করিতে হইবে—তবেই জ্ঞানসূর্য্যের অমল কিরণে দেহরাজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে। বুদ্ধি যোগসিদ্ধির পরম অন্তরায়, আবার বুদ্ধির সহায়তা না পাইলে যোগ অবধারণ হয় না। বুদ্ধির উন্মেষ যাহাদের হইয়াছে তাহাদের দ্বারাই এই যোগসিদ্ধির আশা অধিক করা যায়, কেননা অন্ধ ভক্তদের যোগগ্রহণ করিতেও যেমন অধিক বিলম্ব হয় না, আবার যোগভ্রষ্ট হওয়াও তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বুদ্ধির পুরাতন সংস্কার নূতন কিছু গ্রহণ করিতে বিলম্ব করে, কিন্তু একবার উহা গৃহীত হইলে কোন

কালে আর পতন সম্ভাবনা থাকে না।

* * *

যোগসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে যোগ গ্রহণ স্বাভাবিক। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিনা সহায়তায় এই যোগপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়। জগৎপ্রাণ সমীরণে তপঃশক্তি নিত্য সঞ্চারিত, সকল দ্বার মুক্ত করিয়া একনিষ্ঠচিত্তে যে ইহার প্রতীক্ষা করে যোগ তাহার নিকট মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়। তবে বাহিরের সাহায্য—সাধনার পক্ষে একেবারেই উপেক্ষণীয় নহে।

* * *

বাহির হইতে যে ইন্ধন পাওয়া যায়, উহাই অন্তরের আত্মশক্তিকে শনৈঃ শনৈঃ জাগাইয়া তুলে, সাধনকালে সৎসঙ্গ যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু যাঁহার সাহায্যে সাধকের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়, তিনি গুরু নহেন, সাহায্যকারী মাত্র। গুরু অন্তরতম পুরুষ। আমরা সকলেই যন্ত্র—অপরের আত্মপ্রকাশ সমধিক উজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত দেখিয়া, আপনাকে পাইবার জন্যই গুরুভাবের সাধনা—এই গুরুকরণ যেন সাধকের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ না হয়। সাহায্যকারীও যেন সাধকের অন্তরে গুরুভাবের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া না বসেন—ইহাতে উভয়েই বদ্ধ হইয়া পড়িবেন—আমরা সকলেই সমান ভাবে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিব, সমান আনন্দে বিভোর থাকিব—বিচিত্র লীলাভঙ্গী থাকিলেও অন্তরে আমরা একই সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত—একথা নিত্য স্মরণ রাখিতে হইবে।

* * *

কোন জাতিবিশেষের জন্য আমাদের সাধনা নয়। সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র হইবে। সমষ্টিসাধনা করিতে বসিয়া যেন আমরা য়ুরোপের মত আড়ম্বরশালী যান্ত্রিক রাজ্য (mechanised state) না গড়িয়া তুলি। প্রতি মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা আনাই হইতেছে এই যোগের উদ্দেশ্য। যোগের সহায়ে মানুষ যেদিন উপলব্ধি করিবে, স্থানকালের ব্যবধানে মানুষের স্বতন্ত্র জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, স্বার্থ নাই, তখন এক অভিনব ঐক্যের উপর নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিবে—উহাই হইবে দেবরাজ্য। এই বিপুল সমাজশাসনের জন্য তখন আর কতকগুলি লোক মিলিয়া স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে শাসনকেন্দ্রের (Government) প্রতিষ্ঠা একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে।

বিপুল মানবজাতির কর্ম্মকেন্দ্র থাকিবে কিন্তু উহা সকল মানবেরই অন্তর রূপটি বিগ্রহাকারে প্রকাশ হইবে মাত্র। কার্য্যশৃঙ্খলার জন্য যে কেন্দ্র এবং উহার প্রতিভূস্বরূপ যে জীবন, উহা জাতির সারাংশ, ইহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয়ে মানবজীবনের চরম আদর্শ সফল হইবে না। বৈদিকযুগে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে এইরূপ সৃষ্টি রচিয়া উঠিয়াছিল, ভবিষ্যতে উহাই বিপুল আকার লইয়া সারাজগতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

* * *

ভবিষ্যৎ জগতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, তাহার ছাঁচ প্রস্তুত হইতেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশই জগতের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে। বাঙ্গালীকেই জগতের শান্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতের অপর সকল প্রদেশে, এই মাত্র জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন পন্থায় উহারা পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—লোকমান্য তিলকের জীবনসাধনায় মহারাষ্ট্র একটা প্রাণের সাড়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের জীবনতন্ত্রে এখনও ঝঙ্কার দিতে পারে নাই; মাদ্রাজ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের পুরাতন সংস্কার, আচার বিচার, এই নূতন শাসনসংস্কারপ্রবর্ত্তনে শ্লথ হইয়া পড়িবে—মহাত্মা গান্ধীর সাধনা ভক্তিমূলক, বাংলা ত্রয়ী সাধনায় কথঞ্চিত অগ্রসর, সেইজন্য এক্ষেত্রে উহা তেমন শিকড় গাড়িতে পারিবে না। পাঞ্জাবের উগ্রশক্তি নিথর—সত্যসন্ধানে উদ্‌গ্রীব, চারিদিকেই জাগরণের সাড়া, ভারত নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে।

* * *

বাংলায় রাজসিক আন্দোলন শেষ হইয়াছে। উহার ফলেই বাঙ্গালী মানুষ হইতে পারিয়াছে। বাংলার সাহিত্য অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই গড়িয়া উঠিল, শতবর্ষের মধ্যেই বাঙ্গালীর জীবনে ধর্ম্মের সত্যতত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদিও বাংলাদেশে এখনও সহস্র অন্ধসংস্কার বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাংলায় যে আন্দোলন চলিয়াছে তাহার আবর্ত্তনে শীঘ্রই সবই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালী অন্তরদেবতার আভাস পাইয়াছে, বাঙ্গালীর জীবন-যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাই বাঙ্গালী গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অভিযানে দলে দলে ছুটিয়াছে—বাঙ্গালীর নূতন যাত্রা জয়যুক্ত হইবে।

* * *

বাংলায় যে নূতন জাতিসৃষ্টি হইতেছে উহা পুরাতন রাজনীতিসাধনার অন্তর্গত নহে, ইহার উৎপত্তি উপস্থিত অসংখ্য ব্যষ্টিকে লইয়াও নহে; কোন কার্য্য, উদ্দেশ্য অথবা অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া নূতনের দল একত্রিত নহেন। লোক সংখ্যার দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই, আড়ম্বরের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য নাই, অন্তরে অন্তরে শৃঙ্খলিত হইয়া একটা শক্তিপিণ্ড গড়াইয়া গড়াইয়া আপনার পরিধি বিস্তার করিতেছে—প্রয়োজন মত আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া নূতন আলোক বিকীর্ণ করিবে। বাংলাদেশের সকলেই একদিন এই দিব্য আলোকে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে পারিবে।

* * *

নূতন সাধকের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব কেবল সিদ্ধির অপেক্ষায়। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তি অতি সুন্দর বিকাশলাভ করিয়াছে—উহাই তো ভবিষ্যৎ কর্ম্মের জন্য সবখানি নয়। অন্তরের ইচ্ছাটিকে দেশের মনে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া চাই এবং উহা হইলেই আবার সব হইবে না, ইচ্ছাটিকে মূর্ত্তিদান করিতে হইবে, তাহার জন্য সাধনা চলিয়াছে; বিজ্ঞানের পথ মুক্ত হইলেই বাঙ্গালীর কর্ম্ম নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইবে।

* * *

এই সাধনা একজনের উপর নির্ভর করে না। একজনের সিদ্ধিস্রোতে সকলে গা ভাসান দিলে, পুরাতন যুগের মত, একজনের অন্তর্দ্ধানে জাতির জীবন মাটীতে ঠেকিয়া যাইবে। চাই সকলের জীবনই সমানভাবে উন্নতিলাভ করা, অবশ্য প্রথম প্রথম যাঁহারা সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করিতে যত দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে, ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের আর তত বিলম্ব হইবার কোন কথা নাই। তাঁহারা উত্তরগামীদের প্রচুর সাহায্য পাইবেন।

* * *

জীবনের তিনটী স্তর—সাধারণ অবস্থা, সাধন অবস্থা, সিদ্ধির অবস্থা। সাধারণ অবস্থায় মানুষ চেষ্টা করিয়াই সব কিছু করিতে চাহে, বাসনাই হয় তার জীবনের মূলশক্তি, নিজের মনগড়া কাজেই সে মাতিয়া থাকিতে চায়। সাধনার অবস্থায় বাসনাকে একেবারেই ছাড়িয়া চলিতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সংযম নিগ্রহ

নহে। সংযমের কথা শুনিয়াই অনেকে রাজযোগের বিধি অনুসারে নিগ্রহ-নীতিই অবলম্বন করিয়া বসেন, ইহা ঠিক নহে, বাসনার তরঙ্গাঘাতে অন্তর যাহাতে বিচলিত হইয়া না উঠে, ইহার জন্য তপস্যা করাই সংযম। চিত্ত স্থির হইলে বাসনার পরিবর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছাটিই জাগিয়া উঠে। সিদ্ধ অবস্থায় বাসনা ও চেষ্টা থাকে না, স্বতঃই কর্ম্ম প্রকাশ পায়, সাধক তখন একেবারেই হইয়া যায় ভগবানের যন্ত্র।

* ○ ○

য়ুরোপে আজ ভাঙনের যুগ আসিয়াছে। ধ্বংসের জন্য নহে, পুনঃ নির্ম্মাণ হইবে বলিয়া। আয়র্লণ্ডের প্রাণস্পন্দন প্রবল আকার ধারণ করিতেছে, উহারা শীঘ্র শীঘ্র নূতন নির্ম্মাণ চায়। রুশিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, জগতের চতুর্দ্দিকেই যে গোলযোগ উহা আর কিছুই নহে, যে অভাবনীয় নূতন স্রোত আমাদের জীবনে প্রবাহিত, রাজসিক আধারে তাহারই বিভিন্ন ভঙ্গী সারা জগতে লীলারত। আজ যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদের উঠিবার দিন আসিয়াছে; ভারতবর্ষ জাগিবে—জগতের জীবনে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য। আসিয়ার আলোকপাতেই য়ুরোপে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

* ○ ○

ভগবানের অপার্থিব করুণা কেবল বাঙ্গালীই যে লাভ করিতেছে এরূপ মনে করিও না। জগতের সকল মানুষের উপরই সমানভাবে ইহার বর্ষণ চলিতেছে, আধারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। বাঙ্গালীর আধার বড় উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, চৈতন্যযুগের পর হইতে বাংলায় যে ধর্ম্মস্রোত বহিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান যুগে উহার বেগ অত্যন্ত অধিক হইলেও, বাঙ্গালীজাতি উহা অচঞ্চলচিত্তে অবধারণ করিতেছে। কোথাও কোথাও যে শ্রীচৈতন্যের মত দশাপ্রাপ্তির কথা শুনিতে পাও, উহা আধারের অসমর্থতা ভিন্ন কিছুই নহে; এইরূপ লীলালক্ষণ প্রকাশ হইলেও, এমন দিন আসিতেছে, আকণ্ঠ অমৃত পান করিয়াও বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের মত সাধারণক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন করিবে।

* ○ ○

বাঙ্গালীর জীবন অতি শীঘ্র পুলকপূর্ণ হইবে। বাঙ্গালী আপনার নাম-

রূপের সকল সংস্কার একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ভিতর যতই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে বাহিরের আচরণ ততই মিষ্ট এবং সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিবে। গীতা ও উপনিষদের প্রতি বর্ণ বাঙ্গালীর নিকট কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া থাকিবে না, উহা সত্য ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল এবং আশাপূর্ণ।

* * *

সাধনার অবস্থায় সাধককে প্যাশিভ হইয়া থাকিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় সে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে। সিদ্ধি পাইতে হইলে কেবলই শক্তির সাধনা করিতে হইবে, যে রুদ্ধ কবাট জীবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের চেষ্টায় উহা অপসারিত হয় না, শক্তিই ঐ দ্বার মুক্ত করিতে পারেন। এই শক্তি তোমার আমার তাহার নহে, ইহাই বিশ্বশক্তি। তবে এই শক্তিদর্শন যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের বাণী ক্ষুরধারসদৃশ, আর কর্ম্ম আনন্দের লহরীতুল্য।

* * *

সাধক কি করিবে, কি না করিবে প্রভৃতি নির্দ্দেশ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া মানুষকে পঙ্গু করিয়া তোলা, কেননা যাহা করিতে হইবে তাহার মর্ম্মকথা অপরে বলিয়া দিবে কেন? নিজের অন্তর হইতে যে প্রেরণা অবতরণ করিবে উহাই তো হইবে সত্যকর্ম্ম। হাজার ভুল করিলেও কাহারও কর্ম্মে বাধা দিও না, অবাধ কর্ম্মক্ষেত্র মিলিলে সাধক আপনা আপনি অতি শীঘ্রই বাসনা ও প্রেরণামূলক কর্ম্মের লক্ষণ অবধারণ করিয়া সত্যনির্দ্দেশ বুঝিতে পারিবে।

* * *

ছাড়িতে হইবে আসক্তি—ভোগ নয়। বিষয় পরিত্যাগ করিলে কি হইবে? চিত্তে যে প্রেরণা উপস্থিত হয় উহা তো উপর হইতেই নামিয়া আসে। বিবাহ করিবে, কি না করিবে, এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কি? সকলই তো তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছা কি, যদি বুঝিয়া না থাক তাহা হইলে তুমি তো অন্ধ, অন্ধ হইয়া আবার একজনের পথ নির্দ্দেশের ব্যাকুলতা নিজেই কি বুঝিতে পার না! বুদ্ধির সহিত ভাগবত ইচ্ছা সংযুক্ত না হইলে কোন কর্ম্মই করিবার অধিকার থাকে না, তবে কি মানুষ কর্ম্ম করিতেছে না, ঐ কর্ম্ম কেবলই সংস্কারসৃষ্টির কারণ।

ভগবানের আনন্দে যে পথ প্রকাশ হয় উহা সিদ্ধ জীবনেই সম্ভব। সিদ্ধ জীবন আর কিছুই নহে, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহারই প্রীতার্থ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা।

* * *

সাধারণ জীবনে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে আনন্দের অভিনয় দেখিতে পাও, উহা অন্তরগত পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে যে আনন্দ. উহারই অন্ধ অনুকরণ মাত্র। আপনাকে না পাইলে, না জানিলে, আনন্দ উৎসের সন্ধান না মিলিলে জীবন কি সার্থক হয়? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ উহা বড় পবিত্র, বড় আনন্দদায়ক। ভোগ অর্থে দৈহিক কিছু নহে। স্বামী—স্ত্রীর মধ্য দিয়া জগৎ দেখিতে চায়, স্ত্রী বিশ্বের আনন্দ স্বামীর ভিতরেই পাইতে চায়, ভোগ হইবে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত মনের, বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, দেহের সহিত দেহের—ইহাই মিলন, ইহাই দাম্পত্য জীবন।

* * *

প্রকৃতিকে অবাধে ক্রীড়া করিতে দাও। প্রকৃতির সাহায্যেই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মিস্থিতি লাভ হইবে। জীবনের সব খেলাই আত্মার খেলায় পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। উৎপাদনই ভোগের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রাকৃত ভোগের পশ্চাতে এক বিপুল আনন্দ উৎস আছে। পুত্র হউক আর নাই হউক, এই আনন্দে অবগাহন করাই মানুষের ধর্ম্ম, প্রকৃতি প্রতি জীবনেই সংবদ্ধ, উহাকে অতিক্রম করিয়া চলিবার সাধ্য আছে কাহার? সৃষ্টির আদিকাল হইতেই পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়াছে—পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য সত্যপূর্ণ।

* * *

সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে, মানুষ যেদিন ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ এক বিরাট সমষ্টি গড়িয়া তুলিবে। নূতনজাতির সমাজচিত্র কিরূপ হইবে তাহার কল্পনা তরল চিত্তের লক্ষণ—যাহা হইবে তাহা যেন বাসনাসঞ্জাত না হয়, শুদ্ধ প্রেরণাবশেই যেন তাহা ঘটে—এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

নারীর কথা

"প্রবর্ত্তকের" স্বপ্ন সফল করিবার জন্য নারীর উৎসাহচঞ্চল হৃদয়খানি কেমন আবেগভরে দুলিয়া উঠিয়াছে—তাহারই নিদর্শন প্রথম সন্দর্ভ "প্রতিজ্ঞা"। চিরউপেক্ষিত নারীর হৃদয় পুরুষের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আজ নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত নহে, আপনাকে দান করিয়া করিয়া সে আজও দেউলিয়া হয় নাই, নির্ম্মম হস্তে হৃদয়ের অবশিষ্ট কমনীয় বৃত্তিটীকেও উৎসর্গ করিতে চাহে—পুরুষ যদি নারীর ভারে এমনই অবসন্ন হইয়া থাকে যাহাতে তাহাদের জাগরণ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, নারী স্বামী-কামনায় বিরত হইবে—কঠোর বজ্রধ্বনির মত নারীর এই হৃদয়বাণীর মধ্যে যেন একটু ম্লান পরিহাস প্রচ্ছন্ন আছে।

প্রবর্ত্তক চাহিয়া আসিতেছে সন্ন্যাসী বটে। সে সন্ন্যাসী সংসার সমাজকে পদভরে বিদলিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে চাহে না—সংসার সমাজকে নূতন করিয়াই গড়িতে চাহে কিন্তু কোন্ উপাদানে ইহার নির্ম্মাণ হইবে, নারীই যে ইহার প্রাণ, ইহার সৌন্দর্য্য, নারী হইতে পৃথক হইলে তাহাদের জীবন-সাধনা যে ব্যর্থ হইবে।

তবে নারীসম্বন্ধে 'প্রবর্ত্তক' এতখানি উদাসীন কেন? "প্রবর্ত্তকের" সাধক তার অন্তরের ক্ষুধা, যে মর্ম্মন্তুদভাষায় প্রকাশ করে—উহা কোমল-প্রকৃতি নারীর হৃদয়ে যে বাজিবে তাহা বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়, সেইজন্য কি নারী নিজের নারীত্ব বর্জ্জন করিয়া পুরুষের অনুগামী হইতে চাহে, ইহা যে বড় অস্বাভাবিক—নারীর প্রতি পুরুষের উৎকট অত্যাচার।

বাংলাসমাজে নারী যে হীন, পুরুষের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য অপরাধী কে? বৌদ্ধযুগ হইতে পুরুষ চাহিয়া আসিতেছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সাধনা করিতে—নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া পরিহার করিতে পারিলেই নিজেকে বীরসাধক বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাহার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে—নারীজাতি জীবনের অর্দ্ধেক অঙ্গ, এক অঙ্গ এমন অবশ হইয়া থাকিলে জাগরণ কি কোন কালে সম্ভব হইবে?

"প্রবর্ত্তকের" সন্ন্যাসী একথা হৃদয়ঙ্গম করে। এই সন্ন্যাসী শব্দে কেহ যেন বিচলিত না হয়েন, আমরা যে সন্ন্যাসীর কথা বলি উহা বৌদ্ধভিক্ষু অথবা শঙ্করপন্থী মায়াবাদী নহে, উহা গীতার "নিত্যসংন্যাসী যো' ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"।

ভগবানে সকল কর্ম্ম ও ফল সমর্পণ করিয়া জীবনযজ্ঞ পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরাজ্ঞান লইয়া যাঁহারা নূতন সংসার পাতিতে চাহেন, সময় সময় "প্রবর্ত্তক" তাঁহাদিগকেই সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করে; নারীকে বর্জ্জন করিয়া যে সংসাররচনা তাহা আকাশে গৃহনির্ম্মাণের মত স্বপ্ন, মিথ্যাময়—সে জ্ঞান আমাদের আছে।

আমরা এক্ষণে নির্ম্মাণ করিতে চাহি। এই নির্ম্মাণের যুগে, আমাদের সহকারিণী হইবার মত নারীশক্তি কোথায় মিলিবে? যে পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় আমাদের মধ্যে আজি এই নূতন প্রেরণা গঙ্গাপ্রপাতের মত অজস্রধারে নামিয়া আসিতেছে, নারী উহা হইতে কোন মতেই বঞ্চিত হইবে না, কেননা পুরুষের উপেক্ষায় নারীর দুর্দ্দশা যতই শোচনীয় হউক, মানুষের প্রাণ মন বুদ্ধি লইয়া উহারাও ঘর করে, উপরের অমৃতবর্ষণ উহাদিগকেও অমৃতের পুত্রীরূপে পৃথিবীর বুকে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিবে।

নারীকে গড়িয়া তুলিবার ভার যদি কোন মানুষ গ্রহণ করে এবং নারী যদি তাহা স্বীকার করিয়া লয়, আমরা জানি "অন্ধেন নিয়মানা যথান্ধাঃ", ইহারই মত উপরের দিকে তাহাকে না তুলিয়া নিরয়ে নিক্ষেপ করিবে। মানুষ যদি নারীকে কোথাও অধিক অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করিয়া থাকে, তবে যেখানে সে নারীর উন্নতিকল্পে স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তার চরম নিদর্শন, এবং পতনও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছে।

কি পুরুষ, কি নারী, উভয়কেই স্বাধীনভাবে জাগিয়া উঠিতে হইবে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে মাত্র। পূর্ব্ব হইতেই নারীর নেতৃত্ব পুরুষ লইতে আরম্ভ করিলে, চিরদিন নারী পুরুষের দাসী হইয়া থাকিবে, পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী সে উঠিবে নামিবে যন্ত্রপুত্তলিকার মত, বাংলার নারী-সমাজকে আমরা আর এতখানি নিঃসহায়, খেয়ালের বিলাস-সামগ্রী করিয়া রাখিতে চাহি না।

প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার ধুঁয়া তুলিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল চীৎকার করিলেন, যে নূতন নারীসমাজ গড়িয়া তুলিলেন, তাহা নূতনের

ভিত্তি কতখানি দৃঢ় করিয়াছে, পুরুষের নূতন রচনায় কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি এই নবগঠিত নারীসমাজ জাতীয় জীবনের ভিত্তি রচনায় প্রচুর সাহায্যের বিনিময়ে পুরুষের ভোগ বিলাসেরই অধিকতর যোগ্য উপকরণ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা যথেষ্টই প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, এ কথা আমরা সহস্রবার বলিব।

ভারতে পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ উহা ভোগের নয়, বিলাসের নয়, উহা দৈহিক মিলনের প্রাকৃত আচরণ নহে, উহা ভাগবত জীবনগঠনের অপূর্ব্ব রসায়ণ। উভয়ের আত্মার সহিত আত্মার মিশ্রণে যে বিদ্যুৎস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়, উহা ভারতের সনাতনসৃষ্টি—সে উত্তম রহস্যের মর্ম্মকথা বলিবার সুযোগ আসিলে বলিব—আজ আমরা কেবল বলিতে চাই—আকাশের মত অসীম, সমুদ্রের মত গভীর ক্ষুধা লইয়া আমরা পুরুষ, তোমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—আমার শূন্য বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিবে তোমার অমরস্পর্শে। তুমি আত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ কর, আমায় কোন কর্তৃত্ব দিও না, আমরা উভয়েই সে পুরুষোত্তমের যন্ত্র, এস যুক্ত করে তাঁর অনন্ত জ্ঞান শক্তি প্রেমে ভরিয়া উঠিবার জন্য বার বার তাঁকে নমস্কার করি।

হে নারী! প্রাণময়ী! পুরুষের কল্পপটে যে নূতন স্বপ্নচিত্র ফলিয়া উঠিয়াছে উহা তোমার অগাধ প্রেমরঞ্জনে আবেগময়ী তুলির আঁচরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য পৌরুষকণ্ঠে লক্ষ বাঙ্গালীকে প্রতিজ্ঞা করিতে আদেশ করিয়াছ—নারী হইতে তাহারা পৃথক থাকিবে। পুরুষের এই "সূক্ষ্ম রূঢ়তাই" নারীর নারীত্বে যদি নির্ম্মমভাবে বাজিয়া উঠে, তবেই যোগ্য জননী, ভগ্নী, দুহিতা, জায়া হইয়া তোমরা পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সহকারিণী হইতে পারিবে।

পা টিপিয়া টিপিয়া সারাজীবন পিচ্ছিল পথে চলিয়াছি, অনেকখানি সতর্কতা সাবধানতা আমায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে—তোমার নারীত্বের দুর্জ্জয় অভিমান তীক্ষ্ণ শেলের মত নূতন শক্তি বিমণ্ডিত হইয়া এ যে পুরুষের হৃদয় ভেদ করিবে। বাহিরের আঘাত শরীরের পক্ষে অসহ্য বটে—অন্তর উহা অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারে। আজ নারীর অন্তরে যে বেদনার ক্ষুরধার নির্ম্মমভাবে বসাইয়া দিতে চাহ, উহার আঘাতে নারীসমাজ জাগিয়া উঠিবে বটে কিন্তু জগতের সাহায্যকারিণী নারীরূপে নহে, পুরুষের বক্ষে সংহারকালীর

প্রলয়নৃত্য—সে তো প্রতিশোধের—নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তে এ যে ধ্বংসের সূচনা।

আমি আজ উদাত্ত কণ্ঠে তোমায় আহ্বান করি—হে নারী, আমি ঘরের বাহির হইয়াছি তোমাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইবার জন্য—তোমারই প্রাপ্তি-কামনায় জীবনের দিন গণিয়া চলিয়াছি—তোমার অভাবে আমি পূর্ণজীবন লাভ করিতে পারিতেছি না—তুমি এস, তোমার রসে আনন্দে সৌন্দর্য্যে আমার জীবন ভরাইয়া তোল, অক্ষমতার ছদ্মবেশ হইতে আমায় মুক্ত কর, আমার প্রাণে তোমার বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হউক—তোমারই সহায়ে আমি বাংলায় এই যুগলমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি লইয়া নূতন সমাজজীবন গড়িয়া তুলিব।

আমি চাহিতেছি ভাগবতজীবন, তাই সর্ব্বাগ্রে তোমার আগমন কামনা করি আমার অধ্যাত্মজীবনে; তোমার আসিতে যতই বিলম্ব হউক আমার তপঃ-ভঙ্গ হইবে না, তোমার কোন ছলনায় আমি দিশেহারা হইব না, উপর হইতে আমি তোমায় পাইতে চাই। তুমি এস বুদ্ধিতে, তুমি যুক্ত হও মনে, প্রাণের যজ্ঞবেদীতে আইস উভয়ে উপবেশন করিয়া ঋক উচ্চারণ করি, সবখানি যদি ভরাইয়া দাও তবেই আমাদের মিলন সার্থক হইবে। আমি কোন আঘাতেই তোমার জীবনতন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিতে চাহি না, আঘাত প্রতিঘাতেরই সৃষ্টি করে। ইচ্ছা করি তোমায় পাইতে, আমার এই প্রবল ইচ্ছাই তোমার অন্তরে সমুদ্রমন্থনের সৃষ্টি করিবে, সে বিপ্লবে বিষ উঠিবে বটে কিন্তু অমৃত হইতেও আমার জাতি বঞ্চিত হইবে না।

ভগবানের নির্ম্মাণকার্য্যের সবখানি কিছু মানুষের চক্ষে পড়ে না, যেটুকু মানুষ দেখে উহা অতি অল্প অংশ; অধিকাংশ কর্ম্মই লোকচক্ষুর অগোচরে চলিতে থাকে। বাংলার এই জাগরণ কেবল পুরুষজীবন লইয়া নহে, নারীর ভাগ্যও ইহার সহিত বিজড়িত; এইবার বাংলা উঠিবে যুগলে যুগলে। জীবন প্রাকৃত নহে, দৈব, তাই নানা সম্বন্ধে নরনারী এক হইয়া একই পথে যাত্রা করিবে।

ক্ষুধা উভয়েরই তুল্য। পথ দুর্গম—পুরুষের সাধনা সিদ্ধি নারীর জীবনে ঢালিয়া উহা দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে হইবে—আবার নারীর প্রেম অনুরাগ স্নেহ পুরুষের জীবনে মধুবর্ষণ করিবে, দানে প্রতিদানে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইবে—আমরা কেবল অপেক্ষা করিতেছি এই ভাগবতজীবন লইয়া। নারীর অভ্যুত্থান ঘটিতে যদি সহস্রযুগ সময় লাগে আমরা অধীর হইব না—প্রাকৃত জীবন গ্রহণ করিব না—স্বর্গের সৃষ্টি উপভোগ করিবার জন্য

জীবন চিরনবীন করিয়া রাখিব, সে ধৈর্য্য আমাদের আছে, সে তপস্যার আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। নরকের দ্বার দিয়া নন্দনকাননে প্রবেশ করিবার অভিলাস "প্রবর্ত্তক"-সাধকের নাই, তাই উপর হইতে দেখিলে নারীজাতির প্রতি দারুণ উপেক্ষার ভাবই তাহাদের প্রতি অঙ্গে লেপিয়া আছে বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু অন্তরে অন্তরে নারীগর্ব্বের মহিমা নারীত্বের সম্মান তাহাদের প্রচুর আছে—সৃষ্টি সার্থক না হইলে সংস্কারের দাস হইয়া জীবনের বাঁধন আল্‌গা করিয়া লাভ কি?

নূতন-সমস্যা

লোকচক্ষুর অন্তরালে ফল্গুস্রোতের ন্যায় জাতীয়জীবনে এক নূতন স্রোত আসিয়াছে—বাহিরে কলহকোন্দললিপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না—তাই নিশ্চিন্ততার অলসশয়নে এখনও প্রাচীন সুখস্বপ্নে মত্ত রহিয়াছেন। আজ চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিতেছে, অশুদ্ধ দেহ মন লইয়া দেশের কাজ করা চলিবে না; যাহারা মৌখিক নহে, কার্য্যতঃ দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিবে, যাহাদের বাক্যশুদ্ধি ও কার্য্যশুদ্ধি থাকিবে তাহারাই কর্ম্মক্ষেত্রে জয়ী হইবে—বাহ্যাস্ফালনের দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ যাঁহারা অন্তরীণ বা নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাহারাও বুঝিতেছেন—

অধর্ম্মে নৈবতে তাবৎ
ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততো সপত্নীন জয়তি
সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্ম দ্বারা সাময়িক উন্নতি হয় বটে, কিন্তু পশ্চাতে সমূলে বিনাশ হয়। যাঁহারা দেশীয় ধনী মহাজনের সাহায্য না পাইয়া সংসার হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বজন প্রতিবেশীর সহানুভূতিশূন্য হইয়া অসহিষ্ণুতার বশে অসৎপন্থায় অর্থাগম করিয়া দেশের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাঁহারা পশ্চাতে বুঝিয়াছেন, ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। প্রথম উদ্দীপনার তড়িৎ প্রবাহে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাঁহারা অন্ধস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা নিভৃত চিন্তার সময় পাইয়া আপনা আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, কেন এমন হয়? কেন সমপ্রাণ সখা সাধারণ দৈহিক যন্ত্রণায় বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যমিথ্যা স্বীকারোক্তি করিয়া সঙ্গীকে বিপন্ন করিতেছে? জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্নের উত্তর আসিয়াছে—এ নহে সুষ্ঠু পন্থা! সত্য বটে ইহারা কামিনীকাঞ্চন জয়ী হইয়া নির্লিপ্ততার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি কাহার কাহারও পদস্খলন সমস্ত ব্রত কলুষতাময় করিয়া দিয়াছে। আজ এই সমস্ত যুবক নিকষপাষাণ

পরীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণাকার ধারণ করিয়া—আবির্ভূত হইয়াছেন। আবির্ভূত হইয়া দেখিতেছেন—

সমাজের শুভ চাহে যারা
সমাজ না তাহাদেরে চায়,
পরহেতু সর্ব্বস্ব দিয়া
উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পায়।

তাঁহারা দেখিতেছেন, যৌবনের কল্পনাময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেশোদ্ধারের উন্মাদনায় যাহাদের বাক্যের অনুসরণে কণ্টকময় পথে পদার্পণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত দেহে আজ গৃহে ফিরিতেছেন তাহারা আজও অনায়াস বা স্বল্পায়াস-লব্ধ মানসম্মানের ফেরি করিয়া যথেষ্ট আরামে জীবন কাটাইতেছে। তাই আজ পরিখাপ্রাচীর পরিবেষ্টিত গৃহ ছাড়িয়া উচ্ছ্বসিত যুবকবৃন্দ দেশে এক প্রবল তরঙ্গ তুলিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা স্বার্থান্বেষী বন্ধুর ভিক্ষান্ন গ্রহণে আত্মাকে কলুষিত করিতে প্রস্তুত নহেন—তাঁহারা স্বাবলম্বনের সেবক, স্বাবলম্বনের মৃত্যুপণে কার্য্যক্ষেত্রে লিপ্ত হইবেন। যে দারুণ পাপ এদেশে এখনও জাতীয় ভাণ্ডার গঠন করিতে দেয় নাই—যে কর্ত্তৃত্ব চিরদিন যযাতি রাজার ন্যায় অতৃপ্ত আকাঙ্খা জাগ্রত রাখিয়া যুবক পুরুষগণকে পশ্চাতে রাখিতেছে আজ সে পাপ বিদূরিত করিতে হইবে। সত্য সত্যই আজ দেবজাতি গঠিত হইতেছে—ধর্ম্মের—বিশুদ্ধতার পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ গম্ভীর রবে ধ্বনিত হইতেছে—তাঁহারা বলিতেছেন—অধর্ম্মের পথে নহে, কপটতার পথে নহে, তামসিকতার তৈলসেকে নহে—মৃত্যুঞ্জয়ী কর্ম্মপথে জাতীয় মুক্তি আসিবে—

বল মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ।
স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ—
বৃহৎ জগৎ হ'তে
সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে
নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে
সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা !
দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—
তারি মাঝে যাব অভিসারে তার কাছে,
—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি !

এ মন্ত্র গাহিয়া এই মন্ত্র জপ করিয়া জীবনসংগ্রামে চলিব—হে আসক্তি-পরায়ণ বাগ্মীবর নেতা, তোমাদের দিন চলিয়া গিয়াছে—পথ ছাড়—আমাদিগকে পথ দাও—দেশের সহিত—জনের সহিত—ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া আমরা সেবাব্রত প্রবর্ত্তন করিব—ঐ যে অদূরে সিদ্ধি ! আমাদের এ-ব্রতে আর বিদ্বেষ হিংসা নাই—আজ আত্মজয়ী হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিব—করিয়া জগৎকে আমাদের শান্তপাদপতলে শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইব। সাবধান।

(বরিশাল হিতৈষী)

দ্বীপান্তরের বাঁশী

বাঁশী দ্বীপান্তরে বাজিলেও সপ্তস্বরে বাঙ্গালীরই জীবনরাগিণী ফুকরিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই ভগবান্ আপনার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন মহিমার রচনা করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যে মহিমার প্রকটন, তাঁহার লীলার ভঙ্গী, বাঙ্গালী তাহার সন্ধান হারাইয়াছিল তাই ভগবানহারা (National soul) জাতি লোক-সমষ্টিমাত্রে পরিগণিত হইয়া বিরাট আলস্য অখণ্ড নিশ্চেষ্টতা নিরবতায়—ঠিক যে ধর্ম্মটি অবলম্বন তাহার প্রাণের অনুকূল, তাহার বিপরীত ধর্ম্ম-গুলির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া ক্রমেই শত সহস্র লক্ষ খণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। অমাপক্ষের চন্দ্রের মত কলাক্ষয়ে ক্রমাপচীয়-মান বাঙ্গালী এইরূপেই আপনার এই বর্ত্তমান অস্তিত্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যেও নিশ্চয়ই ভগবানের কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছে, জাতির হৃদয়কৌমুদী কলার পর কলার পরিপূরণে দীপ্তাভ স্ফুটতর, লক্ষ্যে অলক্ষ্যে, তাইই হইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি। 'প্রবর্ত্তক' বাতাসে কান পাতিয়া ভাবের জালে সেই চেতনাকেই ধরিতেছে, প্রত্যেক হৃদয়ে হাত দিয়া কোথায় তাহার প্রতিষ্ঠান সেইটাই দেখাইয়া দিতেছে। দ্বীপান্তরের বাঁশীর আলাপে বুঝিলাম বারীন্দ্রের সহিত প্রবর্ত্তকের সাধনা এক। দূর দ্বীপান্তরের লৌহনিগড়স্পর্শ তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী যোগনিদ্রাতেই নিমগ্ন রাখিয়াছিল। কর্ম্মী ফিরিয়াছেন ঋষি হইয়া। আজি আর জাতির দুঃখ তাঁহাকে অধীর করিবে না, জাতির ভাগ্য তাঁহাকে চঞ্চল করিবে না, জাতির ভগবানের দর্শন তাঁহাকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকিবে!

আপনার মধ্য হইতে ভেদভাবের জড়টীকে পর্য্যন্ত উৎপাটিত না করিতে পারিলে বাঙ্গালী এক হইতে পারিবে না। এ জাতি সে জাতি নহে যে জাতি বাহিরের স্বার্থ প্রতিষ্ঠানে, আসুরিক লালসাকে মিটাইবার জন্য ক্ষণকালের মত দেবতার মুখস পরিয়া এক হইতে পারে। এ জাতি

এক হয় আপনার দেবস্বভাবের পূর্ণচেতনা জাগাইয়া একেবারে দেবতা হইয়া। এ জাতির হৃদয়ে দেবভাব পশুভাবের আপোষ নাই। এ জাতির এই দুর্ব্বল হিংস্র ঈর্ষাময় হৃদয় কোন পূত জাহ্নবীপ্লাবনের অবতারণার জন্য এত দুঃখ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছে, সে তিনিই জানেন যিনি করিতেছেন নির্ম্মাণ।

"বাঁশীর" প্রথম কবিতাটীতেই যখন দেখিলাম,

মম—প্রেমেরি রাজা তো ছিল না নিঠুর,
কোটী কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।

তখনি হৃদয় তাঁহার হৃদয়ের পুলকস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল "স্বাগতঃ"! এ স্বর তো সেই স্বরই যে হৃদয়ের সংস্কারগুলিকে তন্ন তন্ন খুঁজিয়া কোটী জন্ম টানিয়া আনিতেছে, যে মহাশক্তি তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারই সাক্ষাৎ লাভে বহুর মধ্যে একত্ব অনুভবের জন্য পাগল হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী কবিতাতেই দেখিতে পাইলাম পাগলের উন্মত্ততা বৃথায় যায় নাই। চেতনার উন্মেষে আহ্বানের সাড়া আসিতেছে, কবির বাঁশীতে নতুবা বাজে কেন?

চাহিয়া পাইয়া
পূরে নাক হিয়া
অফুরন্ত প্রেমধনে।

তাহার পরবর্ত্তী কবিতাতে এই উপলব্ধিই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিলাম কবি স্থির করিয়াছেন—

তুমি যে পাথার মোর ডুবে মরিবার,
শ্মশান লক্ষ কোটী জনম লীলার।

হে কবি! এই "ডুবে মরিবার" পাথারে যদি ডুবিয়া সত্যই মরিতে পার। কোটি জন্মেও যে লীলার শেষ হইল না! এই জীবন যদি তাহারই শ্মশান-শয্যার চিতানল করিতে পার তবে সত্যই পাইবে, সত্যই হইবে! অন্তরের কোটী কোটী জন্মসংস্কার যে হৃদয়ে প্রেমের পাথারে ডুবিয়া সত্যই মরিবে সেই হৃদয়ের উন্মাদ সরসতায় উন্মত্ত হইবে বাঙ্গালী। এক হইবে আট কোটী নরনারী।—সেই প্রথম, যাহার মধ্যে জাতির ভগবান্ প্রথম জাগিবেন পূর্ণস্বরূপে।

বাহিরের জীবন বারীন্দ্রের কর্ম্মময় কিন্তু সে জীবন অন্তঃসাধনার প্রচুর

অবকাশ দিয়াছে। বারীন্দ্রনাথ যে জীবন মরণের, অহঙ্কার যাহার প্রাণ, সে জীবনকে ফুরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঁশী তাই বাজিতেছে—

জীবনের সপ্তস্বরা
বাজিয়া হয়েছে সারা,
শ্রান্তা ভোগপুরে তব বারবিলাসিনী ;
তোমাতে গো গঙ্গাজলী কর তারে আনি।

এই পাঁচটী কবিতার মধ্যেই আমরা বারীন্দ্রের অন্তরাত্মার পরিচয় পাইয়াছি। বুঝিতেছি তিনি নরনারায়ণের মন্ত্র পাইয়াছেন—যে মন্ত্রে ধর্ম্মই আত্মার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, যে সাধনায় মানুষ আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী
ভূত্বাত্মোপশমোপেত মকরোদ দুশ্চরং তপঃ
শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।৩।৯

চতুর্থে সেই ঈশ্বর নরনারায়ণ অবতার হইয়াছিলেন। এই অবতারে ভগবান্ নররূপে ধর্ম্মকে স্বীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া দুস্তর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বীপান্তরের বাঁশী পড়িয়া আমরা পুস্তকখানি বুঝিবার চেষ্টা যত না করি বারীন্দ্রের আত্মাকে তদপেক্ষা অধিক দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঁচটি কবিতা পড়িতেই সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তাই পাঁচটির অধিক আর আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। কবিতাগুলির মধ্যে মুক্তির স্বরূপের আভাষ শেষে গিয়া বেশই ফুটিয়াছে, আশা করিবার যথেষ্ট লক্ষণই আছে। আমরা আমাদের অভিমতস্বরূপ ইহাই বলিতে চাই—বারীন্দ্রের চিরনির্ব্বাসনে কেবলমাত্র বাঙ্গালাই আপনার একটি পরমনিধি হারাইয়াছে ইহাই ছিল সকলের ধারণা। আজ কর্ম্মজীবনটাকে আন্দামানে সমাহিত করিয়া রাজানুগ্রহে নবজন্মপ্রাপ্ত বারীন্দ্রনাথ কবিমূর্ত্তিতে নবজীবনপথ অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার এবারকার জীবন সমগ্র পৃথিবীর। তাঁহার আত্মার দর্শনলাভে আমরা বেশ বুঝিতেছি, বারীন্দ্রকুমারের হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি বিপ্লব একেবারে দমিত হইয়া গিয়া সেখানে অক্ষুণ্ণ শান্তি নিরুপদ্রব রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আপনার মধ্যে এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা সমস্ত জগতেই শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শ ধরিয়া দিতে সক্ষম।

সমালোচনা

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—১ম ও ২য় ভাগ—স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বাংলাসাহিত্যে যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের যাদুকরী তুলিকা পাশ্চাত্য-ভাববিমূঢ় জাতির দৃষ্টিকে অন্তরমুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারই শেষবর্ত্তী যুগপর্য্যায়ের আত্মপরিবর্ত্তনশীল হিন্দুজাতির ইহা একখানি প্রাঞ্জল চিন্তাচিত্র। লেখক একজন থিয়জফিষ্ট, হিন্দুশাস্ত্র গভীরভাবেই আলোচনা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার লেখাগুলিতে, ভূমিকালেখক যেমন বলিয়াছেন, বেশ্ একটা আন্তরিকতা ও অমোঘতা পরিদৃষ্ট হয়। লেখক নিজেই যাহা একস্থানে বলিতেছেন, 'আমাদের হিন্দুসমাজ কি একটা বড় প্রয়োজনীয় কথা মনে আনিয়াও মনে আনিতে পারিতেছে না, জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হওয়ায় সেই বিস্মৃত কথাগুলি মনে আনিবার ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু আসিতেছে না, ফলে সমাজমনের বড়ই যন্ত্রণা……, এমন সময়ে যেন হারাণো বাক্যের আদ্য অক্ষরটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল'—সেই যুগের সমস্ত চিন্তাচেষ্টাটাই এইরূপ। স্বয়ং লেখকের প্রবন্ধগুলিতে যে একটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়, তিনি যেন হারাণো সূত্রটি ফিরিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বস্তিকা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কবিতা-পুস্তক, মূল্য ।৵০ মাত্র। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। সুখদুঃখময় অবিরাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার জন্য গ্রন্থকার কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাই পুস্তকের নাম স্বস্তিকা। প্রাণের আবেগ আহ্বান পাঠকের হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তি দিবে।

শিশু-পালন—স্বাস্থ্যসমাচার পুস্তিকা নং ৩, ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে তদ্‌কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার অধিক, দেশের দারিদ্র্য এবং গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতাই ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। এই সঙ্কটকালে শিশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করিয়া কার্ত্তিকবাবু দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন। একদিকে শিক্ষার অভাব, অন্যদিকে খাঁটি গোদুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য —প্রকৃতই দারিদ্র্য-নিপীড়িত গৃহস্থগণ নিরুপায়! এতদ্‌সত্ত্বেও শিশুপালনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা শিশুমৃত্যু অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারি। এই সব বিষয় আলোচ্যপুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
৩০এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

অরবিন্দের পত্র

স্নেহের

তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে উঠে নি। এই যে লিখ্‌তে বসেছি, সেটাও একটা miracle; কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon; বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা এই পাঁচ-সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ করে যদি postএ দিতে পারি, তা হলেই miracleটা সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জান্‌বে যে, তাঁহারই মত আমার যোগপন্থা,—যা'কে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চল্‌তে হবে।

* * * যা' নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম,—যা' দিয়েছিলেন *

* * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা; এদিক, ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটি ওটি ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া।

তারপর ——তে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার' সম্পূর্ণ theory যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তাহারই development করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি। আর দুই বৎসর লাগতে পারে। আর যত দিন শেষ না হয়, বোধ হয় বাঙ্গলায় ফিরতে পারবো না। ——ই আমার যোগসিদ্ধির নির্দ্দিষ্ট স্থল —অবশ্য এক অঙ্গ ছাড়া; সেটা হচ্ছে কর্ম্ম! আমার কর্ম্মের কেন্দ্র বঙ্গদেশ, যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমস্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবী।

যোগ পন্থাটী কি, তা' পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বল্‌তে পারি যে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণকর্ম্ম ও পূর্ণভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণসিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকৃত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত কর্‌তে পারে; অনন্ত, অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধর্‌তে পারে না। ধর্‌তে হ'লে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নাই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক একজন কর্‌তে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত আছেনই। ভগবান্ মানুষে যা চা'ন, সেটী হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান্ করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—to realise God in life.

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য কর্‌তে পারে নি; জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্", ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু, সিদ্ধ মুক্ত হ'য়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হ'য়ে নৃত্য কর্‌বে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হ'য়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্ম-সিদ্ধি? আগে মানসিক levelএ যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত কর্‌তে হয়, তারপর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞান ভূমিতে না উঠ্‌লে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব; জগতের সমস্যা solved হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন, এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবান্‌কে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মনবুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হ'ল আত্মার পাঁচটী ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-

এর চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হ'য়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হ'য়ে যায়। অখণ্ড, অনন্ত, আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই আমার যোগ-পন্থার central clue, তার মূল কথা।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরেই আমি এই মাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতম স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান্ আমার through দিয়ে অপরকেও অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দিবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নহি। যাহা হবার ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নাই। যদি কর্ম্ম সিদ্ধি না-ও হয় আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব।

বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতনরূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এও দরকার ছিল। বাঙ্গলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেই গুলির সংস্কার exhaust করে আসল সারটী লয়ে জমী উর্ব্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যাহা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা —লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে ভগবানের সঙ্গে জগতের একটী সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটী অর্থ হয়। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটী অনিবার্য্য। মনের ধর্ম্ম এই খণ্ডকে লয়ে পূর্ণ বলা, আর সকল খণ্ডকে বহিষ্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন—(পূর্ণকে) মূর্ত্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যেরা তাহা পায় না, মূর্ত্ত নহে বলে। পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে বিচলিত হই না। অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, মূর্ত্ত

দলই হোক—পরে দেখা যাবে। এটা নবযুগের শৈশব, এমন কি embryonic অবস্থা। আভাষ মাত্র, আরম্ভ নয়।

* * *

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি সংঘ চাই। তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যে যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু সত্যের একটী দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নাই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার থামখেয়ালি নয়, রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলে রূপ গ্রহণ। আমরা জগতের কোনও কার্য্য বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না আমাদের Experience লাভও পূর্ণ development হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে—বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তা'রই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise করতে চায়, * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism. সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নাই; যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়। এই সকল অশুদ্ধ রূপে Spiritual শক্তি ঢাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে। সর্ব্বক্ষেত্রে তাই। Spiritual influence দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended হবে শিব মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই

প্রাণ, সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারতমন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের Spirit ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা' না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসে নি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ; যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Communeএর মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দিবে। শক্ত বাঁধারূপ নয়, অচলায়তন নয়; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা' ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গী লয়ে এটীকে ঘিরে, ওটীকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে Spiritual Community দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea, এখনও পুরো developed হয় নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা' সকলে করতে পারে। বড় আধার, ক্ষুদ্র আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নাই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না; ঠেলে উঠে। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

* * *

* * আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু একটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়,

কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, চিন্তা করবার অক্ষমতা বা চিন্তা "ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, সে বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিস অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেই খানে; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা' মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারত দেখ। কয়েকজন Solitary growth ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man; যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা গভীর কথা। সামান্য কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনে সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার Fatal limitation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics, yogic hallucination; ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation ও surmount করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই; সহজের উপাসক; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন;

বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটী ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের Capacity আছে, intuition আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না; সহজে সারতে চায়; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞান শূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছেনা, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে ও আর কোথাও তত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা তা' বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলচ চাই ভাব উন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও সব করেছিলাম স্বদেশীর সময়ে; যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল

হয় নি। হয়েছে; যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা' অধিকাংশ possibilityর বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise করবার এটা ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement, ভাব, মন মাতানকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ ঐক্যের স্থির ecstasy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে, ভাগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা' দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peterএর চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজগিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হই নি বলে নয়। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে? * * ইতি—

তোমার 'সেজদা'

(নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ)

সত্য প্রকাশ

বাংলায় এমন একদল লোক দেখা দিয়াছেন—যাঁহারা কাহারও কথায় বা কোন উত্তেজনার কুহকে আর কিছু করিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা চাহেন সর্ব্বাগ্রে আপনাকে জানিতে—আপনার ভিতর হইতে কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে জাগ্রত করিতে এবং ঐ আত্ম-জ্ঞান দিয়াই, ঐ আত্ম-শক্তির সাহায্যেই কিছু গড়িয়া তুলিতে। এইরূপ মানুষের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও—ইহাদের কর্ম্ম তুচ্ছ নহে, ক্ষুদ্র নহে; জাতির সত্য-প্রতিষ্ঠান এই আত্ম-সিদ্ধ লোকের সাহায্যেই গড়িয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

* * *

আবেগ ও উত্তেজনার ফলে যে কর্ম্ম সৃষ্টি হয়, অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রাধান্যে অভিভূত হইয়া সমষ্টি যেখানে কিছু নির্ম্মাণ করে, উহার ভিত্তি তত দৃঢ় হয় না—উৎসাহ-স্রোত মন্দীভূত হইলে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধান ঘটিলে এইরূপ কর্ম্ম-মন্দির ভূমিশায়ী হয়। এই জন্য বাংলায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

* * *

প্রতি কর্ম্মীই আপনাকে জানিবে এবং পাইবে—অন্তরের সহিত মিল করিয়াই বাহিরের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে। কর্ম্ম যেখানে মানুষের অন্তর-শক্তি দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে উহা কখনই ব্যর্থ হয় না। একের কর্ম্ম সকলে মিলিয়া সুহজে সম্পন্ন করা যায় বটে, কিন্তু দলের অন্তর একত্র সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া না উঠিলে, অনেক সময় বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইতেও দেখা যায়। কর্ম্মীবৃন্দ স্ব স্ব অন্তর্শক্তিকে জাগ্রত করিয়া যদি

কিছু নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং ঔদাসীন্য আসিয়া আমূল কর্ম্মটীকেও নষ্ট করিতে পারে না। সেইজন্য যেখানে কোন বৃহৎ কর্ম্ম সংসিদ্ধ করিতে সমষ্টি-শক্তির প্রয়োজন, সেখানে প্রতি ব্যষ্টিকেই আপন আপন অন্তর্দৃষ্টি লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে।

* * *

কর্ম্ম বলিতে আমরা ক্ষুদ্র সংসারের কোন কথা বলিতেছি না। দেশ যদি বিষাক্ত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, আমার আবাস গৃহখানি যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলি না, দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও মরিতে হইবে। সংসার জাতিরই অংশ। জাতির জীবনে যে আঁধার, অশুদ্ধতা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, উহাই সর্ব্বাগ্রে দূরীকৃত করিতে হইবে—নতুবা আমার জাতি অধিক দিন টিকিবে না।

* * *

এই অজ্ঞান তমসা দূর করিবার জন্য অনেকেই অনেক রকম কর্ম্ম প্রণালী স্থির করিয়াছেন। সকল পন্থারই প্রয়োজন আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কেবল আমরা বলিতে চাই—যিনি যে প্রণালী অনুসারেই কার্য্য করুন না, উহা যেন প্রতি কর্ম্মীর অন্তর দিয়াই পাওয়া হয়, নতুবা অনেক সময় একজনের কর্ম্ম অপরজনের ঘাড়ে চড়িয়া উভয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কর্ম্মপ্রণালীর আনুগত্যেই মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। ঐক্য স্থাপন হয় অন্তরের মিলনে। এই অন্তর-সাধনা সিদ্ধ না হইলে পরস্পর পরস্পরের অন্তর দেখিতে ও পাইতে পারে না।

* * *

আমরা এতখানি বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িয়াছি যে কর্ম্মের বাঁধনে আমরা মানুষকে বাঁধিতে অগ্রসর হই। অবস্থার আনুকূল্যে যে ঐক্য সংস্থাপিত হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তনে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। আবার নূতন কোন সানুকূল অবস্থার প্রতীক্ষা করি। ভারতের রাষ্ট্রনীতি এই পথেই চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, অবস্থা মানুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক নহে; অনেক সময় অবস্থার আনুগত্যে এত বড় মারাত্মক ভুল ঘটিয়া থাকে, যে উহার ফলে এক একটা প্রবল জাতি উৎসন্ন হইয়া যায়। অবস্থার সহায়তায় আমরা কিছু করিব না—ভিতরে

প্রেরণা অবস্থাকে ব্যবহার করিয়া লইতে পারে।

* * *

দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণী আজ হীনবল, কেননা সে ভাবিয়াছিল মিত্রজাতির মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা যাউক যাহাতে উহাদের মধ্যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার কৌশল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাই পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে কামানের গোলা যখন প্যারীতে অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল, উড়ো জাহাজ হইতে রাশি রাশি বিপ্লবসূচক পুস্তিকা ফ্রান্সে বিতরিত হইল, ডুবো জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর বাণিজ্য-তরী জলমগ্ন হইতে লাগিল, তখন জর্ম্মণী ভাবিয়াছিল, এইরূপ অবস্থায় অন্ততঃ ফ্রান্সে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইবেই, কিন্তু অবস্থা যে সব সময় মানুষকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার প্রেরণা দেয় না—ইহা তখন তাহাদের বুদ্ধিতে যোগায় নাই। ইহার ফল বরং বিপরীত ফলিল, পৃথিবীর সকল জাতিই জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, ফ্রান্সে বিপ্লব না ঘটিয়া জর্ম্মণীতেই উহার আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—জর্ম্মণী আজও পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

* * *

অবস্থা ভিতরেরই অভিব্যক্তি। অবস্থার অনুসরণ করিয়া কোন জাতিই বড় হইয়া উঠে না। ভারতের বর্ত্তমান কর্ম্মসৃষ্টি কিন্তু অবস্থানুগত। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ধূয়া ধরিয়াই না বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি! বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি-ভঙ্গে, জামালপুর ময়মনসিং কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে বিবিধ অত্যাচারকাহিনী শ্রবণেই বিপ্লবতন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—আজও তুর্কীর পতনে খালিফাৎ, রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ প্রভৃতি দেখিতে পাই; অবস্থা আমাদের টানিয়া টানিয়া ব্যবস্থার পথে লইয়া ছুটিয়াছে—অন্তরের একটানা স্রোতে গা ভাসান দিবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নাই। সেইজন্য আমাদের নির্ম্মাণগুলি দেশজোড়া আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু ভিত্তি বালুময় স্থানে, কাজেই স্থায়ী নয় দৃঢ় নয়—জোর দিয়া জাতি দাঁড়াইতে পারে না।

* * *

আজ আবার বাংলায় নূতন নির্ম্মাণ চলিয়াছে, নূতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন লইয়া। কোন একটী অবস্থায় না পড়িলে, আমাদের যে একটা দেশ আছে, আমরা যে একটা জাতি, আর এই দেশ এবং জাতি উৎসন্ন যাইতে

বসিয়াছে—এই জ্ঞান আমাদের থাকে না। আমরা চাহি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেশের মধ্যে এমন একটী ভাব, এমন একটী কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে যাহা দিয়া এই মরা জাতির জীবনে অভিনব শক্তি আবির্ভূত হইবে—এবং এই কর্ম্ম অবস্থানুসারে ব্যবস্থার মত দুই দিনের নহে, জাতির জন্য সব খানি দিয়া জীবনভোর গায়ের রক্ত জল করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংরাজ আমাদের দ্বারপালস্বরূপ বহির্শক্তি হইতে দেশকে রক্ষা করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার যথেষ্টই উন্নতি ঘটিয়াছে—অনেক সুযোগ ও সুবিধারও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন—এই রাজ শক্তির আশ্রয়ে আমাদের চারি কোটী বাঙালীকে যদি জাগাইয়া তুলিতে পারি—তাহা হইলে আমাদের যোগ্য অধিকার ফিরিয়া পাইব ইহা অবধারিত এবং সে অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ যে করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমরা অল্প জলে শফরির মত কেবল ফর্ ফর্ করিয়া মরিতেছি—সত্যনির্ম্মাণ কোন প্রণালীতে সুসিদ্ধ হইবে, এমন ধারণা দেশ-কর্ম্মীদের মধ্যে বেশ স্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, তাই পথে বাহির হইলেই এমন একটা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়িতে হয়, যে দেশের এবং রাজশক্তির উভয়ের চক্ষেই একটা সংশয় দৃষ্টিই ফুটিয়া উঠে। আমরা পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই অস্পষ্টতার সহিত যুদ্ধ করিয়াই আসিতেছি—আজও উহা অপসারিত করিতে পারি নাই।

* * *

কিন্তু কাজ আমাদের করিয়া যাইতে হইবে। আত্মপ্রকাশের ফলেই বাহিরের কুয়াসা তিরোহিত হইবে। কাজকে পাইতে হইবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া। এই অন্তর্দৃষ্টি ফুটিবে আত্মদর্শনের ফলে। কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশ-প্রেমিককে এই আত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধৈর্য্যহীন হইলে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেখ আপনাকে—ভিতরের দিব্যপ্রেরণা কোন দিকে তোমায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—তুমিই তোমার কর্ণধার, কর্ম্মের ছকাছকি কেবল বাতুলতা। দেশ অন্নহীন, জ্ঞানহীন, শক্তিহীন—দেশের জীবনী শক্তি কোথায় রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে অন্বেষণ কর, জ্ঞানশক্তিপ্রেমে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। আপনাকে এই ত্রিবেণীতীর্থে অভিষিক্ত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হও। এই অভিযান তোমার অক্ষয়

হউক, অশেষ হউক—এই দিব্যজাগরণ কেবল চারকোটী বাঙ্গালীর জন্য নহে—তবে আরম্ভ স্বর্ণপীঠ বাংলা হইতে, তোমার অঙ্গরেণু উড়িয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক। হে বিশ্বপ্রেমিক! দেবজাতির অগ্রদূত! তোমার অঙ্গুলিসঙ্কেতে গগনচুম্বী হিমালয় মাথানত করিবে—দিক্‌দিগন্তব্যাপী অসীম নীলাম্বুরাশি হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তোমায় পথ দিবে—আমি তোমায় নমস্কার করি।

আদর্শ পথ

অধুনা শিক্ষিত লোকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবানের কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা শিখিয়াছেন দৈহিক ও নৈতিকবৃত্তি এবং বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিতে; এবং এইগুলির সম্যক অনুশীলন করিতে পারিলেই, আপনাকে কাজের লোক বলিয়া মনে করেন। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ইহাদের আবশ্যকতা আমরা উপেক্ষা করি না, কিন্তু যাহা সত্য তাহা চিরদিন মানুষের বদ্ধ আদর্শ, বদ্ধ ধারণার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছে অসীমের পথে, তাহাকে কেবল দেহ মন আর বুদ্ধির অনুশীলনেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

মানুষ আজ চাহিতেছে এমন একটী অফুরন্ত উৎসের সহিত সংযুক্ত হইতে, যাহা হইলে জীবনে অবসাদ বা নৈরাশ্যের স্থান থাকে না—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে উৎসাহে পুলকে মর্ত্ত্যের বুকে সে কেবল নব নব সৃষ্টি রচনা করিবে; পদে পদে বাধা বিপত্তির অস্ত্রাঘাত সে আর সহ্য করিতে চাহে না—কেবলই জয়, জয়ের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা—এমন সমারোহ জীবন মানব মাত্রই আকাঙ্খা করে।

শরীরে প্রচুর শক্তি, মনে অসাধারণ চরিত্রবল, আর বুদ্ধি ভরিয়া থাকিবে বিজ্ঞানে ইতিহাসে, জগতের অভিজ্ঞতায়—ইহা হইলেই তো জীবন পূর্ণ হইল। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বুদ্ধি পূর্ণ করিয়া দিতেছে—ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরকে বলশালী করিয়া তোল, আর সেবা, দেশভক্তি, স্বজাতি প্রেম, এই সকলে হৃদয়পূর্ণ থাকিলে চরিত্রবল যে অটুট থাকিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে।

এই আত্ম অনুশীলনের প্রবল চেষ্টা সৃজনশক্তিকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করে তাহা আমরা সবিশেষ বলিতে পারি না, তবে এক্ষেত্রে সংগ্রামের মাত্রা যে অধিকতর বৃদ্ধি পায় ইহা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতেই জীবনের অর্দ্ধেকখানা অতিবাহিত হইয়া যায়,

বাকি অর্দ্ধেক জীবনসংগ্রামঘটিত ক্ষতচিহ্নগুলিকে মিলাইয়া দিতেই শেষ হয়। স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন অবসন্ন জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, যৌবনের কোন আশা কোন উদ্দেশ্য কোন আদর্শ তো ফলিয়া উঠিল না! তখন আত্মগ্লানিপূর্ণ জরাজীর্ণ জীবনে কেবলই পাকাইয়া পাকাইয়া মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, আর তিল তিল করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরজীবন শেষ হইয়া যায়।

এই অবস্থায়, অনেকেই আবার আপনার অভিজ্ঞতা লইয়া নূতন শক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। সকল কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন—উহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না, উহা হওয়া কি সোজা, সম্ভব, কেবল বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে; কিন্তু কোন্ পথ যে নিরাপদ, কিরূপ করিলে যে জীবন সার্থক হয়, এরূপ সুনির্দ্দেশ ইহাদের নিকট কোনকালেই পাওয়া যায় না।

আজ বাংলার নূতনশক্তিকে আমরা একটী সিদ্ধপথ নির্দ্দেশ করিতেছি। এই পথ অতি প্রাচীন, কিন্তু কালের আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে ইহাকে মুক্ত করায় একেবারেই অভিনব বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কর্ম্ম সৃষ্টি হইতেছে না মানুষের কল্পনা হইতে, বাসনা হইতে—আর উহা কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না মানুষের চেষ্টায়, মানুষের পুরুষকারে। কর্ম্ম নামিয়া আসিতেছে ঊর্দ্ধদেশ হইতে, উহাকে মাথা পাতিয়া অবধারণ করিবার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান-টীকেও সুমেরুশিখরের মত দৃঢ় অটল এবং শত ঐরাবতের শক্তি দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে।

শরীরকে বলশালী করিবার জন্য কল্পনার সাহায্য লইব না, গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিব না—ইহার সুষ্ঠুপথ উদ্ভূত হইবে ভিতর হইতেই। এইরূপ মানস ও বুদ্ধির অনুশীলন বাহিরের প্রয়োজনসাধনে সিদ্ধ হইবে না, ভিতরেই উহার দ্যোতনা মিলিবে এবং তাহা হইলেই মানুষের জীবন সত্য ও সুন্দর হইয়া অন্তরাত্মা প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিবে।

স্বভাবতঃ মানুষ যে চাহে দৈহিক নৈতিক মানসিক উন্নতি সাধন করিতে, ইহার মূলে আছে এই সত্যপ্রেরণা যে, এই চাওয়া মানুষের নহে—ভগবানের। ভগবানকে অস্বীকার করিয়াই মানুষ আপনাকে খণ্ড করিয়াছে, কাজেই সে যাহা করিয়া তুলে তাহাও হয় অপরিপূর্ণ। ভগবানকে ছাড়িয়া ব্যষ্টি জীবনে যে বিভূতি প্রকাশ পায়, তাহা একত্র করিয়া জগতে

কিছু করা যায় বটে, কিন্তু ভিত্তি তার দৃঢ় হয় না, ঐক্য সেখানে অবিচল নহে—কাজেই ধ্বংসের ভিতর দিয়া মানুষ চলিয়াছে কত যুগযুগান্তর চরম সত্যটীকে পাইবার জন্য।

ভারতের ধ্বংসযুগ অবসানপ্রায়। যাঁর দৃষ্টি আছে তিনি অনায়াসেই দেখিবেন ভারতে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; এই সৃষ্টি যদি ভগবানকে বাদ দিয়া সংগঠিত হয় তবে অবধারিত ইহার ভীষণ অধঃপতন আসিবে। ভারত অবনতির শেষসীমায় উপনীত—ভারতের জীবনে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, এই অবস্থায় ভগবানকে উড়াইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যাঁহারা চাহেন তাঁহারা একপদ অগ্রসর হইতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মোহনে তাঁহারা যতই আড়ম্বর করুন না, ব্যর্থতায় ব্যর্থতায় এই ভাগবত জ্ঞানই অধিকতর প্রকাশ পাইবে—প্রতি কর্ম্মীকে ভাগবৎময় হইয়া কর্ম্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে হইবে।

মানুষ আত্ম অহংকারে এমনই নিমগ্ন যে ভগবান আছেন বলিয়াই তাহারা স্বীকার করেন না, তাহার পর যদিও ভগবান্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা অতি কষ্টে অনুভূতির মধ্যে আসে তাহাতেও জগতের সহিত ভগবানের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পান না—কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে ভগবানকে মানা আর না মানা উভয়ই তুল্য কথা হইয়া দাঁড়ায়।

এই ভাগবত জ্ঞান চেষ্টা করিয়া অথবা যুক্তিতর্কে কাহারও ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, উহা স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে—সত্য দিয়াই যেমন সত্যকে উপলব্ধি করা যায়, তদ্রূপ ভগবান্ আপনার স্বরূপেই মানুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ করেন।

ভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা যাহার আছে, বুঝিতে হইবে ভগবান্ সেখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিরূপ লোকের মধ্যে ভাগবত জ্ঞান প্রকাশ পায়, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এতদ্‌সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যাঁহারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী, সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান্‌কে পাইয়া তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাহারা নূতন জীবন

লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকেই আমরা গোটাকতক কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকেই বলেন ভগবান্ যে আছেন এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া যে আনন্দ অনুভব করি তাহা কদাচ মিথ্যা নহে, কিন্তু কেমন করিয়া তন্ময় হইয়া জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি পরমানন্দে অতিবাহিত করিব—আপনাকে রাখিব অথচ নিজের কোন চেষ্টা কোন বাসনাই থাকিবে না, এরূপ কিরূপে সম্ভব হইবে? কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখে পরমকথা শ্রবণে মহামতি পার্থের মনেও এরূপ সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

"যোঽয়ং যোগ স্ত্বয়াং প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে মধুসূদন, তুমি সমতারূপ এই যে যোগ কহিলে, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! মন নিশ্চয় স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারাও অজেয় এবং দৃঢ়, আমি তাহার নিরোধ, বায়ুর নিরোধের ন্যায় অসাধ্য মনে করি।" অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের উত্তর আলোচনা করিবার ক্ষেত্র ইহা নহে—এবং সে উত্তর অর্জ্জুনের মত অবস্থায়—তদনুযায়ী মানস গঠন না হইলে ভগবানের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্যও কাহার নাই। তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা মন প্রাণ বাসনা ও চেষ্টাশূন্য হইলেই যে ভাগবত যন্ত্রের মত মানবজীবন অক্লেশে চালিত হইতে পারে, মোটামুটি এই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ভগবান্‌কে ভজনা করিলেই যে পরিপূর্ণ জীবন লাভ হয় কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ বড় দেখা যায় না—সমস্তই নির্ভর করে ভগবানের স্বরূপজ্ঞানের উপর। সাধন অনুযায়ী এই জ্ঞান স্তরবিশেষ। কেহ কেহ মনে করেন ভগবান্ জগৎ রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি জগতের অন্তর্বর্ত্তী নহেন, স্থান কালের অতীত, তিনি নির্ব্বিকার অক্ষর সত্তা, কাজেই ভগবানের সম্বন্ধে এতাদৃশ জ্ঞান লইয়া সাধনতৎপর হইলে, সৃষ্টির সহিত জীবনের সম্বন্ধ সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই ভাগবত প্রেমিককে ইহসংসারের উপর দারুণ অনাস্থা করিতে দেখা যায়, ভাগবত সম্বন্ধীয় এই খণ্ড জ্ঞানই ইহার কারণ।

আবার কেহ মনে করেন, ভগবান্ পরমাত্মাস্বরূপ জীবের হৃদয়ে আছেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জীব মায়াচ্ছন্ন, তিনি মুক্ত সচ্চিদানন্দময়, কাজেই জ্ঞানযোগে সমাধিলাভই এক্ষেত্রে সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ভগবান্‌কে এরূপ খণ্ড করিয়া দেখা অজ্ঞানতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তিনি যে কেবলই আনন্দ, কেবলই অমৃত, কেবলই জ্ঞান, সত্য, পুণ্য, ধর্ম্ম—তাহা নহে, তিনি জগতে যাহা কিছু প্রকাশ সবলই, তিনি বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমা, সত্য, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় অভয়, পৃথিবীর যাহা কিছু সবই তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যে জ্ঞান লাভ করিব—সে জ্ঞান অনন্ত ভগবান্, যে মানস উন্নতি করিব—সে তিনি প্রেম ভক্তিরূপে জাগ্রত হইলে, তবেই সার্থক হইবে—যে কর্ম্ম করিতে চাহি সে তাঁরই ইচ্ছা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের অহমিকা আপনার চেষ্টা দিয়া সব কিছু করিতে চায়, ভগবান্‌কে বিস্মৃত হওয়া অর্থে, তাঁর অফুরন্ত প্রবাহ হইতে আপনার সবখানি ভিন্ন করা—এরূপ হইলে জীবন প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু ভগবানের অসীম শক্তি সেখানে লীলায়ত হইয়া উঠে না।

তাই যখন আমরা ভগবান্‌কে চাহি—তখন ভগবানের স্বরূপজ্ঞানটিকে যথাযথ ভাবে হৃদয়ে অবধারণ করিতে হইবে। কেবল জ্ঞান, কেবল প্রেম, কেবল শক্তিস্বরূপই যে তিনি, এরূপ নহে, তিনিই আধেয় এবং তিনিই আধার, এরূপ অভ্যাস না করিলে হৃদয়ে যখন ভাগবত প্রেম অবতরণ করে, মানুষের হৃদয় তখন এমনই বিচলিত হয় যে নানারূপ ভাব, দশা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ধীরে ধীরে যাহা কিছু সবই ভগবানে ভরাইয়া স্থির নিশ্চল হইয়া আমাদের অবস্থান করিতে হইবে। অসীম জ্ঞান প্রেম শক্তি এই আধারে খেলিয়া যাইবে, কিন্তু ধৈর্য্যহীন হইব না, মত্ততা আসিবে না, রহিব অশেষ ধৃতি লইয়া নির্ব্বাত দীপশিখার মত অচঞ্চল, অপ্রমত্ত চিত্তে বহুভাবের তরঙ্গ অবাধে বহিয়া যাইবে। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি যেমন ভগবান্—এই গুলি প্রকাশ হইবে যে পাত্রে উহাও ভগবদ্‌রচিত, সুতরাং চাঞ্চল্য আসিবে কেমন করিয়া?

যেদিন বুদ্ধি আমাদের শুদ্ধ হইবে, হৃদয় আমাদের নিশ্চল হইবে, প্রাণ বাসনাশূন্য হইবে—সেই দিন কায়াসিদ্ধিও আমরা লাভ করিব। এরূপ করিবার উপায়—ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তাতে আমি যে সত্তাবান্ এই জ্ঞান-প্রদীপ অবিরত জ্বালিয়া রাখা—জীবনের একটী মুহূর্ত্তেও আমি বলিয়া কোনও ভাবের উদয় না হওয়া—সবই ভগবান্—ভগবানেরই আধার, ভগবানেরই কর্ম্ম—আমি বলিয়া কিছুই নাই—এইরূপ জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই আত্মসমর্পণযোগের চরম সিদ্ধি—ইহাই ভাগবত জীবন।

অন্তর্মুখীনতা

অরুণ আভাষের নবানুরাগ আধো লালিমায় উদ্ভাসিয়া আমার অন্তরে কি এ জাগিতেছে রে? কল্পনা? চিত্তচমৎকারী অফুরন্ত স্রোতঃরাশির ওই অগাধ সাগরসঙ্গম, কামনার সহিত কাম্যের ওই আলিঙ্গন—তোরা যা বলিবি বল, আমি আজ তারে লইয়া অন্তর্ময় বিভোর নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইব। এই বাহিরের সকলখানি নিমগ্ন করিয়া দিব তাহার অতল তলে। সেই অগাধ জলে কুতূহলে আরাধনা করিব আমাহারা আমির যতদিন না আদেশ পাই, যতদিন না অবরোধমুক্ত নির্ঝর জলরাশির মত অভ্যন্তরস্তরের উত্তপ্ত বাষ্প বিস্ফোরণবিগলিত ক্ষিপ্ত দুর্ব্বার স্রোতে বাহিরে ছুটিয়া আসিতে পারি।

এ যেন একনিষ্ঠ জাগ্রত অধীশ্বরের ইচ্ছা! সে রাঙাইয়াছে, পাকাইয়াছে, দিনে দিনে যত জাল জঞ্জাল সরাইয়া হৃদয়সিংহাসন জুড়িয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে! আপনার নিবিড় আলিঙ্গনে বুক চিরিয়া, বুকের মধ্যে ভরাইয়া সব একাকার করিয়া লইতেছে। কি যে ছিল—কি যে গেল—কি যে কি হইলাম—না! কিছুরই সুশৃঙ্খল স্মৃতি নাই। সব এলোমেলো, সব ঝাপ্সা! এমন করিয়া এই অস্তিত্ব রঙ্গমঞ্চের এই দৃশ্যপটখানি যবনিকাক্ষেপে অন্তর্হিত করিলে—কেন? কি সাজাইতে প্রভু! তোমার ওই জগদতীত করস্পর্শের যাদুদণ্ডখানি ফিরাইতেছ বুলাইতেছ, তাহার প্রসারে প্রসারে কুঞ্চনে কুঞ্চনে একি এ অপূর্ব্বের সমাবেশ!—ওগো, লক্ষ্য কি? হেতু কি? কেন এই আমার মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করা? জগতেরই যে ছিলাম গো! তাহারে বঞ্চিত করিয়া, তাহারই মধ্যে আজি এ কাহার আমি? হৃদয়স্রোত যে বিশ্বস্রোতের প্রতিকূলে বহে। গতিভঙ্গে তরঙ্গ নাই, তবুও এত টান এত খরবেগ? আর ওই? লক্ষ্যমুখে ঐ যে দিক্‌চক্রবালে ভাসা ভাসা অনন্তের আভাস? ওই কি আমার দেশ, আমার পথ?

আমি অসাধারণ এ কথা বলি না, কিন্তু আমার মধ্যে এই যে দিনে দিনে মূর্ত্ত হইয়া অসাধারণের স্ফূরণ, তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এ কি? জানি ইহার অনুসরণ করিলে জগতের কাছে প্রতিপন্ন হইব উন্মাদ। তবুও ত লজ্জা নাই, ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই, সরম নাই, কোনও দিকে কোনও বজ্রপাতশব্দেই চমক নাই। সত্য তবে, এ অসাধারণ যদি অব্যাহত প্রকাশে সম্পূর্ণ হইয়া আপন পতাকা মাথার উপর খাড়া করিয়া তুলিতে পারে, সে অসাধারণ হইবে। অর্থহীনও হইবে না বোধ করি।

আমার এই নূতনকে বুকে করিয়া আমি যেটা জগৎ সেটার মাঝখানে স্থানার্জ্জনের যত অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছি ততই মনের মধ্যে ক্ষতি-জ্ঞান ও উদ্বেগের পরিবর্ত্তে শান্তি ও প্রাচুর্য্যের সন্তোষ আসিয়া জমিতেছে। মনে হইতেছে যেমনটা হওয়া সুন্দর ও সুসঙ্গত জগৎটা ত তেমন হইয়া নাই। কি যেন বাকি আছে, তাই হইতেছে না। এই না হওয়াই, পৃথিবীর এত এই চমৎকার বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ আবর্জ্জনার মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। জগৎটা যেমন হইবার কথা তেমন যতদিন না হইবে ততদিনই সাধিয়া দিবার ও হাত পাতিয়া লইবার মধ্যেই যাহাদের সার্থকতা, সেই মানবের পরস্পরের হৃদয় মন দেহের পোষণোপযোগী ব্যবহারগুলি অবধিও কাড়াকাড়ি ও ঢাকাঢাকির মধ্যে পচিয়া উঠিয়া বিশ্রী কদর্য্য ও বীভৎস হইয়া উঠিতে থাকিবে। ব্যাধির মত জীবনও একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার বলিয়াই তাই আমার দিন দিন মনে হইতেছে। বুঝিতেছিও আমার অন্তর্য্যামী কত করুণাময়। অন্তরকে আমার এত বিমুখ করিয়া যে ধরিয়াছেন সে আমায় বাঁচাইবারই জন্য।

আমার অন্তরে গড়া অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতের এই পার্থক্যটুকু দেখাইয়াই ত শুধু অন্তর্য্যামী তৃপ্ত নন। আমার জগতে আমায় অটল প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি দেখাইতেছেন, এখানে এ বহির্জগতে মানুষের কল্পিত ঐশ্বর্য্য কত মিথ্যা। এ যে দৈন্যে একেবারে ভরা। আপন দৈন্যকে দৈন্য বলিয়া স্বীকার করিতে মানুষ এখনও প্রস্তুত নয় বটে—নাই বা হইল! যেটা সত্যই দৈন্য তার মধ্যে পড়িলে কৃচ্ছ্রতা না আসিয়া যাইবে কোথা? কৃচ্ছ্রতা আসিবেই। শীর্ণ হইতে হইবেই। মনের অতৃপ্তি আত্মার বুভুক্ষা মুখ আকারেও জানাইয়া দিবে—দিতেছেও।

স্পষ্টই দেখিতেছি মানুষের আবার আছে কি? মানুষের এখনও সবটাই ত হওয়া বাকি! সে যতটা হইতে পারে সেত হইবার এখনও অনেক দেরি। তাই অতীতে বর্ত্তমানে অনুভূত, ভবিষ্যতে জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, এখনও বহিবে, যে প্রচণ্ড বিপ্লব তাণ্ডবমালা সে সকলের নিয়ত বর্ষিত ঘটনাবলীর মধ্যে যত দহন যত পেষণ নয়ন জলের যত প্লাবন সব সার্থক বুঝিতে পারি! প্রত্যক্ষ হয় দুঃখের দিন শুধু আসে এক উদ্দেশ্য লইয়া, দুঃখাতীতকে করতলগতামলকবৎ মুষ্টিমধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে। অপর কিছুর জন্য নহে। তাই ত আমি সুখ দুঃখের অতীত আমার অবস্থান ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতেছি, ওগো আমায় ফিরাইয়ো না। আমায় বহিয়া যাইতে দাও। আমায় চূর্ণ কর। হত্যা কর। আমার হৃদয়রক্তে সমস্ত বসুন্ধরাকে রাঙা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমার এই লৌহকঠোর এই গুমরিত হৃদয় তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় অসাধারণের অবতরণবেগ বহিতে স্পন্দনে স্পন্দনে যে দিন ফাটিয়া চৌচির বিদীর্ণ হইবে, সে দিন,—যেন কোন অজানিত জগৎ হইতে দৈববাণী শুনিতেছি, সকলে পাইবে পাইবে পাইবে। সে দিন তাহার মণিকোঠায় দেখিবে পরশমণি গড়িয়া উঠিয়াছে—যে পরশমণি পরশে সোনার চোখে সোনার প্রাণে বিশ্বের সেই মূল অভাবের—যাহাকে না পাওয়ায় জগৎ আপন পরিপূর্ণ স্বরূপ ধরিতে পারিতেছে না, তাহার সকল রহস্যের সমাধান করিয়া লইবে।

ধন্য এই অসীম বেগবান প্রাণের উজান স্রোত, যাহার টানে ভাসিয়া চলিয়া অপদার্থের এত আত্মপ্রসাদ, অসার্থক ব্যর্থ জীবনে এত তৃপ্তি, পূর্ণতারূপে এই সুখ! ক্ষান্তি রূপে এই শান্তি!

আমার কথা কেহ শুনে কি?—শুনিয়া কৌতুক অনুভব করে? তাহাই ত এখন করিবে। হউক না! এই কৌতুকের সহিত কৌতূহল জাগাইবার মত আকর্ষণীটুকু ভাষার মধ্যে যদি ফুটাইয়া তুলিতে পারি, জানি আজ জগৎকে দেওয়ার দিকে সেইটুকুই যথেষ্ট। সেইখানেই বীজ বপন করিয়া চলিলাম বুঝিব। আমার সমস্তই বায়ুস্তরে মিশিয়া রহিল। অঙ্কুরোদ্গত বৃক্ষের মত আমার মানসী পৃথিবী আপনা হইতেই গজাইয়া উঠিবে—গড়িবে আবার কে? অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াই না তাহার মাটী প্রস্তুত করিলাম, সে ত কাহারও "আমি করিলাম"

দাবীর গণ্ডীতে আসিবার নয়।

আজ বিজনেই ভাল, নয়নের অন্তরালেই শ্রেয়ঃ! ধরা না দেওয়াই সুখের। তোমরা অভাব মিটাইবার জন্য অভাবের সৃষ্টি করিতেছ,—প্রাণ পাইবার জন্য প্রাণ নষ্ট করিতেছ—সবই ত দেখিতেছি! অন্তরের ইচ্ছা হাসিবে, হাসিতে পার না! কাঁদাইবার মূল হেতুগুলিকে ছাড়িতে পার না সেই জন্য। হাসিবার সাধে হাসির উৎস রুদ্ধ করিতেছ। আমি তোমাদের এই ভোজ সমারোহের মারামারির বহুদূরে থাকিয়া তোমাদের চোখে বঞ্চিত প্রতীয়মান হইলেও, তোমরা যাহা যাহা চাহিতেছ তাহা না চাহিয়াও হয়ত বা না পাইয়াও পরিপূর্ণ তৃপ্ত হইয়া চলিয়া যাইলাম। অভাবে জর্জ্জরিত রহিয়াও নিঃস্বতা বোধ করিলাম না, নির্জ্জীব নিস্পন্দ নিশ্চেষ্টবৎ থাকিয়াও মহাশক্তি মহাতেজে অন্তরের প্রত্যেক কন্দর পরিপূর্ণ করিলাম, নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতেও সুখের বিদ্যুৎ ঝিলি ঝিলি সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিলাম—এ সন্ধান যতই পাইতে থাকিবে ততই তোমরা অন্ধ আলোকের জন্য যেমন ব্যাকুল হয় তাহারই ব্যাকুলতার মত আমার জন্য ব্যাকুল হইবে। আজ শুধু হাস হাস, হাসিতেছি মনে করিয়া ব্যর্থ মুখভঙ্গী ও কলরব কর। আমি দূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সত্যকার হাসি হাসিয়া যাই। তোমরা আপনাকে ভরাইয়া তুলিবার মোহে আপনাদের চারিদিক শূন্য কর, আমি নিঃসঙ্গে নীরব নির্জ্জনতা তুষার ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইয়াই আপনার চারিদিকে জন-সমারোহ সাজাইবার অব্যর্থ আকর্ষণমন্ত্র শিখিয়া লই। তোমরা তোমাদের দ্বন্দ্বলোকে শূন্য হও—আমার বিজন লোকে আমি পূর্ণ হইতে থাকি। তোমাদের বিশৃঙ্খল উৎসব গণ্ডগোলে ব্যর্থ হউক, তারপর ভোরের রাত্রে শ্রান্তদেহ তোমাদের পশুতার মহাযজ্ঞের অবসানে যখন সুরে ভরা আমার এ স্তব্ধ বীণা ঝঙ্কারে ফাটিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে, চমকিতা উৎসবলক্ষী নিরাশায় ফিরিয়া যাইতে যাইতে হাস্যোৎফুল্ল মুখে ছুটিয়া আসিয়া বিজন কুঞ্জ মধ্যে আমারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দনাবেগে লুটাইয়া পড়িবে।

হে অন্তর্য্যামী! অন্তরে বসিয়া বলিয়া দিতেছ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে না। আত্মা তোমাতেই আজন্ম সমর্পিত। এ মনোবেণু তোমারই শ্রীঅধরের ফুঁকে জীবনরাগিণী দিগন্তরে উথলিয়া দিতেছে। চাই কেবল ফিরে যাওয়া ফিরে যাওয়া? এ হৃদয় কোথাও আর আত্মস্বরূপ প্রতিফলিত করিতে

পারিল না, সে ত তোমারই আকর্ষণ! এ দধীচির কঙ্কালে কোটী বজ্রের প্রলয় পাবক অন্তর্গুম্ফিত করিয়া রাখিয়াছ, সে বাহিরের কোনও কিছুকেই ভিতরের সংযোগপথ রোধ করিয়া জমিতে দেয় না; সে ত তোমারই নেত্রপাত! এমন অহর্নিশি যদি ঐ বিশ্বতশ্চক্ষুর সম্মুখীনই রহিলাম, আশঙ্কা কিসের, আক্ষেপ কিসের? অসার্থক জগৎকে সার্থক করিতেই ত ঐ জগদতীত বার্ত্তায় এ প্রাণ জগৎজোড়া করিয়া তুলিতে তোমার প্রয়াস। যে বলে বলুক জগৎছাড়া! চরণ টলিবে না! নিমেষ পড়িবে না। জগৎ আমায় আবৃত করিতে পারিল না, আমিই দিনে দিনে জগৎকে আবৃত করিয়া চলিয়াছি, গর্জ্জন করে করুক, পশ্চাতে মূঢ় বিজ্ঞ হিতৈষীর ফেরুপাল;—আমার কি? চলুক! চলুক! কেবল গতি।

কতবড় ইচ্ছা পশ্চাতে রহিয়াছে সে কি বুঝিতে পারিতেছি না, কতবড় সেনাপতি আমারই মধ্যে তাঁহার জয় দেখিবেন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, সে কি দেখিতে পাইতেছি না!—স্মরণেই ত শক্তি! শক্তির আবার উৎস কোথায়? ভিতরে ত বাহিরের জিনিষ কিছু জমিয়া নাই। সেথায় সে অন্তরের মণিকোঠায় কেবল দাঁড়াইয়া—আমি। বাহিরের কোন্ জিনিষ আমায় স্পর্শ করিবে? হেথাকার ঝড় ঝাপ্টা সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইবে, আমি দ্রষ্টা, দাঁড়াইয়াই থাকিব।

পৃথিবী

তপনের আলো চাহে তা'রা, পদতলে
তোমারে দলিছে তাই ; দুটি বাহু মেলি'
আকাশে ধরিবে ছুটে, তোমা অবহেলি'
অবজ্ঞার ভরে তা'রা ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে চলে !

জড় তুমি, পঙ্ক, পূতি, তোমার কবলে
আসিয়া পড়িছে দূর স্বরগেরে ফেলি'
আকাশের জ্যোতি খণ্ড, গরল-কুহেলী
ঢাকিছে, গ্রাসিছে কোন্ দেবতা অমলে।

কি অবোধ ! আহা, জানে না কি—মাটি তুমি
জমাট রসের ধারা, সোহাগ নিবিড় ?
তোমারি আদরে-ফোটে-আকাশেরে চুমি'

অরবিন্দ রক্ত-হিয়া ? পুণ্য দেহভূমি
তুলিয়া ধরিছ প্রাণে আবেগ মুক্তির,
আপীন আনন্দ ওগো মৌন চিরস্থির !

মাতৃ-জাতি

একজন পরম সুহৃদ লিখেছেন "মায়েদের অমন করে' ঠেল্‌লে কেন? তাদের টেনে নেও, তারা বড় দুঃখিনী, নিঃস্বার্থ তপস্যায় পুরুষের বড়।" নবীন জাতির মনে মাতৃজাতির উন্নতি আকাঙ্খা দিন দিন সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ছে—জাতির জাগরণ যদি সত্য হয় নারীজাতিকে উপেক্ষা করে' উহা কোনমতেই সফল হবে না, জাতি যখন জাগে দেশের নরনারী একসঙ্গেই তখন জেগে ওঠে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অভ্যুত্থান কোন কালেই সম্ভব হয় নি, আজও হবে না।

মানুষের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হ'লে স্বভাবতঃ তার সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার হয়, নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বয়ে যায়; জাতির আত্মা জাগ্রত হ'লে, কোন অঙ্গই সুপ্ত থাকে না, তার সবখানি নূতন শক্তিতে ভরে' যায়। জাতি তো কেবল পুরুষ নিয়ে নয়, অতএব যদি সত্যই জীবনে জোয়ার এসে থাকে, তীর ঢেউ নারীজীবনেও আঘাত দেবে—আমাদের ভাবনা, সেত একটা প্রবল কর্তৃত্বের সংস্কার, এই দায়ে আমরাও ভারাক্রান্ত, আর আমাদের চেষ্টার চাপে নারীজীবনও অতিষ্ঠ। এইজন্য এবার সব কাজের ভারই ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ আমরা দ্রষ্টাস্বরূপই দাঁড়িয়ে আছি, উপর থেকে যে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে তাতেই অভিষিক্ত হয়ে যেদিন নূতন চক্ষে নিজেকে ও বাহিরের সকল জিনিষকে দেখ্‌বার সিদ্ধি পাব—সেই দিন সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নয়, নির্ঘাৎরূপে দেখে চিনে নেব আমার জীবনসঙ্গিনীকে, কেননা সেও আমার সঙ্গে যুগপৎ এই অমৃত-সিঞ্চনে নূতন হয়ে উঠ্‌ছে। আজ যদিও একথা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য, কেননা বাহিরের দৃষ্টিটা নির্ভুল নয়, তবে ভিতরের চোখ দিয়ে আমি দেখ্‌ছি আমাদের সত্য ও পরিপূর্ণ জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অপরার্দ্ধটা অদ্ভুত আকারে নূতন যুগের উপযোগী হয়ে গড়ে' উঠ্‌ছে। ভগবানের

সকল রচনা মানুষের চোখে পড়ে না বলে ভিতরের সত্যদৃষ্টিটাকে উপেক্ষা করা যায় না।

পদার্থ বিশ্লেষণের লেবোরেটারীতে জগতের যাবতীয় পদার্থ স্তূপীকৃত করতে হয় না, আর তা করাও সম্ভব নয়, প্রয়োজনমত সকল পদার্থের অংশ নিয়েই পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করা হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর এই জ্ঞান জগতের সকল পদার্থের উপরই প্রযুজ্য হয়। আজ মানুষের জীবন দিয়ে যে দেবত্ব লাভের স্বপ্ন কয়েকজনের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তা সফল করবার জন্য কঠোর পরীক্ষা চলেছে; সকল মানুষই যে প্রকৃতির পরীক্ষাগারে নীত হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু এই পরীক্ষার ফল মানবজাতির জন্যই একথা অবধারিত।

কত হাজার হাজার মানুষ প্রকৃতির নির্ম্মম হস্তে বিশ্লেষিত হয়ে জঞ্জালফেলা টুকরিতে পড়ে' গড়াগড়ি যাবে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু অসংখ্য জীবন পেষিত মর্দ্দিত হয়েও "এক শ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে" যে গড়ে' উঠ্‌বেই একথা ধ্রুব সত্য, আর এই মানবসমষ্টি দিয়েই জগতের সব কাজ নূতন আকারে নূতন প্রাণে ফুটে উঠ্‌বে—তা সে "রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য শিল্প কলা, সাহিত্য" সবই।

এই একশো মানুষের মধ্যেই আমি নারীকেও পেতে চাই, কেননা একশো মানুষের সিদ্ধ জ্ঞান দিয়ে শুধু বাংলার নরনারী নয়, জগতের জীবন নূতন ভাবে গড়ে' উঠ্‌বে। এই একশো পুরো মানুষের গতির বেগেই প্রতিদিন সহস্র সহস্র পুরো মানুষের সৃষ্টি হবে—কিন্তু কঠিন এই একশো বীজকে শক্তিপূত করে' তোলা। বাংলার সাধক আজও যদি বাহিরের অভাবে আপনার চিত্তকে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেয়, তা হ'লে শক্তিমন্ত্রে আপনার সবখানিকে ভরিয়ে তোলার অযথা বিলম্ব হয়ে যাবে। ভগবানের ইচ্ছা, মানুষের হিতাহিত কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের শানযন্ত্রে সহস্র বিচ্ছিন্ন রেখায় রশ্মি বিকীর্ণ করবে বটে, কিন্তু জীবন সৌন্দর্য্যময় হ'লেও আসল কাজটী ফলিয়ে তোলা দুঃসাধ্য হবে—তাই "প্রবর্ত্তক" যাদের পক্ষে দেবজীবন লাভের সকল সম্ভাবনা আছে, তা'দিকে বাহিরের সকল আশা আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে ভগবানের দুয়ারে ধন্না দিতে বলে—ভগবানের স্পর্শে জীবন ভরিয়ে নিয়ে বিপুল বিক্রমে জগতের সকল প্রয়োজন তখন অঙ্গুলি-

সঙ্কেতে সুসিদ্ধ হবে, সিদ্ধ জীবনলাভই এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্য—কাজ তো অনন্ত, উহা ভাগবত জীবন বিকাশের অভিব্যক্তি—"must learn to develop this self-realisation first and foremost and the work only as its expression."—(A. G.)

পুরুষের ইচ্ছা জেগেছে, এই ইচ্ছাশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই আমরা নারী-জাতির জীবনেও নূতন সুর ধ্বনিত করে' তুল্‌তে চাই—এই ইচ্ছা যে-মূর্ত্ত-জীবনের মধ্য দিয়ে বাণীরূপে বিনির্গত হবে, সে-জীবনের প্রতিষ্ঠা অটল হওয়া চাই, পৃথিবীর কোন আঘাতে সে ভিন্ন হবে না, শতধা বিভক্ত হয়ে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে না—এই জীবন গড়ে' উঠ্‌বে না নিগ্রহে, মানুষের চেষ্টায় সাধনায়—ভগবানের স্বরূপরূপেই ফুটে উঠ্‌বে মর্ত্ত্যের বুকে অনাঘ্রাত কুসুমের মত, অপাপবিদ্ধ, পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও অফুরন্ত শক্তি নিয়ে।

মানুষ ও ভগবান্ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল অহঙ্কারের ব্যবধানে। এই প্রাচীর আমূল ধ্বংস কর্‌বার জন্য আত্মজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করে' তুল্‌তে হবে—জ্ঞানপ্রকাশে এই অজ্ঞানতমিস্রা টিক্‌তে পার্‌বে না। আপনার সঙ্গে অনন্তের যোগ সংসিদ্ধ হ'লে, জীবনে নূতন দৃষ্টি নূতন শক্তি আবির্ভূত হবে, এখানে মর্ত্ত্যের নিম্নমুখী স্বভাবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য নিগ্রহনীতি অবলম্বন কর্‌তে হবে না—অমৃতময় জীবনে, সংযমের সজাগ প্রহরী জগতের টানাটানিকে অনায়াসেই জয় করে' ফেলবে—জাতিকে তোল্‌বার জন্য এইরূপ দেবজীবন সর্ব্বাগ্রে লাভ কর্‌তে হবে। সংস্কার প্রবল থাক্‌তে জগতের কোন কাজই নূতন আকারে গড়ে' তোলা যায় না—বাংলার সর্ব্ব-প্রধান কাজ তাই এই দেবজীবন লাভ করা।

আত্মসমর্পণযোগই এই নূতন জীবন লাভের উপায়। সাধনার পথে নরনারীর একত্র চলা অসম্ভব নয়। কিন্তু সংস্কারকে জয় করে' করেই আমাদের এগুতে হবে—সংস্কারের খাদ্য যুগিয়ে যুগিয়ে তাকে পুষ্ট করে' তোলা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়—কি পুরুষ কি নারী তাঁদের মনে রাখা চাই, নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিগত যে দৈহিক মিলনের আকর্ষণ উহা প্রাকৃত জীবনেরই লক্ষণ, দেবজীবনের মধ্যে যে পুরুষ প্রকৃতির যুগলরূপ, উহার আরম্ভ দেহ হইতে নহে—ঊর্দ্ধদেশ হইতে পরস্পর যুক্ত হইয়া মর্ত্ত্যে আত্মপ্রকাশই দাম্পত্যজীবনের চরম সাফল্য।

ধর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়ে নারীজাতির সম্বন্ধকে দৃঢ় করবার জন্য, বাংলায় কুলধর্ম্ম প্রচার হয়েছিল, সে বামাচার তান্ত্রিক সাধনায় নারীজাতির জীবন তেমন উন্নত হয়ে ওঠে নি; পূর্ণজীবন লাভ করতে হ'লে, কি নারী কি পুরুষ সংস্কারের প্রভাবে যে সংযম হারিয়েছে উভয়কেই তা পুনঃপ্রাপ্ত হ'তে হবে। আমরা নারীজাতিকে ভয় করে' চল্‌বো না, পাছে আমাদের পতন হয়; আবার সাহস করে' তাঁদের সামনে দাঁড়াতেও চাই না, এমন পতনের ভিতর দিয়েই উন্নতি দেখা দেবে ব'লে—আমরা একটি তৃতীয় পন্থাই অবলম্বন করতে চাই। আমরা নারীজাতির সঙ্গে নানা সম্বন্ধেই মিল্‌বো; তাদের ভালবাস্‌বো; একত্র অবস্থান করবো—সে কেবল আপনার সংযমকে ফিরে পাবার জন্য। আত্মসংযমের পবিত্র আগুনে শুধু নিজজীবন বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে না, সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির মধ্যেও যে চাপল্য যে স্বভাবের শৈথিল্য এসেছে তা'ও অপসৃত হবে, ঊর্দ্ধজীবনের আকাঙ্খা ও সামর্থ্য জাতির উভয় অঙ্গেই সমভাবে ফুটে উঠবে—নারীর সংস্পর্শে যে জঘন্য সংস্কার প্রকাশ পায়, তা থেকে উভয়কে পরিত্রাণ পেয়েই নূতন যোগের পথে যাত্রা করতে হবে।

সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে সর্ব্বাগ্রে একদল লোককে দাঁড়িয়ে উঠতে হবে, এই নূতন জীবনের পূর্ণ আস্বাদ পাবার জন্য। তারাই বিশ্ব-মুক্তির অগ্রদূত। এই সাধকসমষ্টির মধ্যে নরনারী উভয়েরই স্থান আছে। উভয়েরই দৃষ্টি থাকবে উভয়ের দিকে, কিন্তু এখানে সংস্কারের খেলা আদৌ প্রকাশ পাবে না—থাকবে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, ঊর্দ্ধলোক হ'তে মিলনের তপস্যা। এই ক্ষুদ্র সমষ্টিসাধনার মধ্যে যদি কোথাও এই মিলন সার্থক হয়, তবেই একদিন জাতিগত জীবনে নারীসমস্যা নিরাকৃত হবে।

বাহিরের দিক থেকে কেবল শিক্ষার ব্যবস্থা করলে নারীজাতির সত্য উন্নতি সাধিত হবে না। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নারীজাতির জন্য যথেষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কৈ সেথা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতি আদর্শ নারীচরিত্র? কৈ সেথা পুরুষের ধর্ম্মসাধনার জন্য জীবনোৎসর্গের জলন্ত নিদর্শন?

যুগের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটলেও, যে সনাতন নারীত্বের মহিমায় এই সকল সতীচরিত্র সমুজ্জ্বল, সে কিছুতেই উপেক্ষা করলে চল্‌বে না, এই উজ্জ্বল নারীমহিমার দৃষ্টান্তরূপেই আমরা ইহাদের

নামোল্লেখ করেছি, আদর্শ আজ যেরূপই হউক না কেন, নারীজাতির ভিতরে তাঁদের সত্য স্বভাবটিই প্রকাশ হবে, পুরুষের অন্তরে যে স্বর্গচিত্র থরে থরে বিকশিত হচ্ছে, সে স্বপ্ন একসঙ্গে নারীকেও আপনার ভিতরে লাভ করতে হবে; একজন তার জ্ঞান দিয়ে যে জ্যোতিঃমন্দির এঁকে তুলছে, অপরকে তার শক্তি দিয়ে হৃদয়ের মধুসিঞ্চন করে' সেইটিকেই রূপে রসে মধুর ও সরস করে' তুলতে হবে—পুরুষেরও যেমন, নারীজীবনেরও তেমনি সাফল্য এইখানেই; ইচ্ছা দিয়ে ইচ্ছা, প্রাণ দিয়ে প্রাণ, শক্তি দিয়ে শক্তির সহস্র গুণ বৃদ্ধি করবার জন্যই যেদিন মাতা, ভগ্নী, পত্নীরূপে নারী পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবে, পুরুষের সঙ্গে একই সাধনায় আত্মসমর্পণ করবে, সেদিন মাতৃজাতিও পুরুষোত্তমের পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হবে না।

হে বাংলার নরনারি! আমরা তোমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই নূতন যোগ-মন্ত্রে দীক্ষালাভ করতে বলি, কোটী কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে মাত্র সহস্র নরনারী যদি সংস্কারের প্রভাব জয় করতে শতাব্দী কাল সাধনক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে' অবস্থান করে—সমাজবিপ্লবে দেশ ধ্বংস হবে না; কিন্তু এই সাধকসমষ্টির সিদ্ধিলাভ ঘটলে ভারে ভারে জাতির জীবনে যখন ইহাদের তপঃশক্তি সঞ্চারিত হবে, তখন দেশে নূতন উৎসাহ নূতন রূপ ফুটে উঠবে—সর্ব্বাগ্রে চাই সিদ্ধি, এই জীবনসিদ্ধিই নূতন কার্য্যের প্রতিষ্ঠান—ইহার অভাবে সকল অনুষ্ঠানই ব্যর্থ হবে।

সঙ্কেত

নূতনের কর্ম্মপদ্ধতিটুকু আরও একটু স্পষ্ট করে' তুল্‌তে হবে। সাধারণ জীবনে যে কর্ম্মপ্রবাহ, তার উৎস যেখানেই থাকুক, তার সন্ধান রাখ্‌বার তেমন প্রয়োজন হয় না—প্রেরণাগুলি উপরে উপরে অনুভব করি, উপরে উপরেই চিন্তা করি, তারপর উপর উপর থেকেই কাজটাকে সম্পন্ন কর্‌তে সচরাচর ছুটে যাই। কর্ম্মক্ষেত্রে একা কোন বৃহৎ কর্ম্ম সংসাধন হওয়া অসম্ভব, তাই অনেককে একত্র করে' দল বাঁধাবাঁধিও কর্‌তে হয়, কিন্তু এই কর্ম্মসূত্রে বা আদর্শসূত্রে যে জন-সংযোগ, সে সংহতি শক্তি তেমন দৃঢ়মূল ও অব্যর্থ নয়, কাজেই অর্দ্ধপথে খণ্ডকর্ম্মে ব্যর্থতার আঘাতে সে মিলন নিমেষে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে দুই দিনেই হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। বাঙ্গালীর কোনও ব্রত যে অধিককাল স্থায়ী ও অটুটপ্রতিষ্ঠ হয় না, তার হেতুই এই। আমাদের সাধারণ কর্ম্মধারায় শিকড়টুকু থাকে খুবই উপরে উপরে, অন্তরের গভীর অতলক্ষেত্রে যে কর্ম্মবীজগুলির জন্ম নয়, ভিতরের প্রতিষ্ঠার অভাবে তার বহিঃপ্রকাশ-টুকুও তেমনি টলটল ও ক্ষণভঙ্গুর হবে, সে আর বিচিত্র কি?

* * *

নূতনকে ঠিক এ'র বিপরীত পদ্ধতিতে চল্‌তে হচ্ছে। নূতনের জীবন-যজ্ঞে প্রথম মন্ত্র কর্ম্ম নয়, যত কর্ম্মপ্রেরণাই আসুক, তার দ্রুত প্রবাহে অবগাহন না করে' নূতনকে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হবে, তার ভিতরের উৎসমূলটুকু কোথায়; এ পথে কর্ম্মসিদ্ধির যথেষ্ট বিলম্ব হবে, এমন আশঙ্কা উঠ্‌লেও, সে আশঙ্কা সত্য নয়, চলিত কথায় যেমন শুনা যায় হাজার বার সেকরার ঠুক্ ঠাক্ করার চেয়ে কামারের একটা ঘা মূল্যবান ও ফলপ্রসূ। সহস্র ব্যর্থতার ভিতরে অসিদ্ধ হস্তে শক্তির অপচয় করাই গতানুগতিক কর্ম্মধারা। শিক্ষিতবুদ্ধি আমরা এই ধারার উপরেই আস্থাশীল, বলে' থাকি এরূপ experiment কর্‌তে কর্‌তেই তো শক্তির বৃদ্ধি, জীবনের উন্নতি, অনুশীলনেই তো সাধনার ক্রমোৎকর্ষ—নূতন কিন্তু এই অসিদ্ধ পন্থায় চল্‌তে একেবারেই অস্বীকৃত, শুদ্ধ হস্তে সিদ্ধকর্ম্ম ফুটিয়ে তোলাই নূতনের

প্রেরণা, সে শুদ্ধি সিদ্ধি যতক্ষণ না আধারে জীবনে অবতরণ করছে, ততদিন তার ধৃতি অটল, বিশ্বাস অচ্যুত।

* * *

আমাদের তাড়াতাড়ি নাই, এইজন্যই কেন না সিদ্ধির উপর বিশ্বাসটি হিমাদ্রির মত দৃঢ় ও অটলস্থায়ী। আপনার সিদ্ধির উপরে যে সন্দিহান, ভগবানের সিংহাসন তার অন্তরে অচলপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, চঞ্চল শ্রদ্ধার উপরে যত বড় কর্ম্মমন্দিরই নির্ম্মাণ করি না, ঝঞ্ঝার প্রথম আঘাতেই তার ভিত্তিমূল উপড়ে পড়বেই। জীবন তো আমার তোমার নয়, জীবন ভগবানের, এই জীবন লয়ে ভগবানের অনন্ত বিভূতিই প্রকাশ হবে, আমাদের কাজ শুধু অপরিসীম শ্রদ্ধায় আপনার আধারখানি যন্ত্রের মত তাঁর হাতে ধ'রে দেওয়া। সেই পরমসিদ্ধ মহাযন্ত্রী যন্ত্রটিকে শুদ্ধ সিদ্ধ করে' নিয়ে তাঁর নিত্য লীলা বিস্তৃত করবেন। তাঁর সময়, তাঁর পথ, তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

* *

কর্ম্মের গোড়ার কথা হচ্ছে ভাব; সত্য কর্ম্ম তখনই হবে, যখন আমরা ভাবে সত্য হয়ে উঠবো। সর্ব্বতোভাবেই আমাদের সত্য হয়ে উঠতে হবে—সত্য জ্ঞান তো এইটাই, অহং নয় ভগবান্, আমি নয় তুমি, আমার ভিতর দিয়ে তুমিই আত্মপ্রকাশ কর, এই সত্য মন্ত্রেই জীবনের, প্রতিভার রুদ্ধ সিংহদ্বার ঝনৎকার শব্দে খুলে যাবে। মানুষ ভগবানেরই লীলার আধার, ভগবান্ শুধু অক্ষর নয়, তিনিই লীলার প্রভু নিত্য ক্রীড়াময়, সুতরাং ভাগবতভাবে আপনাকে পূর্ণ করলেও জড়ত্বের আশঙ্কা নেই, তিনি যেমন একাধারে ধীর স্থির শান্ত নির্ব্বিকার, আবার অনন্ত কর্ম্মতরঙ্গে নিরন্তর নিজেই আপনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন—মানুষকেও তেমনি তাঁহারই মত পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। তার গোড়ার কথা হচ্ছে এই, ভগবান্‌কেই অনুভব করতে হবে অন্তরে, আবার সেই অনুভূতির অমৃত-সলিলে আমাদের সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণাগুলিকে চুবিয়ে নিয়ে, সেইগুলিকেও দিব্য ভাগবতময় করে' তুলতে হবে।

* * *

অন্তরের পরতে পরতে তাঁর রসেই যখন আমরা ভরে' উঠতে পারবো, তাঁরই আনন্দের পুলকধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিত করে' তাঁরই আলোকতরঙ্গে

দিবসরজনী নৃত্য কর্‌বো, দেহ দেহই থাক্‌বে, প্রাণ প্রাণই রবে, মন মনই, তবু এই সব আর তাদের পুরাণো জীর্ণ ভগ্নরূপ নিয়ে নয়, একটা অনিন্দ্য অপূর্ব্ব অপার্থিব আবেশে সর্ব্ব শরীর ও মন নূতন দিব্য রূপ পরিগ্রহ কর্‌বে। আমি আমিই থাক্‌লেও সেই পুরাতন পরিচিত আমিটুকু হয়ে নয়—পরন্তু তিনিই আমার অন্তরে আমিময় হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌বেন, তাঁর আপন বিরাট্ জয় আমারই মধ্য দিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্‌বার জন্য—আমার জানার ভিতর দিয়ে তাঁরই জানা অমৃত ঝরণার মত নিরন্তর নিঃসরিত হবে, আমার পাওয়ায় তাঁরই পাওয়া মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্‌বে, আমার সবখানিকে তাঁরই সবখানি দিয়ে কাণায় কাণায় তিনিই ভরিয়ে তুল্‌বেন—নূতন যুগের প্রতি সাধককে এমনই স্বর্গীয় অনুভূতিতে বিভূতিবান্ হয়ে উঠ্‌তে হবে—তবেই এরূপ নবসমষ্টির ভিতর থেকে যে নূতন সৃষ্টির জন্ম হবে, তার আবির্ভাবে পৃথিবী স্বর্গোদ্যানে রূপান্তর গ্রহণ কর্‌বে।

* * *

নূতনের সকল কর্ম্মই এরূপ রূপান্তর, গতানুগতিকার সহিত তার মিল খুব অল্প। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পে ভারতের যে জাগরণ লক্ষণ নানা আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, এই সকলেরই একটী মূল কেন্দ্রকে ঘিরেই সৃষ্টি ও পুষ্টি, সে উৎসমূল হচ্ছে এই ভাগবত অনুভূতি (God-consciousness)—কর্ম্ম হবে এই অন্তর-অনুভবেরই শত সহস্র আত্মপ্রকাশ। নূতন ভাব যেখানে যেখানে স্থান পাচ্ছে, সেইখানেই এই একটি রাগিণীই সুরে স্বরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ছে—ভারতের জীবন-সঙ্গীত অসংখ্য বীণার অসংখ্য ছন্দে তালে বেজে উঠুক, ভারতের ভাগ্যদেবতা আপন অন্তরপটে যে মহাস্বপ্ন দিব্যলেখায় এঁকে রেখেছেন, বাহিরের প্রকাশে এক্ষণে সেইটিকেই প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্তিমান করে' তুল্‌তে হবে। বিজ্ঞানে আজ যাহা জ্যোতির্জ্জ্বল, সুস্পষ্ট, অভ্রান্ত—এইবার জাতির মনে প্রাণে শরীরেও তারই বিচিত্র অভিব্যঞ্জনা চাই।

* * *

ওগো বাংলার তরুণ, কে এখনও পথপ্রান্তে ভগ্নহৃদয়ে অপেক্ষা কর্‌ছ, পথনির্দ্দেশ কি এখনও আপন অন্তরে পাও নাই, আপনার কাছে আপনি এতই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছ, যে আপনার বাণী আপনি শুনতে অক্ষম,

এখনও তো সময় আছে, উৎসর্গ তো স্বপ্ন নয়, জীবনরথে দেবতাকেই প্রতিষ্ঠা কর, তোমার মধ্যে তিনিই প্রকাশ হ'তে চাহেন, জীবনের পরতে পরতে তিনি যেমন যেমন ফুটে উঠ্‌বেন, জীবন মধুময় হয়ে যাবে। যে দ্বন্দ্বে অন্ধ হয়ে আজ পথ নির্ব্বাচনে ব্যর্থকাম হয়েছ, সেটুকুও নিঃশেষে তাঁরই চরণে নিবেদন করে' দাও, পথ তো ছকিয়া দিব না, তোমার আত্ম-প্রতিভার স্বতঃপ্রকাশ তো আমার ছায়াপাতে অবরুদ্ধ কর্‌তে চাহি না, অন্তরের ঠাকুর নিজেই পন্থা আবিষ্কার কর্‌বেন, আত্মনিষ্ঠা হারাইও না; ভিতরে যিনি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান্ হয়ে অহরহ জেগে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হ'লেই সকল রুদ্ধ পথ মুক্ত হয়ে যাবে। সংগ্রাম তো আর মানুষের বাহিরের প্রতিষ্ঠান লইয়া নয়, মানুষের মনকে দিব্যস্পর্শে উজ্জ্বল করে' তোল্‌বার আদেশ পেয়েছি—ঐক্যে, প্রেমে, সম্পদে, গৌরবে মহিমান্বিত এক বিরাট্ ভাগবত সংঘ অচিরে বাংলার বুকে গড়ে তুল্‌তে হবে।

সাধনার কথা

সাধনা অর্থ উপরে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা। সিদ্ধি অর্থ উপরে উঠিয়া এই উপর হইতে সব করিতে থাকা।

প্রথম কথা এই উপরে উঠা অর্থ কি?

শরীরের একটা ভারকেন্দ্র আছে। এই ভারকেন্দ্রের টানে ও ঝোঁকে—ইহারই সম্পর্কে—নিয়ন্ত্রিত হইতেছে দাঁড়াইবার চলিবার ফিরিবার সাধারণ ভঙ্গীটি। শিশু যখন হাঁটিতে শেখে—ওঠে, দোলে, এক পা চলে, বসিয়া পড়ে—তখন সে তাহার এই ভারকেন্দ্রকে ধরিয়া অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র। বিভিন্নস্তরের জীবাধারে শরীরের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে এই ভারকেন্দ্রের স্থানপরিবর্ত্তনের সাথে সাথে। পশুর উচ্চাঙ্গ হইতে নিম্নাঙ্গ ভারী; তাহার ভারকেন্দ্র এই নিম্নাঙ্গের দিকে, তাই সমগ্র দেহটি তার নীচের বাঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ভর করিতে হইয়াছে চারিখানি পায়ের উপর। মানুষের কিন্তু নিম্নাঙ্গ হইতে উচ্চাঙ্গ ভারী, তাহার ভারকেন্দ্র তাই উচ্চাঙ্গের দিকে, তাই সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র পশুর চেয়েও নীচে—মূলের কাছে—তাই সোজা দাঁড়াইতে পারিলেও, সে দাঁড়াইয়াই আছে—উদ্ভিদ অচল।

শরীরের যেমন আছে ভারকেন্দ্র, সেইরকম অন্তঃকরণেরও আছে একটা ভারকেন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, আমরা বলিব এই অন্তঃকরণের ভারকেন্দ্রের প্রতিচ্ছবিই পড়িয়াছে শরীরের উপর, ঠিক করিয়া দিয়াছে শারীরকেন্দ্রের স্থান। শরীরের কেন্দ্র অন্তঃকরণের কেন্দ্রের এক হিসাবে প্রতীক (symbol) আর এক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা স্থাননির্দ্দেশ (localisation), উভয়ই। পশুর অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণে—নাভিস্থলে, মানুষের অন্তঃকরণের কেন্দ্র মনে—মস্তিষ্কে। বানরের অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণের ও মনের মাঝামাঝি—মস্তিষ্ক ও নাভি এই দুইএর মধ্যে উঠানামা করিতেছে, তাই বানরে মানুষ ও পশুর ধর্ম্ম ও প্রকৃতি দুইই দেখিতে পাই, মানুষের

কিছু বুদ্ধিও তাহার আছে আবার পশুর ভোগ ও কর্ম্মসামর্থ্যও আছে, পশুর মত কখন হামাগুড়ি দিয়া চারি পায়ে চলে, কখন বা মানুষের মত মাথা তুলিয়া দুই পায়ে ভর করিয়া চলিতে পারে। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদের অন্তঃকরণের কেন্দ্র অন্তঃকরণের বাহিরে স্থূল দেহে। উদ্ভিদ তাই পাইয়াছে জড়ের ধর্ম্ম যে অচলতা; অন্তঃকরণ থাকিলেও উদ্ভিদ হইতেছে অন্তঃসংজ্ঞ —গুপ্তচেতন।

আধারের মোটামুটি তিনটি কেন্দ্র আমরা দেখিতেছি। তিনটি কেন্দ্র পর পর তিনটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতির বিবর্ত্তনের উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত তিনটি স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে। দেহ প্রাণ মন—উদ্ভিদ পশু মানুষ।

আমাদের কথা উদ্ভিদ বা পশু লইয়া নয়, মানুষকে লইয়া—আমরা তাই মানুষেরই কথা বলিব। মানুষের সমস্ত আধারের ভারকেন্দ্র মনে বা যেখানেই হউক না কেন, তাহার মধ্যে তিনটি কেন্দ্রই আছে, স্ফুট জাগ্রত-ভাবে। যে কেন্দ্র তাহার শুধু দেহকে লইয়া নাড়াচাড়া করে, দেহের ধর্ম্মে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইটির ক্ষেত্র বা শারীর সংস্থান হইতেছে অধঃদেশ হইতে নাভি, প্রাণ-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে নাভি হইতে হৃৎপিণ্ড আর মন-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে হৃৎপিণ্ড হইতে মূর্দ্ধা।

এ কথা কয়টির অর্থ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেহ প্রাণ ও মনের বিশদ অর্থ একটু বুঝিতে হইবে। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে বাস্তবে দেহ প্রাণ মন বলিয়া এক একটি হইতে এক একটি সম্পূর্ণ পৃথককৃত জিনিষ নাই, আছে শুধু ঐ তিনটি লইয়া গড়া জিনিষের মধ্যে একটির অপেক্ষা আর একটির প্রাধান্য। দেহ বলি তাহাকে যাহার মধ্যে প্রাণের ও মনের ক্রিয়া সুপ্ত অর্দ্ধসুপ্ত বা গৌণ—প্রাণ বলি তাহাকে দেহ যাহার অধিগত, মন যেখানে অর্দ্ধস্ফুট বা অস্ফুট—আর মন বলি তাহাকে যাহার অধিকার দেহের ও প্রাণের উপর। কিন্তু সে কথা যাক, তবে দেহ হইতেছে ভোগের আয়তন, প্রাণ হইতেছে শক্তির আয়তন, আর মন হইতেছে চিন্তার আয়তন। দেহের মধ্যে মানুষের আহার মৈথুন, প্রাণের জন্য মানুষের কর্ম্মের চেষ্টা আর মনের জন্য মানুষের জ্ঞানের প্রয়াস। মানুষ প্রথমে চায় শরীরটাকে বজায় রাখিতে, গ্রহণে বর্জ্জনে শরীরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া তাহাকে সরস রাখিতে, তারপর সে চায় খেলাধুলা, চলাফেরা, কাজকর্ম্ম, আবেগে উত্তেজনায়

আপনাকে সতেজ করিতে, পরিশেষে তার আছে একটা কৌতূহল, সে চায় দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে—আপনাকে সজাগ করিতে। মানুষের ভোগৈষণা, কর্ম্মৈষণা আর জ্ঞানৈষণা—এই তিনটি বৃত্তির ক্ষেত্র যথাক্রমে দেহ প্রাণ মন; এই তিনটি বৃত্তি ও এই তিনটি বৃত্তির তিনটি লীলাক্ষেত্র মানুষের আছে।

কিন্তু মানুষ মানুষ, তাহার মনের, তাহার জ্ঞানৈষণার জন্য। সজাগ হইবার আপনাকে জানিবার প্রয়াস হইতেই মানুষের উদ্ভব। আপনাকে জানা অর্থাৎ ক্ষেত্রসমূহের পরিচয় পাওয়া—গীতার কথায়, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হওয়াই মানুষের সাধনার আরম্ভ। মানুষে ও ইতর সৃষ্টিতে পার্থক্যই এই আত্ম-বোধে—মানুষের আছে নিজের সম্বন্ধে চেতনা (Self-consciousness) পশুর আছে শুধু চেতনা, আর উদ্ভিদের এই চেতনাটুকুও গুপ্ত সুপ্ত। মনবুদ্ধির বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে এই আত্মচেতনা।

মানুষ যতখানি আত্ম-চেতন—ক্ষেত্রজ্ঞ—হইতে পারিয়াছে ততখানি সে উন্নত হইয়াছে, তাহার সাধনার ততখানি সিদ্ধি হইয়াছে। এখন, এই আত্ম-চেতনা মানে কি? আত্ম-চেতনার অর্থই হইতেছে ভিতরে একটা ছাড়াছাড়ি ভাব (aloofness) একটা বিভাজন (dissociation) জ্ঞাতা—জ্ঞেয়ের সম্বন্ধস্থাপন। 'আমি জানিব' এই প্রয়াসের মধ্যেই আছে জানার বস্তু হইতে আমাকে পৃথক করিয়া লওয়ার প্রয়াস। সুতরাং আগে চাই 'আমি'র জ্ঞান 'জ্ঞাতা'র উপলব্ধি। তাই সকল মনীষী সকল সিদ্ধপুরুষ সাধকদিগের প্রথম উপদেশ দিয়াছেন নিজেকে জান—Know thyself—আত্মানৈকংজানথ।

এখন নিজের আত্মার সন্ধান কি রকমে কোথায় পাই? সে কথা বুঝিব যদি বুঝিতে পারি সচারাচর সব সময় সে জিনিষটি পাই না কেন। আমি-বোধটি মানুষের সহজ স্বাভাবিক জিনিষ—সব ভাব, সব চিন্তা, সব কাজের সাথে সাথে অন্তরে একটা পৃথক সত্তার চেতনা যেখানে সে ভাব চিন্তা কর্ম্ম সব ঐক্যভূমী পাইয়াছে, যাহার সহিত উহারা গ্রথিত আছে সূতার সহিত মণিগণের মত। এই অন্তরের আমি-বোধটি জাগ্রত চেতনায় সব সময়ে থাকে না, একটি মূল কারণে, চাঞ্চল্য—ভাবের চাঞ্চল্য, চিন্তার চাঞ্চল্য, কর্ম্মের চাঞ্চল্য। ভাবের চিন্তার কর্ম্মের বিক্ষোভে আলোড়নে ভাবের চিন্তার কর্ম্মের পিছনে যে আছে একটা স্থির আমিসত্তা, তাহা ফুটিয়া

উঠিতে পারে না। ভাবে চিন্তায় কর্ম্মে আমরা মত্ত হইয়া যাই, আপনাকে হারাইয়া ফেলি। চিন্তার চাঞ্চল্যের আবার একটা বিশেষ ধরণ আছে। সময়ে সময়ে চিন্তা এই 'আমি'কে ধরিতে বা বুঝিতে চায়। কিন্তু সে চায় বিশ্লেষণ করিয়া, চুলচেরা করিয়া খুঁজিতে। পেঁয়াজের খোসা খুলিতে খুলিতে সে পেঁয়াজ আর খুঁজিয়া পায় না—বনে গিয়া সে গাছই শুধু দেখে, বনটি দেখিতে পায় না। চোখের অতি কাছে সে জিনিষ ধরিয়া দেখিতে চায়, তাই জিনিষ তাহার কাছে আবছা হইয়া উঠে।

সুতরাং সকলের আগে দরকার সমগ্র আধারের একটা অচঞ্চল স্থির সাম্য ভাব। নির্ম্মল প্রশান্তির মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে 'আমি'র সত্তা, আত্ম-চেতনা। তাই পতঞ্জলি বলিতেছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্—চিত্তের বিক্ষোভ সব শান্ত করাই যোগ, তখন দ্রষ্টা-ভাবে সাধক আপনার নিগূঢ় স্বরূপ দেখিতে পায় ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা অবশ্য বলি না আধারের সব খেলা একেবারেই বন্ধ করিয়া দাও; প্রথম অবস্থায় অথবা পরে সময়ে সময়ে ইহার দরকার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা হইতেছে ভিতরে ভিতরে একটা সাম্যের শান্তির সমতার ভাব, বৃত্তি বা বিকারের গাঢ়ঘন সত্তাকে ছড়াইয়া যেন কিছু পাতলা করিয়া তোলা। চিন্তা ভাব কর্ম্ম চলুক যেন বাহিরে বাহিরে, কিন্তু তাহার অপর পৃষ্ঠে ভিতরের দিকে থাকুক একটা প্রসন্নতা, নিশ্চলতা, নিস্তব্ধতা; তবেই ভিতরের আমি-সত্তা ধীরে ধীরে থিতাইয়া পড়িবে, এই সকল হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

এই আমিরই অন্য নাম জীব বা পুরুষ। এই জীব বা পুরুষ যখন দেখা দেয়, আমার মধ্যে আমি-চেতনাটি যখন জাগিয়া উঠে, তখন বিশেষ-রূপে নিরীক্ষণ করিলে বা ধ্যান দিলে একটা গুপ্ত ব্যাপার সহজেই ধরা দেয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে এই জীব বা পুরুষ বা 'আমি' পূর্ব্বে যে কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি তাহার একটা ধরিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকে পুরুষকে বা আমিকে আমি অনুভব করি এই রকমই একটা কেন্দ্রে। যে ধরণের বৃত্তি যখন খেলিয়া উঠে, পুরুষটিও সেই অনুযায়ী কেন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ করে। শারীর-ভোগের প্রেরণা যখন জাগিয়া উঠে, তখন অনুভব করি আমি যেন আধারের প্রথম বা নিম্নতম কেন্দ্রে বিচরণ

করিতেছি—পুরুষ বা জীবটি নাভিকেন্দ্রের নীচে। যখন আবেগের উত্তেজনার উদ্দীপনার সময় অনুভব করি, আমি যেন হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে—পুরুষ উঠিয়া গিয়াছে দ্বিতীয় কেন্দ্রে। তারপর যখন ভাবি, চিন্তা করি, বিচার বিতর্ক ধ্যান ধারণা সমস্তই চলিতেছে মস্তিষ্কে। পুরুষ উঠিয়া গিয়াছে তৃতীয় ক্ষেত্রে, তৃতীয় কেন্দ্রে। ভোগের কর্ম্মের চিন্তার তালে তালে আধারের মধ্যে 'আমি' বা পুরুষ বা জীব এই রকম উঠানামা করিতেছে। অথবা অন্য দিক হইতে দেখিলে আমরা বলিতে পারি, এই জীব বা পুরুষ যখন যে কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে, মানুষও সেইরকম ভাবে ভঙ্গিমায় অনুপ্রাণিত হইতেছে।

আমরা বলিয়াছি মানুষ মানুষ, কারণ তাহার কেন্দ্র মস্তিষ্কে—ভিতরের পুরুষ তাহার আর দুইটি কেন্দ্রে দেখা দিলেও, সব সময়ে সামান্য অছিলায় সে পুরুষ উঠিয়া যাইতেছে ঐ তৃতীয় কেন্দ্রে। মানুষের আপনাকে আপনি দেখিবার বৃত্তি তাহার ঐ তৃতীয় কেন্দ্রেরই সহজ ধর্ম্ম। শুধু দেহে শুধু প্রাণে সে আর থাকিতে পারে না, ক্রমপরিণতি বা বিবর্ত্তনের ফলে এই দুটি সে পার হইয়া আসিয়াছে, সে উঠিয়াছে মনের বুদ্ধির মধ্যে, তাহার পুরুষের স্বাভাবিক আবাস নাভির নীচের ক্ষেত্রে নয়, হৃৎপিণ্ডের নীচের ক্ষেত্রেও নয়—তাহা হইতেছে হৃৎপিণ্ডের উপরে মস্তিষ্কের দিকে। এই উপরে উঠাতেই মানুষের উন্নতি।

মানুষের স্থিতি মনবুদ্ধিতে—মস্তিষ্কে। দৈহিক প্রয়োজন, প্রাণের আবেগ বা প্রেরণা যে বিধান যে গড়ন দেয় মানুষ তাহাতে কখন সন্তুষ্ট নয়। ইতর জীব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ তা নয়। মানুষের নীতি—ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, তাহার শিল্পকলা নীতি—সমস্তই এই একটা নূতন বিধানের প্রয়াস। পুরুষ তাহার মূর্দ্ধাদেশের দিকে উন্মুখী, তাই তাহার মধ্যে একটা সচেতন চেষ্টা চলিয়াছে এই তৃতীয় লোকস্থ পুরুষেরই অনুপ্রেরণায় ভঙ্গিমায় তাহার আধারকে তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়িয়া তুলিতে।

কিন্তু কোন একটি স্তরে পাকা হইতে গেলে, চাই তার উপরের স্তরে উঠিয়া যাওয়া—নিম্নতরটি অধিগত করিতে হইলে দরকার উচ্চতরে প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মনে বুদ্ধিতেই মানুষ যদি একটা সত্যপ্রতিষ্ঠা পাইতে চায়, তবে তাহাকে মনের বুদ্ধির উপরে একটা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হইবে। মস্তিষ্ককে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে যদি চায়, তবে আপনার কেন্দ্রকে ধরিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে মস্তিষ্কের উপরে একটা স্থানে। মন বুদ্ধির উপরে যে একটা বৃত্তি আছে—এ সত্যটী আজকাল অনেকেই মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু মানিয়া লইলে চলিবে না, মন বুদ্ধির মধ্যে ঐ বৃত্তিটির অস্পষ্ট খেলা লইয়া থাকিলে কিছু হইবে না। চাই সেজন্য একটা সাধনা, একটা সজ্ঞান প্রয়াস। এই প্রয়াসের স্থূলমূর্ত্তি হইতেছে আপনাকে, নিজের জীব-সত্তাকে মাথার উপরে একটা কেন্দ্রে তুলিয়া ধরা—অনুভব করিতে থাকা আমি যেন আর দেহে প্রাণে বা মনেও নাই—আধারের অধোভাগে, মধ্যভাগে এমন কি উত্তমভাগেও নাই—আমি আছি আধারের বাহিরে, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে—তুরীয় লোকে। এইটিকে যখন আমার সত্তার—আমার জীবের স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিব, এইখানেই যখন সকল কর্ম্মে ভোগে চিন্তার মধ্যেও স্থির প্রতিষ্ঠিত আছি স্পষ্ট অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই দেখিব কি একটা গ্রন্থী টুটিয়া গিয়াছে, একটা নূতন জীবন নূতন জগৎ আমার ভিতরে ও বাহিরে সৃষ্টি হইতেছে।

আমাদের যোগশাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা আছে এবং ষট চক্র ভেদ করার নামই যে যোগসাধনা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারি। চক্র হইতেছে আমরা যাহাকে কেন্দ্র নাম দিয়াছি—এক চক্র হইতে আর এক চক্রে উঠিয়া যাওয়া, পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে সহস্রার চক্রে মিলাইয়া যাওয়ার নামই সিদ্ধি তাঁহারা বলিয়াছেন।

বস্ত্র-সমস্যা

নূতন পাতা মুকুলিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার নিমিত্ত স্থান করিয়া দিয়া পুরাতন জীর্ণ পত্র ঝরিয়া যায়। এই চারি বৎসর হইতে চলিল বাংলায় কাপড়ের বাজার সমানে আগুন রহিয়াছে, ইহাকে বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের জীর্ণ-পত্রের দশা প্রাপ্ত হইবারই পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া উল্লাসের সহিত মানিয়া লইতাম, যদি প্রাণে সামান্য একটুখানিও উৎসাহের ধ্বংসাবশেষ থাকিত। এখনও রয়টারের টেলিগ্রামের ঘটা দেখিয়া বুঝিতে হইবে, যে, যখন শ্রম ও মূলধনের বিবাদের কোনও স্থায়ী নিষ্পত্তির সূচনা দেখা যাইতেছে না, তখন বিলাতের শিল্প বাণিজ্য পদ্ধতি দিনে দিনে বিশৃঙ্খলই হইতে থাকিবে। যে-ভাবে আবার সব গুছাইয়া লইয়া বসিলে এই মহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া ইংলণ্ড পূর্ব্বের মত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিত, সে ভাবে গুছাইয়া বসা বুঝি আর তাহার পক্ষে সহজ নহে,—শীঘ্র হইবেও না। নিজের যোগ্যতায় সে যে বাজার অধিকার করিয়াছিল, এখন কৃত্রিম রাজনৈতিক চালবাজিতে তাহা রাখিতে হইবে।

আমাদের উৎসাহ নাই, কথাটার মানে কি? মানে এই যে আমাদের জড় মন গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কোনও কিছুই ভাবিতে পারে না। আপনার অপদার্থতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে মানুষ এমনটা হইয়া যায় না। মানুষ ভাবে "আমি ত কিছুই নই, আমার পারিপার্শ্বিকই সত্য! যতটুকু তাহার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারি, ততটুকুই রক্ষা, বেতালে পড়িলেই খোঁড়া হইলাম।" থাকিবার বাড়ীর মত পারিপার্শ্বিকটাকে যে চেষ্টা করিয়াই গড়িয়া লইতে হয়, সময়ে সময়ে মেরামত করিলে তবে সে বজায় থাকে, এ বুদ্ধি আমাদের গিয়াছে।

বস্ত্রসমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতার রাজপথে দাঁড়াইয়া মাড়োয়ারী ও টুপিওয়ালা সওদাগরের বিপুল বাণিজ্য ও ছাপার কাগজে পড়িয়া ল্যাঙ্কেশায়ার প্রভৃতি স্থানের বিশ্বকর্ম্মার কারখানাটা লইয়া, বিপুল বিস্ময়-সাগরের লহরী গণনা করিতেছি। ভাবিতেছি, কোথায়ই বা এই ক্রোড়

ক্রোড় টাকা আর এমন এমন মাথা, শিক্ষা, যোগ্যতা, এ সব কোথায়ই বা পাইব? এমনি ল্যাঙ্কেশায়ার, এমনি কলিকাতা, দৈত্যরচিত স্বপ্নপুরীর মত রাতারাতি না গড়িয়া তুলিলে ত বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইব কেমন করিয়া?

কথাটা বেশ করিয়া বুঝিবার।

আমরা বাঙ্গালী, এই অস্থিজরজর হৃদয়-শোণিতশোষী দারিদ্র্যের দিনে চাই মাত্র একখানি কাপড়। অসূর্যাম্পশ্যা ব্রীড়াময়ী সহধর্ম্মিণী নগ্নিকা। বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ সন্তানগুলি আর্দ্রবায়ু সংস্পর্শে রোগাতুর। স্বয়ং লজ্জা ঢাকিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বাহির হইতে, দিনান্তের অন্নমুষ্টির আহরণে লোকসমক্ষে দাঁড়াইতে, নিজের পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত হইলে, আর যে পারি না, লজ্জায় নুইয়া পড়ি। তাই আমি চাহিতেছি কেবল একখানি বস্ত্র, কেবল আচ্ছাদন মাত্র। আমি ত বিশ্বের বাজারের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চাই না। আমি ত বস্ত্রের ব্যবসায় ফাঁদিয়া কোটী কোটী টাকা রোজকার করিতে চাই না। আমি যে চাই অতি সামান্য, মাত্র আত্মরক্ষা। মাত্র লজ্জা নিবারণ। হায় দুর্দ্দৈব! ইহারই জন্য আমার মাড়োয়ারী না হইলে চলিবে না, বড়বাজার ফাঁদাই চাই। ইংরাজ না হইলে চলিবে না, ক্লাইভ ষ্ট্রীট লাঙ্কেশায়ার চাইই চাই। জাহাজ আমদানি রপ্তানী কল কারখানা বিরাট অনুষ্ঠানের এতটুকু ত্রুটি হইলেই সব যাইবে। সোজা কথা বাঙ্গালী বাঙ্গালী থাকিতে আর আপনার লজ্জা সম্ভ্রম স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত, রক্ষা করিতে সমর্থ নহে! তবে কি বাঙ্গালী বলিলে যাহা বুঝাইত সেটা মরিয়াছে?

এত কথামাজা ছকাছকি কেন? প্রচুর আয়োজন বা বিরাট আন্দোলন না করিলেও, আমাদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক জীবনসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারিব, এমনি সহজ কল্পনা, আর সেই কল্পনাকে লইয়া নামিয়া পড়ার সাহস কাহারও আসিতেছে না কেন?

কেন, তাহার উত্তর আমার হৃদয়-বীণার তারে এই বলিয়াই ঝঙ্কার দিতেছে যে সত্যই যাহারা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে, সত্যই আজ যাহারা উলঙ্গ, তাহাদের প্রাণের যথার্থ কথা এখনও কলিকাতার সংবাদ পত্রে আসিয়া মুদ্রিত হয় নাই। তাহারা ত মার্কা চিনে না, তাহারা ত

রেলির উনপঞ্চাশ, গ্রেহাম, মুখস্থ করিয়া রাখে নাই। তাহারা ত "পরিবার কাপড় দাও"—ইহার অধিক আর একটী কথা বলিতে জানে না। স্বদেশী বস্ত্র সরবরাহ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় কোনও প্রতিষ্ঠানের অভাবই ত আজ এই কষ্ট, কৃচ্ছ্রতা, আর নষ্ট শিল্পটীর পুনরুত্থানের সুযোগকাল বহিয়া যাইতে দিবার কারণ।

এখনও ত বাঙ্গালীর তাঁত বজায় আছে, এখনও ত পুরাতন চরকা জাগাইলেই জাগে। তবে কথাটা সত্য, প্রাণ যদি না জাগে জাগাইবে কে?

বস্ত্রসমস্যা কথাটা যাঁহাদের আবিষ্কার তাঁহারা সহুরে বাবু! যদি কিছু জানিতে বুঝিতে বা সন্ধান লইতে চাহেন কলিকাতারই ছাপাখানা প্রস্তুত Directory অথবা Statistics ছাড়া আর কোনও দিকেই তাঁহারা তাকাইতে শিখেন নাই। ডিবেটিং ক্লাব বা চায়ের টেবিলের বাহিরে গিয়া দেশের সন্ধান লইতে হয়, দেশটা আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই একটা প্রত্যক্ষ বস্তু। ততদূর পর্য্যন্ত ক্রমাভিব্যক্তির পর্য্যায়ে তাঁহাদের স্বদেশভক্তি আসিয়া এখনও পৌঁছায় নাই। তাঁহারা চারি হইতে পাঁচ ছয় সাত পর্য্যন্ত যখন কাপড়ের জোড়ার দাম চড়িয়া বসে, তখন আপনার দিক হইতেই শঙ্কিত হন আর তাহারই ফলে তাঁহাদের উত্তেজনা, আন্দোলন, দেশের জন্য ভাবা। এই ত আমাদের অবস্থা। ইহাতে আর আমাদের বস্ত্র-সমস্যার প্রতিকার হয় কিসে? দেশভক্তের কাছ হইতে patriotism-এর পালপার্ব্বণ খরচা দেশ কত আর আশা করিতে পারে?

যাহারা ব্যবসায়ী, তাহারা লাভের কথাটাই বুঝে, আর কোনও দিকে চাহিয়া দেখা তাহাদের স্বভাব ও সংস্কার বিরুদ্ধ। অবশ্য অস্বাভাবিক নহে। বাণিজ্যের সহিত রাজনীতির সংযোগ না থাকিলে বণিক্ দেশের কথা কেন ভাবিবে? ভারতের বাণিজ্যে যেটুকু রাজনৈতিক সংস্রবযুক্ত সেটুকু দেশীয়ের হাতে নাই, আসিবেও না। ব্যবসায়ীর লক্ষ্য মুনাফা। দুইটাকা জোড়ার বাজারে তিনজোড়া বেচিলে যে লাভ থাকিত, আজ ছয় টাকা জোড়ায় এক জোড়াতেই সে তাহা পোষাইয়া লইতেছে। কাপড়ের দর চড়ায় তাহার সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই, সুতরাং বস্ত্রসমস্যা বিক্রেতার নহে, সম্পূর্ণ খরিদ্দারের।

খরিদ্দারের মাথায় হাত দিয়া হা হুতাশ করা ছাড়া আজ কোনও উপায় নাই। অবশ্য কেন, সে আর বুঝাইতে হইবে না, খরিদ্দার তুমি

আমি সকলেই। আমরা নিজ নিজ অবস্থা বেশই বুঝিতে পারিতেছি। বড় জোর আমরা ইহাই বলিতে পারি যে "বোঝার উপর শাকের আটি মনে করিয়া জোড়া পিছু আর এক টাকা লাগে লাগুক, আমরা তাঁতের কাপড় কিনিয়া পরিব।" কিন্তু জাতীয় চরিত্র জানা আছে। হঠাৎ সে বাজারে তাহিদা জোগানকে ছাপাইয়া উঠিলে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিষম ফাটকা বাজি আরম্ভ হইয়া যাইবে। আট তখন দশ পনেরোতে চড়িতে বিলম্ব হইবে না।

বস্ত্রসমস্যার সমাধান তবেই হইতে পারে যদি দেশের দুরবস্থায় সত্যই মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আর এই বিশাল জনতার প্রত্যেকেই অনুভব করে যে এতবড় একটা সৌখিন বুদ্ধিমান জাতিকে আজ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে লজ্জানিবারণের জন্য হেথায় সেথায় অসহায় ভাবে অন্যের মুখ চাহিয়া রহিতে হইল, এ শুধু দুর্দ্দশা নয়, অপমান। ঘরে যে কষ্ট সহিতেছি তাহা নহে। বাহিরে অবজ্ঞাত হইতেছিও।

আমরা অপদার্থ তা সত্যই, অধিকন্তু অসহায়। এ বিষয়টা খুব ভাল বোঝে বলিয়াই স্বার্থপর বণিক্ লুব্ধদংশনে আমাদের গায়ের মাংস কামড়ে কামড়ে যতখানি চলে খাইয়া লইতেছে। বাঙ্গালী ব্যবসাদারের ভিতরেও এই বণিক্সুলভ হিংস্র বৃত্তি যথেষ্ট আছে, তাহারা দুর্ব্বল, কর্ম্মক্ষেত্রে পারিয়া উঠে না। অন্যজাতির সহিত দ্বন্দ্ব সংঘাতে হারিয়া যায়। বৃদ্ধ বক গলিত মাংসের লোভে ভাগাড়ে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে হাজির হয়, তবে শকুনির পাকশাট মারার বহর দেখিয়া একটু তফাতে থাকে। তাহারও মনের ভাব, খাই। পারিয়া উঠে না ক্ষমতার অভাবে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিয়া ধর্ম্মের মুখের দিকে কোনও জাতিই চাহে না, সত্য কথা। কিন্তু সকলের মধ্যেই community নামক একটা বৃহৎ পরিবার বোধ আছে। ধর্ম্মহিসাবে না হউক, স্বার্থরক্ষার হিসাব কসিতে গিয়া সেখানে তাহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই থাকে। আর এই ধর্ম্মটুকুই তাহাদের উত্তীর্ণ করিয়া দেয়—এইটুকুর জন্যই ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের প্রতি অনুকূল। Communityর বাহিরে গিয়া তাহারা মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া আসে, আর সেই কাড়াকাড়ির মারামারির উপযুক্ত হইবার জন্য communityর ভিতরে তাহাদের পরস্পরকে তুলিয়া ধরিতে হয়, পরস্পরের সহিত মিলাইয়া চলিতে হয়। বাঙ্গালীর বাহিরে যাইবার

সাহস নাই, যোগ্যতাও নাই। তাহার যত মারামারি কাড়াকাড়ি ঘরেই করিতে হয়। গায়ের মাংস যতটুকু ছিঁড়িয়া খাইতে হইবে সে আপনার লোকেরই অঙ্গে দংশনক্ষত উৎপন্ন করিয়া তুলিয়া লওয়া ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর কোথায়? ফল এই, আত্মপুষ্টি সে স্বপ্নাতীত, আত্মরক্ষাও আমরা করিয়া চলিতে পারি না। পারিব না কখনও। যদি না জাতীয় স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয়।

ব্যবসায় হিসাবে বণিকের চেষ্টার দ্বারা বস্ত্রশিল্প উদ্ধার আজ সম্ভব নহে। যোগ্যতায় যে বাজার ইংরাজ বণিক্ রাখিতে অপারক, চালবাজিতেই তাহাকে সে রাখিবে। তাহার প্রাণে আছে বণিকসুলভ লুব্ধতা। বাহুতেও ক্ষত্রিয়সুলভ বল, কিন্তু হৃদয়ে আছে প্রবল জাতীয়ত্ববোধ, যার প্রেরণায় সে জাতির উন্নতি গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আত্মোন্নতির সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বাহুবল দূরের কথা, বুকে এতটুকু সাহসের বল লইয়াও বাঙ্গালী বণিক্ ঘর করে না। ব্যবসায়ী বাঙ্গালী নহে। যখন সে ব্যবসায় করে লোভে পড়িয়াই করে। বাণিজ্যে অর্থাগমের সহিত আর কি কি লক্ষ্য থাকিতে পারে দেশমমত্বশূন্য স্বার্থজর্জ্জরিত বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে তাহা আসিবার নয়। বাঙ্গালী যখন ব্যবসায়ী তখন সে মাত্র লোভী। তাহার প্রাণের সত্য একটী কথা,—ধনলিপ্সা আত্মপুষ্টির জন্য।

বাঙ্গালী বলিলাম বলিয়া শুধু বাঙ্গালীই নহে। বণিক্ মাত্রেই হয়তো এ কথা অল্পবিস্তর প্রযুজ্য। তবে বাঙ্গালীতে বেশী খাটে, কারণ communal ভাবটার এমন সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব সে ভিন্ন আর কাহাতেও নাই।

বণিক কত সতর্কতার সহিত, একগুণ দিয়া সহস্রগুণ পাইবার কত সম্ভাবনা দেখিলে কাজে নামে সে ত জানা আছে। বাঙ্গালীর বস্ত্র-শিল্প উদ্ধারে বণিক্‌প্রবৃত্তিকে তফাৎ যাও বলা ছাড়া আর উপায় কি? যদি অসম্ভব সম্ভব করিয়াও আমরা বস্ত্র শিল্প উদ্ধার করিতে পারি তখন ইংরাজ বণিক্ ছাড়িয়া কথা কহিবে না, এটা ঠিক। তখন তাহার বাহুবলপ্রয়োগ সম্ভাবনাকে, আমাদের তপোবল প্রয়োগেই নিরস্ত করা ছাড়া উপায় নাই। ধস্তাধস্তি চলিবেই। ত্যাগ, তপস্যা, চিন্তা, শ্রম, এই সকলের কোনটাও না লইয়া কেবল বুদ্ধির জোরে কতকগুলি টাকার নাড়াচাড়ায় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে রাশি রাশি অর্থ ঘরে তোলা যাহাদের পেষা তাহারা এ কাজে নামিবে কেন? নামিবে কে? কে

তবে আজ মায়েদের লজ্জা নিবারণ করিবে? বাঙ্গালী শস্যে নীরে মায়ের স্নেহেই পুষ্ট! লোভীর ধনভাণ্ডার বোঝাই করিবার সামর্থ্য ত তাহার নাই। দেশের অর্থের সহিত তাহার প্রাণও যে নিঃশেষ হইয়া আসিল।

সকল দিক তলাইয়া যত দেখিতেছি ততই বুঝিতেছি করিতে এক ভগবান্। সমগ্র জাতির ইচ্ছাশক্তি অন্তর্গুমরিত না হইয়া উঠিলে, আর তাহারই বিপুল আবেগে মূর্ত্ত হইয়া একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে এ সমস্যার সমাধান হইবার নয়, লজ্জাও মুছিবার নয়, সম্ভ্রমও আসিবার নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের স্বাভাবিক জীবনসূত্রকে অবলম্বন করিয়া যদি হয় সেই পথই সোজা। এই বিপুল অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার কুহক না বুঝিলে তাহাকে কি আবিষ্কার করিতে আমরা পারিব? আচ্ছা! এই বিপুল সহরের দৈত্যের কারখানাটাকে কালরাত্রির দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া গিয়া আমরা আবার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারি না কি? জানি, পারি কি না সে মীমাংসা হইবে না। কারণ গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সত্য সঙ্কল্প জাগা দুর্ঘট। প্রাণটাকে সহরে ফেলিয়া রাখিয়া বাক্যগুলাকে গ্রামমুখে প্রবাহিত করা আর গ্রামের মধ্যে প্রাণটাকে সমর্পণ করিয়া সে জায়গাটাকে পুনর্জ্জীবিত করা, দুয়েরই লক্ষণ আমরা জানি। শেষোক্ত লক্ষণচিহ্ন জাতির বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বে কিছুই দেখিতেছি না।

সহরের কল কর্ম্মশালা এই দৈত্যের কারখানা এ সত্যই কালরাত্রির দুঃস্বপ্ন। আমাদের স্বাভাবিক জীবনসূত্র, আমাদের প্রকৃত জাতীয় সভ্যতা অবলম্বন করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। কিন্তু হায়! মনোরাজ্য হইতে এত জঞ্জালমালা অপসারিত হয় কোন্ বলে? যে বলে হইতে পারে, পশুপ্রকৃতির পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয় আমরা তাহাকে ত বিশ্বাস করিতেছি না। পাশ্চাত্যকে এত বেশী স্বীকার করিতেছি যে আপনাকে স্বীকার করি ততটুকু ফাঁকও আর আমাদের মধ্যে নাই। কেবলই আমরা ফন্দী খুঁজিতেছি উহাকে পরাস্ত করিব। কিন্তু করিব কিসের দ্বারা? আমাদের ত আমরা হইয়া উঠিতে হইবে তাহার জন্য? দুর্ভাগ্য এইটুকু, একথা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমরা আমরা হইয়া উঠিতে পারি তখন নিশ্চয়ই দেখিব সংগ্রামের হেতু চলিয়া গিয়াছে, উহাকে পরাস্ত না করিলেও এখন চলিতে পারে। পরস্পর রাজাসীমার নির্দ্দেশে উহার সহিত

একটা সম্পর্ক স্থাপন করিয়াও আত্মরক্ষা সম্ভব।

দেশী তাঁত আজিকার অবস্থায় স্বচ্ছন্দেই বিলাতী মিলের বাজার হাত করিতে পারিত যদি তাঁতির লাভ ব্যবসায়ীর উদরপূর্ত্তিতে না নিয়োজিত হইত। বিলাতের ব্যবসায়ীর লোভ আছে ক্ষমতাও আছে। সে শ্রমজীবীকে পায়ের তলায় চাপিতে জানে। কতকগুলা লাহালকড় জোড়া দিয়া নিসর্গ-শক্তির সাহায্যে দশজনের কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লয়। একটা পেটকে দুনো দিয়া বাকি আটটা পেটের খোরাক নিজের ভাণ্ডারে তুলিতে পারে। দেশী ব্যবসায়ীর সে সামর্থ্য কোথায়? দশটা শ্রমজীবীর পেটের ভার তাহাকে লইতেই হইবে। নতুবা পণ্য উৎপাদন করে কে? এদিকে তাহার লোভ আছে। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার প্রবল বাসনা আছে। দুইটাই একসঙ্গে সম্পন্ন কেমন করিয়া হয়? সে আর বাজারে দাঁড়াইতে পারিবে কেমন করিয়া? প্রতিযোগিতায় হারিবে সে আর বিচিত্র কি?

আজ একেবারে নূতন প্রথায় কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। চাই কর্ম্মী। এমন একদল সন্ন্যাসী যাহাদের সমস্তখানি দেবতার জন্য—দেশের জন্য—যাঁহারা গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া নিরন্ন শিল্পীর ভগ্নবুকে নূতন আশা জাগাইয়া তুলিবেন। যাঁহাদের দৃঢ় ব্যবস্থায় সুকৌশল শৃঙ্খলাবিন্যাসে বাংলার নবজাগ্রত তাঁতিকুল দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে। ব্যবসায়ীর লোভপ্রসারিত হস্তের সহিত সমানে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শ্রমের ফল তাহাদেরই করগত করাইয়া দিবেন। ফন্দীবাজি জিনিষটা তাঁহাদের শাসনে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে।

কাজ শক্ত। শক্ত, কেন না ইহার জন্য চাই অসামান্য হৃদয়বল। সে বল আমাদের গিয়াছে। কিন্তু আমরা নিরাশ নই। আমরা জানি তপস্যাই সকল বলের উৎস—বাংলায় যে নূতন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার হোমানলে তপঃশুদ্ধ একটা নূতন জাতিই জন্মলাভ করিতেছে—প্রকৃতির ক্ষুদ্র পরীক্ষাশালায় যে সাধনা চলিয়াছে, তাহার সিদ্ধিতে অমর হইয়া বাহির হইবেনই এমন দলে দলে কর্ম্মী যাঁহাদের দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। শিল্পী বাঁচিবে, গৃহস্থ বাঁচিবে। সত্যই যাহারা দেশের সার তাহাদের শুষ্ক নাড়ীতে নূতন জীবনস্রোত ফিরিয়া আসিবে। বিরোধ নয়, বিদ্বেষ নয়, প্রতিযোগিতা করিয়া নয়, পরন্তু আপনার তপস্যা দিয়াই বাঙ্গালী আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

জীবের শিবত্ব লাভের উপায়—শ্রীমোহিনী মোহন বসু প্রণীত—মূল্য দুই আনা মাত্র। ঢাকা বারদী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মায়ের আহ্বান—শ্রীমোহিনী মোহন বসু প্রণীত—মূল্য লেখা নাই। ১৬০ নং বাংলা বাজার, ঢাকা হইতে ডাঃ শ্রীশশাঙ্কমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাশ্রম—ভারুকাটী, বরিশাল। ১১শ বর্ষের কার্য্য বিবরণী—আশ্রমের বিস্তৃত সেবা কাহিনী সম্বলিত।

Sir Ashutosh Mukherjee. Life with a foreword by Sir P. C. Ray, D. Sc, Ph. D., C. I. E.

শ্রীফণীন্দ্র নাথ বসু এম্ এ লিখিত। মূল্য মাত্র চারি আনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্তম্ভ স্বরূপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত সচিত্র জীবনচরিত্রটুকু সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিবে।

কান্যকুব্জ চতুষ্পাঠী কোষ—"সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার সমিতির" তত্ত্বাবধানে এই নিবেদন পত্রখানিতে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু—যাঁহার যাহা দেয়, চুঁচুড়ায় উক্ত সমিতির সেক্রেটারী শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরিতব্য।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান—স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত; প্রকাশক দেবী মহাবিদ্যা শ্রীশ্রীদোলগোবিন্দ আশ্রম, পোঃ আঃ জগৎসী, জিলা শ্রীহট্ট। ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক, মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সমিতি ঢাকা কেন্দ্রের বিংশ বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী। জনহিতায় ব্রতী নিঃস্বার্থ কর্ম্মীবৃন্দের শিক্ষা প্রচার এবং সেবাকার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ।

স্বর্গ

তমিস্রা-জঠরে রহি' ফুটি উঠে কা'র
উল্লাসের হাসি, জোর করি আঁখি মুদি'
দিনেরে করিবে তবু নিশার আঁধার ?
ঘৃত্র পুরীষের মাঝি যতেক বিভূতি,

কলুষে তুলেছে যেন প্রতি অঙ্গ কুঁদি।
পাষাণের চাপ বুকে, শৃঙ্খলের ভার
পায়ে তা'র—ওই হের, নির্ম্মম বিচ্যুতি
টানিয়া লইছে ধীরে নিরয়ের পার।

দূরে যাও, পৃথিবীর সান্দ্র আকর্ষণ,
অল্প মাঝে মহাতৃপ্তি ; আমি চাহি
আলো, আকাশের কোলে মুক্ত বিচরণ—

অমৃতের মহার্ণবে আজি অবগাহি
ধুইয়া ফেলিব যত মরতের দাগ,
আমার রহিবে শুধু দিব্য জ্যোতি-রাগ।

প্রবর্ত্তক—৫ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা
৩০এ আষাঢ়, ১৩২৭

মীরা বিশ্বাস

দেশভক্ত চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "দেশ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না"—কিন্তু এই জাগরণ সার্থক হয়, সত্য হয়, যদি দেশের আত্মা জাগিয়া উঠে। আমরা বাংলার জাগরণলক্ষণ প্রতি পদেই লক্ষ্য করিতেছি।

বিশাল বঙ্গদেশ আজ সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার প্রাণ-স্পন্দন, অঙ্গসঞ্চালন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চঞ্চল ও চমকপ্রদ নহে, পরন্তু ধীর ও মন্থরগতিতে আত্ম সম্প্রসারণ করিতেছে। উত্তেজনা ও আড়ম্বরপূর্ণ গতি-ভঙ্গী স্বপ্নময় কুহকের ছলনা—বাংলা আজ আত্মস্থ হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে গন্তব্যের পথে চলিয়াছে, শান্ত সমাহিত হইয়া—ইহাই তো সত্যজাগরণ!

সে কতশত বৎসরের গভীর নিদ্রা! সহসা জাগরণ—কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত ও বিচলিত হইবারই কথা—কিন্তু ইহা তো আর স্বপ্ন নয়, তাই বাঙ্গালী নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অটল পদে দাঁড়াইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে—এ গতি আর রুদ্ধ হইবার নহে।

কোন অবস্থাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার এই নবজাগরণ সম্ভব হয় নাই। সে কত অত্যাচার, কত সমাজবিপ্লব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, কালের নিষ্ঠুর কষাঘাত যুগে যুগে বাঙ্গালীর পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া আসিয়াছে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ কিছুতেই ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যেদিন কোন অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত ঐশী ইচ্ছা প্রবাহাকারে অবতরণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের একটী মানবমূর্ত্তির মধ্যে স্থান পাইল—বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সেদিন নূতন তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। অর্দ্ধ শতাব্দীও শেষ হয় নাই, সে অবিরাম তরঙ্গহিল্লোল নাচিয়া নাচিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া বাংলার আত্মাকে

উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে—জগতের ইতিহাসে এমন ধারাবাহিক ধর্ম্মপ্রবাহ বহিতে কখন দেখিয়াছ কি?

প্রাচীন বৈদিকযুগের মন্ত্রধ্বনি, কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথীর পাঞ্চজন্য—ফুকারিয়া ফুকারিয়া বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ প্রতিধ্বনিত, জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই সঙ্গীতেরই আলাপ আমরা সর্ব্বত্র শুনিতেছি।

বাংলার অসংখ্য ধর্ম্মপুরোহিতগণের কণ্ঠে প্রেম ভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস নবযুগেরই প্রভাত রাগিণী—প্রভু জগদ্বন্ধু, পাগল হরনাথ, ঠাকুর দয়ানন্দ, পাবনায় সৎসঙ্গের মধুচক্র—এ সকলই নব ঊষার উজ্জ্বল সিন্দুররাগ। বাংলায় নূতনের আবির্ভাব দিন দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

আত্মা যখন জাগে তখন সকল দেশেই অনেকের মধ্যে ইহার লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠে—বাংলায় ইহার অন্যথা হইবে কেন? আর এই জাগরণ সংবাদ কেবল দেশের বায়ুমণ্ডলেই আবদ্ধ থাকে না—দেশ দেশান্তরের সাধু ভক্তগণ ইহা অবধারণ করেন।

সম্প্রতি আমরা মাদাম রিশারের কথাই বলিব। ইনি একজন ফরাসী রমণী, অতি বাল্যকাল হইতেই কোন অজানিত শক্তি কর্ত্তৃক ইনি অধ্যাত্ম-জীবন সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আজ জীবন তাঁহার সফল হইয়াছে, কেমন করিয়া হইল, ইহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত বিবরণটুকু পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে—আমরা "প্রবর্ত্তক" পাঠকগণকে ইহা উপহার দিলাম।

আত্মকথা

When and how did I become conscious of a mission which I was to fulfil on earth ? And when and how I met A. G. ?

These two questions you have asked me and I promised a short reply.

For the knowledge of the mission, it is difficult to say when it came to me. It is as though I were born with it, and following the growth of the mind and brain, the precision and completeness of this consciousness grew also.

Between 11 and 13, a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God but man's possibility of uniting with Him, of revealing Him integrally in consciousness and action, of manifesting Him upon earth in a life divine. This, along with a practical discipline for its fulfilment, was given to me, during my body's sleep, by several teachers, some of whom I met afterwards on the physical plane. Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and psychic relation with one of these beings became more and more clear aud pregnant ; and although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna, and henceforth I was aware that it was with him (whom I knew I should meet on earth one day) that the divine work was to be done.

In the year 1910, my husband came alone to Pondicherry where under very interesting and peculiar circumstances he made the acquaintance of A. G. Since then we both strongly wished to return to India—the country which I had always cherished as my true mother-country—and in 1914 this joy was granted to us.

As soon as I saw A. G., I recognised in him the well-known being whom I used to call Krishna ... ... and this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him, in India.

MIRRA RICHARD.

অনুবাদ

পৃথিবীতে আমি যে একটা কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কবে ও কি ভাবে হইল? কখন ও কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়?

এই দুইটি প্রশ্ন আপনি আমাকে করিয়াছেন, সংক্ষেপে উত্তর দিব প্রতিশ্রুতি আমি দিয়াছি।

কাজটি সম্বন্ধে জ্ঞান যে আমার কবে হয় তাহা বলা কঠিন। এটি যেন মনে হয় জন্মেরই সাথে পাইয়াছি; বয়সের সঙ্গে মনবুদ্ধির সামর্থ্য যেমন বাড়িয়াছে, এই চেতনাটিও তেমনি স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।

এগার হইতে তের বৎসর বয়সের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক জগতের ধারাবাহিক কতকগুলি উপলব্ধির ফলে ভগবানের অস্তিত্বসম্বন্ধে জ্ঞান পাই, আরও জানিতে পারি যে মানুষ ভগবানের সাথে মিলিত হইতে পারে, জ্ঞান ও কর্ম্মে তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধরিতে পারে, একটা দিব্যজীবনে তাঁহাকে এই পৃথিবীতেই প্রকট করিতে পারে। এই জিনিষটি আর ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি সাধনা আমার শরীরের সুপ্তিকালে কয়েকজন উপদেশকের কাছে আমি পাই—তাঁহাদের কয়েকজনের সাথে পরে স্থূলজগতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারপর বাহিরে ও ভিতরে যেমন বাড়িয়া উঠিয়াছি ইঁহাদের একজনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তেমনি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। তখন ভারতের দর্শন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু ইঁহাকে আমি কৃষ্ণ নাম দিই। তবে তখনই আমি জানিতে পারি যে ইঁহার সাথে স্থূলজগতে আমার একদিন দেখা হইবে, ইঁহারই সাথে মিলিয়া ভগবানের কাজটি আমাকে করিতে হইবে।

১৯১০ সালে আমার স্বামী একাকী পণ্ডিচারীতে আসিয়াছিলেন। তখন এক কৌতূহলকর ও অদ্ভুত ঘটনাচক্রে শ্রীঅরবিন্দের সাথে তাঁহার পরিচয় হয়। আর তখন হইতে আমরা স্বামীস্ত্রীতে দুইজনেই ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হই—আমি ত ভারতবর্ষকে চিরদিনই আমার প্রকৃত মাতৃভূমি বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। ১৯১৪ সালে এই সৌভাগ্য আমাদের হয়।

শ্রীঅরবিন্দকে যখনই আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তখনই চিনিতে পারিলাম যে তিনি হইতেছেন সেই, যাঁহাকে আমি কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলাম। ..... এইটুকুতেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন কেন আমার দৃঢ়ধারণা যে আমার স্থান ও কর্ম্ম তাঁহারই পাশে, ভারতবর্ষে।

দেব-বাণী

(১)

অন্ধকারের হেতু আমরা নিজেরাই।
অন্ধকার আমাদের চোখের সংস্কারমাত্র।
অহঙ্কারের বাহিরে অন্ধকার নাই।

* * *

রাত্রি বলিয়া কিছু নাই।
আমাদের অজ্ঞানের ছায়া হইতেছে রাত্রি।
অতি-আলোককেই আমরা নাম দিই অদৃশ্য।

* * *

মানুষ নিজের রাত্রির সাথে মিশ খাইয়া চলিবার যে চেষ্টা করিতেছে তাহারই নাম জড়-বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান সৃষ্টিরহস্যকে প্রসারিত করিতেছে মাত্র।

আলোক যত ছড়াইয়া পড়ে, তাহার চারিদিকের অন্ধকারের পরিধিও তত বাড়িয়া যায়।

* * *

জিনিষের উপর চিন্তা যে ছায়া ফেলে তাহারই নাম জানাশুনা।

দিব্য-সূর্য্যকে ঢাকিয়া মন আমাদের দিতেছে ছায়া। মন যতক্ষণ স্বচ্ছ না হইয়া উঠিতেছে, যতক্ষণ সে এক রকম লোপই না পাইতেছে ততক্ষণ জিনিষের উপর সে তাহার ছায়াই ফেলিবে।

মন সব জিনিষ ধরাইয়া দেয়, দেয় না শুধু যে জিনিষ তাহার বাহিরে।

* * *

ওগো, জ্যোতির সন্তান! মনকে ছাড়াইয়া যাও, ছায়ার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও।

সাবধান! বিদ্যুতের আলো যদি ধরিতে না পার, লও তবে বজ্রের আঘাত।

(২)

সব উন্নতির অন্তরাত্মা হইতেছে অন্তরাত্মার উন্নতি।

প্রকৃতি দেখিতে চায় জীবের ঊর্দ্ধমুখ—অধোমুখ নয়।

প্রকৃতির ভাবনা কি হইবে তাহা লইয়া, কি ছিল তাহা লইয়া নয়।

* * *

সমস্ত সৃষ্টি ফুকারিয়া কাঁদিতেছে—মানুষের রাজপাট আর সে বহন করিতে পারিতেছে না।

যাহাকে তুমি সৃষ্টি বল, সেই হইতেছে স্রষ্টা।

প্রকৃতির অবিরল প্রয়াস মহৎ হইতে মহত্তর স্রষ্টাকে সৃষ্টি করা।

* * *

সৃষ্টি শেষে হয়ত আদি স্রষ্টাকেই জন্ম দিবে—তখনই সৃষ্টির কান্না থামিবে, স্রষ্টাও বিশ্রাম লইবেন।

কিন্তু সেই প্রথম সৃষ্টি করিয়া বিধাতা যে বিশ্রাম লইয়াছেন সে বিশ্রামের দিন যে শেষ হইতে চায় না!

বিধাতার এই বিশ্রামে ধরিত্রী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে!

* * *

অভ্যাসের পরিণতি প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আরম্ভ অভ্যাস।

এই বিশ্বের পুরাতন অভ্যাস যত, তাহাকেই বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্রাকৃতিক নিয়মের সংস্কার—ভবিষ্যৎযুগের দেবতাদিগের ইহাই শাসননীতি।

* * *

ভবিষ্যতের কারণ বর্ত্তমান—কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় সত্য; বর্ত্তমানের কারণ ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ হইতে কেহ কেহ আসিয়া থাকেন—বর্ত্তমান তাঁহাদের অন্তরায়।

অতীত হইতে যাহারা আসে, ভবিষ্যৎ তাহাদের বিভীষিকা।

* * *

আপন অক্ষমতার জন্য ভবিষ্যতের মানুষকে আমি শিশুর মত কাঁদিতে দেখিয়াছি ..... কিন্তু যে শক্তি অদৃশ্য অঙ্কুরকে বৃহৎ বিটপীতে পরিণত করে, যে প্রেরণা অজ্ঞাত ঝরণা হইতে বিপুল নদকে বাহির করিয়া আনে, যে দেবতা সব দুর্ব্বলতাকেই মহাবলে ভরিয়া তুলেন, তাঁহারা সকলে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিল।

শেষ ঋতুতেই তরু সব মুকুলিত হইতে থাকে, সেজন্য তাহারা কি দুঃখ করে?

বর্ত্তমানের যশকে তুমি আলিঙ্গন করিতে চাও, কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যতের ব্রতের তুমি ব্যভিচারী হইতেছ দেখ না?

* * *

জগৎ যদি তোমাকে বিদ্বেষ করে, তার অর্থ তাহাকে জয় করিবার ক্ষমতা তোমার আছে।

পর্ব্বত যদি সচল হইত, তবে পর্ব্বতকেও মানুষ বিদ্বেষ করিত।

সকলের উপরের চূড়াটিতেই পড়ে প্রথম আলো আর প্রথম বাজ।

* * *

নক্ষত্র যত উচ্চ, তাহার আলোকও তত অতীতকাল হইতে আসিতেছে।

অন্তরাত্মাও যত উচ্চ, তাহার আলোক তত ভবিষ্যৎ হইতে আসিতেছে।

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে ছুটিয়া চলিতে আমি অনেক মানুষকে দেখিয়াছি। কিন্তু কে তুমি ঊষার আলোক দেখিতে চাও, চল বিপরীত দিকে চল।

Paul Richardএর
মূল ফরাসী হইতে অনূদিত

যোগ-রহস্য

ঊর্দ্ধ দেশ হইতে যে কর্ম্মপ্রবাহ নামিয়া আসিতেছে—বাঙালী জাতিকেই উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্ম্ম মানুষের ক্ষুদ্র বাসনা অথবা ইচ্ছাসম্ভূত নহে, একেবারেই সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষোত্তমের মঙ্গল ইষণা। যাঁহারা ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহেন—তাঁহাদিগকে যোগের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া তদনুযায়ী জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

যোগ বলিতে আমাদের মনে যে সকল অলৌকিক রহস্যের কথা উদয় হইত—যেরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করিতে হইত—ইহা তদ্রূপ নহে, বরং তাহার বিপরীত। এ যোগে করিতে হয় না কিছু—কিন্তু মনে রাখিতে হয়—এবং দ্রষ্টাস্বরূপ দেখিয়া যাইতে হয়—ভগবান্‌কে ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীকে।

যোগ আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান। বুদ্ধি দিয়া ইহা আয়ত্ত করিতে হয়—অন্তঃকরণ দিয়া উপভোগ ও প্রাণ দিয়া উহার সত্য স্বরূপটিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয়। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মই এই ত্রিধারা—যাহার ভিতর দিয়া ভগবান্ আপনাকে অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিয়া তুলেন।

জগতের প্রতি অণু পরমাণুটীও পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে—কিন্তু যে সকল যন্ত্রসহযোগে সেই শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ অনন্ত সত্তা মর্ত্ত্যের বুকে তাঁর মঙ্গল রাগিণী ঝঙ্কারিয়া তুলিবেন, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে ঐ সকল সমস্যা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। জগতের যাবতীয় পদার্থই যেন মানুষ গড়িবার উপাদান, মানুষই মূর্ত্ত যন্ত্র, যাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া ভগবান্ অসীমের গান গাহিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

আমরা ভগবান্‌কে নানা ভাবে পাইতে পারি। কিন্তু তাঁর সবখানিকে জীবন দিয়া অনুভব করিতে না পারিলে জীবন আমাদের সার্থক হইবে না। আর জীবনের সৃষ্টিই হইতেছে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপটীকে প্রকাশ করিবার জন্য। তাই আমরা দেখিতে পাই—মানুষের জীবনে ভাগবত অনুভূতি

চলিয়াছে স্তরে স্তরে, ধাপের পর ধাপ অধিরোহণ করিয়া। প্রথম, ভগবান্ আমাদের জীবনে অনুভূত হইয়াছিলেন একেবারেই বিশ্ব হইতে পৃথকরূপে—কোন এক বৃহত্তর মহত্তর সত্তারূপে। মাঝে মাঝে যদিও মনে হইত—আমরা ভগবান্ হইতে পৃথক নহি, এই সসাগরা পৃথিবী সৌরজগৎ সকলই তাঁহাতে বিধৃত, কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে বিধৃত নহেন। জগদতীত পরম বস্তু সেই ভগবান্—স্বর্গেই তাঁহার স্থান।

ভগবান্ যে স্থান কালের অতীত এমন ধারণা তখন আমরা করিতে পারি নাই, অথচ পৃথিবীর মধ্যেই তাঁর সবখানি গুটাইয়া আছে, ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ ক্ষুদ্র কল্পনাও আমাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই, তাই তখন সাধনার উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গপ্রাপ্তি। তারপর আমাদের ধারণা হইল—তিনি অক্ষর, তাঁহাকে আবৃত করিয়া অবিদ্যার এই মায়াজাল বিস্তার—তিনি দ্বন্দ্বাতীত নির্ব্বিকার; এই পরমাত্মাকে পাইবার জন্য মানুষ তখন মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ সাধনেই প্রয়াসী হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে মায়াবাদের প্রভাব এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ আরও নিকটতর হইয়া উঠিল—যখন তাহারা ধারণা করিতে পারিল—ভগবান্ জীবের অন্তরে অন্তরে, তিনি জগদতীত হউন, আর জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই থাকুক, তিনি সাক্ষীস্বরূপ জীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করিতেছেন—তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথাও যাইতে হইবে না—আত্মসাধনার ফলেই তিনি প্রকাশ হইয়া পড়িবেন।

এইখানেও ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ পাকা হইয়া উঠে নাই। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে পাইবার জন্য মানুষকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিতে হইয়াছে—কেননা এক্ষেত্রেও ভগবান্ ভাবময়—তাঁহাকে বস্তুগত করিয়া ভাবিতে মানুষ রাজী হয় নাই।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি ভগবান্ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা অবধারণ করিতেছি উহা কেবল ভগবান্‌কে জগদতীত বলিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, অথবা জগৎ তাঁর ইচ্ছাতেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ভগবান্ নিরাকার তুরীয় সত্তা মাত্র, এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াও আমাদের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত নহে, তিনি জীবের হৃদয়ে ভাবরূপে অবস্থান করিয়া জগৎ-লীলা উপভোগ করিতেছেন—এইরূপ ধারণাও প্রকৃত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না।

আমরা অনুভব করিতে চাহি তাঁর সবখানি আমার মধ্যেই অবস্থিত, তিনি এবং আমি ইহার মধ্যে কোনই ভেদ নাই। কেবল আমার ভিতরেই যে তিনি এরূপ নহে। জগতের প্রতি পদার্থের মধ্যেই তিনি নিত্য বিরাজিত। জগৎ মায়া নহে, জগৎ এবং জগদতীত সকল পদার্থই পুরুষোত্তমের স্বরূপ। তাঁহাকে পাইতে হইলে যাহা কিছু আছে তাহার মধ্যেই পাইব, জীবন ছাড়াইয়া কোথাও যাইব না, জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

এই জ্ঞান আজিকার নহে। ইহা এত প্রাচীন যে মানুষ আজ ইহাকে একেবারেই নূতন বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। এই যে স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাগবত অনুভূতি ইহার প্রত্যেকটীরই আবশ্যকতা আছে। জগৎ তাঁহাতে বিধৃত, কিন্তু তিনি জগতের নহেন, জগৎ হইতে বৃহত্তর মহত্তর পরম ব্রহ্ম, এই জ্ঞান মানুষের মনে আংশিক জ্ঞান ও ভক্তি উদ্রেক করিয়াছিল। তাহার পর, ভগবান্‌কে পরমাত্মারূপে পাইবার জন্য সংসার মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে ভারতের সাধককে একাধারে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ফলে আজ আমরা বুঝিয়াছি ভগবান্‌কে পাইতে হইলে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে হইবে। জ্ঞান বুদ্ধির, ভক্তি মনের, কর্ম্ম প্রাণের বিকাশ। এই বিকশিত বুদ্ধি মন প্রাণের সাহায্যে ভগবান্‌কে পাওয়া অসম্ভব হইবে না, এইরূপ আশা বাঙালীর মনে স্থান পাইয়াছে। এক্ষণে নবীন সাধকদের কেবল বুঝিতে হইবে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য আর সাধনা নহে, ভগবান্ আমাদের সবখানি এবং তিনি প্রকৃতির উপর ভর করিয়া তাঁর সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকে আমাদের মধ্যেই প্রকাশ করিয়া তুলিবেন। তিনিই প্রকাশ হইবেন জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে। আমরা বিপরীত ভাবে সাধনা করিতেছিলাম, উহা কেবল অন্তঃকরণগুলিকে সমধিক বিকশিত করিয়া তুলিতে; এক্ষণে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে অটুট ধৈর্য্য সহকারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সেই পুরুষোত্তমই জীবনের প্রতি খেলায় আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। অজ্ঞানতাই তাঁহার অসীম জ্ঞান প্রেম শক্তি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন বোধে ক্ষুদ্র সামর্থ্যের পরিচয় দিতেছিল; জ্ঞানপ্রকাশে আমরা দেখিতেছি আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, আমাদের প্রেম ভক্তি, আমাদের কর্ম্ম শক্তি উহা আর আমাদের নহে, সেই অসীম স্বয়ং অজস্রপ্রবাহে এই ত্রিমার্গে উচ্ছ্বসিত আকারে প্রকাশ হইতে চাহেন। যে জ্ঞান যে প্রেম যে কর্ম্ম আমাদের জীবন দিয়া

উৎসৃত হইবে উহা আর শেষ হইবে না, ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে না। অহং-কারের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দাও, ভগবান্ চিরদিন ধরিয়া টোকা মারিতেছেন, আজ তাঁর ইঙ্গিত আমরা বুঝিয়াছি, মানুষ এবং ভগবান ইহা কেবল অজ্ঞানতার ফল। আত্মচৈতন্য চির জাগ্রত হউক, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান উহা অপসারিত কর, দেখিবে জীবন তোমার ভাগবতময় হওয়াই স্বাভাবিক—এতদিন যে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে উহাই ছিল অস্বাভাবিক, জীবনের বিরুদ্ধ যাত্রা।

নারী-সমস্যা

নদীর জল যে রকমই হউক না কেন, সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্রে মিশিয়া তাহা একই লবণজল হইয়া উঠে। নারী যেমন হউক না কেন, পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষেরই স্বভাবকে প্রতিফলিত করিয়া গড়িয়া উঠে।

আমার ভিতরে শক্তি বলিয়া একটি জিনিষ আছে। আমার কর্ম্ম আমার প্রেরণা, আমার আবেগ, আমার আকাঙ্খা, আমার ভাব, আমার চিন্তা সমস্তই সেই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমার অন্তরাত্মার যে গতি তাহাই সেই শক্তির টান। আমার ভিতরে এই যে শক্তি বাহিরে তাহারই নাম নারী।

শক্তির ধর্ম্ম টান—আমাকে টানিয়া উর্দ্ধেও তুলিতে পারে, টানিয়া নীচেও নামাইতে পারে। আমার অন্তরাত্মা কোন্ মুখে? উপরের দিকে সে তাকাইয়া আছে কি? আমার সমস্ত শক্তিও তবে নিয়োজিত হইবে অন্তরাত্মাকে উপরের দিকেই তুলিয়া ধরিতে। কোন অবস্থায় কোন সময়ে নামিয়াও আসিতে পারি বটে, কিন্তু শক্তির সে ক্ষণিক অধোগতি অন্তরাত্মারই প্রয়োজনে। উত্থান ও পতন—উত্থানেরই জন্য; রাত্রি ও দিবা—আলোকেরই জন্য। দেখিতে দুইটির দুই রূপ কিন্তু উভয়ের মন লক্ষ্য এক—রাত্রৌযসা সমনসা বিরূপে।

আবার আমার অন্তরাত্মার গতি কি নীচের দিকে? আমার আত্মা কি সতৃষ্ণ নয়নে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে?- স্থির জানিও শক্তি তাহাকে লইয়া চলিবে একেবারে নিরয়ের চরমপ্রান্তে—উচ্চ ভাব উচ্চ চিন্তা তাহাকে কখন আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কঠোর মুনিঋষিদের যুগব্যাপী তপস্যাকেও মিথ্যাচার বানাইয়া প্রাকৃত মানুষ, পশুর তুল্যই করিয়া ফেলিবে। আমার অশক্তিতেও শক্তির শক্তিই প্রকটিত হইতেছে।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্ব্বৃদ্ধিঃ প্রদাগৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে॥

একান্ত জড়বাদী যাঁহারা তাঁহারাই বলেন জড়েরই আকর্ষণ আছে—কিন্তু জ্যোতির আকর্ষণ নাই কি? মাটীর টান আছে, আবার স্বর্গেরও টান আছে। কোন্ দিকে চলিব, জিজ্ঞাসা কর অন্তরাত্মাকে। অন্তরাত্মায় জাগিয়া আছে জড় না জ্যোতি, মাটী না স্বর্গ? শক্তি কার্য্য করিবে সেই অনুসারে, শক্তির শক্তিতে সেই কার্য্য দ্বিগুণ শক্তিতে সম্পন্ন হইবে। শক্তিকে দোষ দিও না।

আমার ভিতরে নামিবার শক্তি আছে, উঠিবারও শক্তি আছে, নামিবার শক্তি আছে বলিয়াই উঠিবারও শক্তি আছে। নারীর নামাইবার শক্তি যেমন আছে, তাই তাহার মত উঠাইবার শক্তি আর কিছুরই নাই। আমার অন্তরের দেবতা যাহা চাহিতেছে, নারী ঠিক সেই অনুযায়ীই তাহার সম্মুখে ভোগের সামগ্রী সাজাইয়া ধরিতেছে। সার্সী (Circe) মানুষকে পশু বানাইত, বেয়াত্রীস (Beatrice)এর চিন্তা দান্তেকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছিল। নারীর পদাঘাতে রাজ্য ধ্বংস হয়, পৃথিবী মরুভূমি হইয়া উঠে—সেই নারীরই স্পর্শে অশোক তরু মুকুলিত হয়, কবি কালিদাসের কবিত্ব ফুটিয়া উঠে। সাধক চণ্ডিদাসের সিদ্ধিলাভ হয়।

পুরুষের অন্তরাত্মা যাহা চায়, নারী তাহার অবলম্বন জুটাইয়া দেয় মাত্র। অবলম্বন দূর করিয়া দিতে পার, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মার গতি ফিরাইতে পার না। সকলের আগের কাজ এই অন্তরাত্মার মুখ ফিরান, শুধু অবলম্বন সরাইতে থাকিলে, অন্তরাত্মা মুখ ফিরাইবে না, সে কেবল মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে—অবলম্বন সরাইতে সরাইতেই তোমার জীবন কাটিয়া যাইবে—সাধনাই করিতে থাকিবে, সিদ্ধি আর আসিবে না।

পুরুষের ভাব যে রকম, প্রকৃতিও সেই ধরণেই গড়িয়া উঠিবে, পুরুষের ভাব অনুসারেই প্রকৃতির কর্ম্ম।

আমাদের ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক বা জাতীয়জীবনে এই সত্যেরই প্রমাণ দেখিতেছি। ভারতের অন্তরাত্মা যেদিন ছোট হইয়া গেল, নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল, সেইদিনই তাহার প্রথম ছবি পড়িল ভারতের নারীসমাজের উপর, সেইদিন হইতে নারী হীনবল হইয়া অবরোধের অবগুণ্ঠনের মধ্যে—লজ্জাতেই যেন—মুখ লুকাইতে লাগিল। পুরুষ যত সন্ন্যাসের দিকে ছুটিয়া চলিল, নারীকে নরকের দুয়ার বলিয়া ভাবিয়া লইল, নারীকে অপমান করিয়া দূরে সরাইয়া দিল, নারীও বাস্তবিক ততই

দূরে সরিতে লাগিল, পৃথিবীকেই আঁকড়িয়া ধরিল—সে শুধু ভোগবিলাসেরই সামগ্রী হইয়া পড়িল; এই দিক দিয়া—এই অশক্তির দিক দিয়াই তাহার শক্তি ফুটিয়া উঠিল। রঘুকুলের অভ্যুদয়ের দিনে দিলীপের মত পুরুষ সুদর্শনার মত নারীকেই পাইয়াছিলেন—অধনতির দিনে অগ্নিবর্ণ ছিলেন যেমন, নারীর মধ্যে তিনি তেমন দেখিলেন শুধু—যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তনক্ষোভ।

পুরুষ ও নারীকে কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিলে, ফল এই রকমই হইবে। দুই চারিজন পুরুষ আর দুই চারিজন নারী চক্ষু বুজিয়া কোন রকমে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ নারী সুতরাং বেশীরভাগ পুরুষ প্রাকৃত ভোগায়তনের মোহেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। পুরুষ নারীকে যেমন ভাবে, নারী প্রথমে সেই রকমই হয়, তারপর পুরুষ নিজেই সেই নিজের বুনা জালে আসিয়া ধরা পড়ে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কেহ জিতিয়া যাইতে পারে না। বিদ্রোহের যে শক্তি তাহাও প্রকৃতিরই শক্তি—সুতরাং বিদ্রোহী হইয়া তুমি নিজের শক্তিকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিতেছ, এক ভাগের বিরুদ্ধে আর এক ভাগকে দাঁড় করাইতেছ, ইহাতে শক্তি তোমার অর্দ্ধেক হইয়া যাইতেছে মাত্র। প্রকৃতির পুরা শক্তিকে শুদ্ধভাবে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, আগে পুরুষের নিজের চাই ভিতরে একটা শুদ্ধি, স্থির সাম্য। শিবদৃষ্টি যাহা দেখিতেছে, কালীশক্তি তাহাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতেছে। এই অমল ধবল শিবভাব অন্তরাত্মায় লইয়া এস তুমি, পুরুষ; নারীর উপর বিরুদ্ধভাবের কোনই প্রয়োজনীয়তা তুমি অনুভব করিবে না।

ভীষণ জোর করিয়া যখন নারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহার অর্থ আমার ভিতরে অগোচরে একটা ভীষণ বুভুক্ষা নারীর দিকে প্রধাবিত। তলে তলে একটা বিকট আকর্ষণ আছে বলিয়াই, বাহিরে এই বিকট বিকর্ষণ। নারীকে শুধু দোষ দিলে কি হইবে? নারী তোমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে, করিতে পারিতেছে কেন? তোমার ভিতরে লোভ আছে বলিয়াই। নিজে আগে এই লোভ পরিত্যাগ কর; দেখিবে সব ঠিক হইয়া আসিতেছে নারী তোমাকে আর লুব্ধ করিতেছে না, তোমার অন্তরাত্মার রসই সে জোগাইতেছে।

কিন্তু লোভ পরিত্যাগ করা অর্থ লোভের বিষয়কে পরিত্যাগ করা নয়। এইখানেই আমরা মস্ত ভুল করি। বিষয় হইতে দূরে দূরে

থাকিলেই যে ইন্দ্রিয়ের লিপ্সা খসিয়া পড়িবে এমন কোন কথা নাই। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্, ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। যাঁহারা মনে মনে এই রকম না'ও স্মরণ করেন, তাঁহাদের লিপ্সা স্তিমিত সুপ্ত হইয়া থাকে মাত্র, অন্ততঃ এই সম্ভাবনাই বেশী। সে গুপ্ত লুপ্তপ্রায় লিপ্সা সহসা জাগিয়া প্রলয়কাণ্ড করিয়া ফেলে, যদি তাহার সম্মুখে কোন রকমে আবার সে বিষয়ইন্ধন একবার আসিয়া পড়ে। এ রকম পদস্খলনের উদাহরণ বিরল নয়।

নারীকে সহজ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলেই চোখের মোহ কাটিতে থাকে। পুরুষ নিজেকে মনে করে সহজ স্বাভাবিক, কিন্তু নারীর চারিদিকে কি একটা প্রহেলিকার ছায়া বিনাইয়া দিয়া নারীকে কিম্ভূতকিমাকার জীব করিয়া তুলে—কখন বা স্বর্গের দেবী বলিয়া দূর হইতে প্রণাম করে, কখন বা নরকের কীট বলিয়া খেদাইয়া দেয়। কিন্তু বাস্তবিক এ রকম অস্বাভাবিক আতিশয্যের কোন প্রয়োজন নাই। আমি যেমন সহজ স্বাভাবিক নারীও তেমন সহজ স্বাভাবিক—আমার মধ্যে যে ভাগবত সত্তা আছে, নারীর মধ্যেও সেই একই ভাগবতসত্তা। একজন ভোক্তা আর একজন ভোজ্য, একজন অগ্নি আর একজন ঘৃত অথবা একজন বুদ্ধ আর একজন 'মার', একজন খৃষ্ট আর একজন শয়তান এই সম্বন্ধ পুরুষ ও নারীর সহজ সম্বন্ধ নয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই সাধক, একই লক্ষ্যে একই পথে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে—এইটিই ত তাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। স্বাভাবিক ছাড়িয়া যখন আমরা অস্বাভাবিকে যাইয়া পড়ি তখনই সকল দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের দুর্দ্দশার আরম্ভ।

নূতনের আদর্শ

সনাতন নূতনের নব সাজে যুগে যুগে ত মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে। তাহারই পুণ্যপ্রপাতপ্রক্ষালিত মলকলুষমুক্ত মানব আত্মবিচ্ছিন্নতা বিক্ষিপ্ততা পুনরাবলোকনে কালের ভাঙ্গা, হৃদয়রসে যোড়া দিতে যুগধর্ম্মে বার বার কালোপযোগী সভ্যতা গড়িয়া লইয়াছে।—এ ত পুরাতন তথ্য। অস্বীকার অসম্ভব।—তবে কেন ভয়? তবে কেন কুণ্ঠা? তবে কেন সচকিতে চাওয়া, ত্রস্ত গুরু গুরু কম্পিত হৃদয়ে আদর্শের পথে মৃদু ধীর অনিচ্ছায় পদক্ষেপ? নব্যতান্ত্রিক, সহস্র বর্ষের অধীনতা তোমার হৃদয়তন্ত্রী বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, তাই এই অস্বাভাবিকতা? গাঢ় ঘুমঘোর স্তব্ধ নিঝুম রাতে যদি তোমার রুদ্ধ ভবনদ্বার কাঁপিয়া উঠে কোনও প্রিয় হতে প্রিয়তর প্রবাসী বন্ধুর করাঘাতে?—গৃহপুষ্ট সারমেয় সে ত তারে চিনিবে না, সে ত চীৎকার করিয়া উঠিবেই তারস্বরে! হায়! নিদ্রিত, কাহাকে বিশ্বাস করিলে শ্রেয়ঃলাভ করিবে তখন, আপনার চক্ষু—না তাহার চীৎকারকে? আত্মহৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া দেখত, প্রতিবাদী রক্ষণশীলতার কণ্ঠনিনাদ,—কাহার তুলনা হয় তাহার সহিত? তস্কর বিতাড়ন কার্য্যের তরে যাহাকে পালন করিতেছ, বন্ধুকে তোমার তাহারই চীৎকারে যদি খেদাইয়া দাও, তারপর দূষিবে কাহাকে? সাবধান! সে তির্য্যক প্রাণীকে দায়ী করিও না, তাহার ত সকল কাজই সংস্কারবশে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নহে। অভ্যাস পরিচালিত হইয়া।

নূতনের নব্যতন্ত্রের উপাসককে এই আত্মহৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণের উপযুক্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে। আমাদের প্রচার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। নবতন্ত্র জগৎকে "বিশাল সভ্যতা" দান করিবে। "বিশাল চিন্তাস্রোত সাঁতারিয়া পার" হইতে হইবেই তাহার মন্ত্রদ্রষ্টাদিগকে।

"পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে পার্থক্য কি?"—এই প্রবর্ত্তক হইতেই একটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—"পুরাতন চাহে সবখানি ধার করিয়া টেঁকিয়া থাকিতে আর নূতন অন্তরের সিদ্ধসম্পদে মর্ত্ত্যের বুকে

নূতন রাজ্য নির্ম্মাণ করিতে চায়।" হায়রে দুরাশা! ধার করিবার আর কি কিছু আছে? ভারতের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম সমস্তই আজ যে নিঃশেষিত। ধর্ম্মকে ধরিয়া অসাড় স্থিতিশীল এই জীবন হইতে জীবনযাত্রার পথে আবার না বাহির হইলে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধসম্পদের আবার না সঞ্চয় করিলে, আবার নির্ম্মাণ না করিলে আমাদের জাতির জীবনীশক্তি আর যোগাইবে না, আমরা অন্তর্দ্ধান মার্গেই অগ্রসর হইয়া চলিব।

নির্ম্মাণ ত্যাগ ও ভোগকে সমশৃঙ্খলে বাঁধিবে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে নূতনের এই আদর্শ পুরাতনের প্রভাবস্পৃষ্টমনে প্রচুর বিভ্রম ও বিস্ময় আনিয়া দিতে পারে সে সম্ভাবনা আমরা যথেষ্টই দেখিতেছি। কিন্তু কেন? কালের তাণ্ডবঃ নৃত্যের অসংলগ্ন পদক্ষেপ যে ধ্বংসলীলা প্রকটিত করিতেছে সে কি উপেক্ষা সম্ভব? সে দৃশ্য কোনও ছাপ আঁকিয়া দেয় না এমন মনে চেতনার পূর্ণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ—সত্যই। পুরাতনের প্রভাবস্পৃষ্ট এই ত বলিবেন—"আমরা ত্যাগবাদী, পাশ্চাত্য ভোগবাদী, আমরা আমরা, তাহারা তাহারা। দুয়ে মিলন অসম্ভব। নূতনের মত পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি, সুতরাং অসংযত মস্তিষ্কের সৌখীন খেয়াল। সে উপেক্ষারই যোগ্য।" কিন্তু এমন শ্রেণীর গোঁড়ামি ত আমাদের আমাদের বলিয়া দাবী করা চলে না। পাশ্চাত্যের Kipling ও ত তবে দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। তিনিও ঠিক অমনি কথা বলিয়াছেন। বরং উঁচাইয়াই গিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত উদ্দেশ্য অন্যরূপ। সেইজন্যই কাল আজ মানব সংস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয় জাতিরই বাহিরের দিকটা আজ কালের পেষণে চূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্তরটা আবিষ্কৃত হইয়া তাহাদের পরস্পর পরিচয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক যে স্থাপিত হইবে না কে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে? ত্যাগ ও ভোগের একতার জন্য একটা সামঞ্জস্য তখন আসিবেই। ঘটাইবেন ভগবান।—সেই গীতোক্ত "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটাই আমরা স্মরণ করিতেছি। প্রাণও কেমন চঞ্চল। হৃদয় অহেতুক আবেগে উদ্দাম।

বিশ্বের ধর্ম্মগুরু ভারতবর্ষকে যে পাশ্চাত্য জীবনপ্রভাব শতাব্দীদ্বয় ব্যাপিয়া এমন আচ্ছন্ন অভিভূত রাখিল এ অঘটন বিশ্বনিয়ন্তার আজগুবি খেয়ালের বশে ঘটে নাই। ইহার উদ্দেশ্য আছে, ইহার সত্য আছে, ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে।—এ পরাজয়ে নূতন লজ্জিত নহে। পদাহত উচ্চত্বের অভিমানসঙ্কুচিত পুরাতন অপেক্ষা সে কিছু কম মাত্রায়

Sentimental. এ মনোবৃত্তি যে অস্বাভাবিক। চক্ষে যে দেখিতেছি; পাশ্চাত্যের প্রভাব মনকে যে দিকে বাঁকাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত করিতেছে, মুখে হতশ্রদ্ধা প্রত্যাখ্যান করিলেও কালের চাপে (Atmospheric pressure) ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতে হইতে অবশেষে আমরা ঠিক সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইতেছি। এই ত মুখে বলিতেছি ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছাচার! কাজের বেলায়, দেশের বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া স্বাস্থ্যের উপর এমন চাপ দিতেছে যে প্রাণ রক্ষার্থ ম্লেচ্ছ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া ম্লেচ্ছের ঔষধ পথ্যের সহিত তাহার আহার আচ্ছাদনেও অভ্যস্ত হইয়া বসিতেছি। দুধ ঘি ছানা মাখনের প্রশংসা মুখে, কাজের বেলায় বলকর আহার্য্যগ্রহণ প্রয়োজন হইলে মুর্গি মটনের দিকেই লুব্ধদৃষ্টি। ছোট ছোট বিষয়গুলিও যে উপেক্ষা করিবার নহে। আর শুধু ছোটতেই ত নয়।—কোন্ দিকে না আমরা আজ আধা খৃষ্টান? অপ্রস্তুত হইবার কিছুই নাই। ভারতের আত্মা বিশ্বের মুক্তির বাণী অন্তরে লইয়া এতদিন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে এ যদি সত্য হয়, তবে, বিশ্বের কর্ম্মগুরু পাশ্চাত্যের সহিত তাহার এমনি করিয়া খানিকটা মিলমিশ হওয়া, একটু হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অনৈসর্গিক নহে। উত্তেজনা একদেশদর্শিতা শূন্য হইয়া স্থির ভাবে দেখিলে প্রতীতি হইবে ভাগবত উদ্দেশ্যই ইহার মূলে আছে। ভারতের এতখানি কর্ম্মতৎপরতা কোনও দিনই দেখিব না, যে, ভারত আপনাকে আপনি জাতি হিসাবে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে সম্প্রসারিত করিয়া সমগ্র মানবকে অমৃত দানে অমর করিবে। এ কার্য্যে যে সক্ষম, যাহার বৈশিষ্ট্যে তাহার উপযোগী গুণ আছে,—ভগবান্ তাহাকেই বরণ করিবেন। সে যদি পাশ্চাত্য হয়—তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা যতই থাকুক, ভাগবতবিধান সম্পাদিত হইবেই। আমাদের অভিমান তাহাকে ঠেকান ত দূরের কথা আমাদের আপনাকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। কাল পেষণে পেষণে নিষ্পিষ্ট চূর্ণ করিয়া আমাদের বাহিরের সমস্ত খোলস ঘুচাইয়া তাহার সহিত আমাদের অন্তরতমের আমাদের আত্মার মিলন করাইবেনই। দেশাচার শ্লথ হওয়া লোকাচার পরিবর্ত্তিত হওয়া ভগবানেরই বিধান। ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সমন্বয় ঘটাইতে, ভোগের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া ত্যাগের আদর্শ বরীয়ান করিতে ও ত্যাগের সংস্পর্শে ভোগকে মধুর সুন্দর স্বাস্থ্যকর করিতে ভারত আর ইয়োরোপ বক্ষে বক্ষ সমন্বয় হইয়া কিছুদিনের মত অবস্থান করিবেই।

এ মিলনের ফলে ভারত ইয়োরোপ হইয়া যাইবে এ সিদ্ধান্ত ভুল। ইয়োরোপকে কেহ ভারত করিয়া দিবে এ আশাও অতিরিক্ত দুরাশা। কোন্ স্মরণাতীত অতীত যুগে চৈতন্যস্পর্শে আত্মা যেদিন মানবে মানবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিন, সে সত্যযুগে, ভারত বিশ্বকারণের সেই লীলাটুকুর অংশ পাইয়াছিল, তাই সে আজ ভারত। বিশ্বকারণ উদ্ভাবিত লীলান্তর রহস্যে তেমনি করিয়াই ইয়োরোপও আজ ইয়োরোপ। হে আর্য্য! ভারতসন্তান! জানিও ভাগবত গরিমায় তাহারও শুভ্র ললাট উদ্ভাসিত। আজ জড়ের মধ্যে বিশ্বকারণের লীলাবিলাস। মানবের শক্তি তাহারই মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সেই বিকাশের লীলারঙ্গ-ভূমিরূপে ইয়োরোপের মানবসমাজই আজ পরিপুষ্ট উন্নত বর্দ্ধিত। আজিকার যজ্ঞে তাহারাই যে পুরোবর্ত্তী সে এই নিয়ন্তারই নিয়োগফল। সেদিন ভারতের কর্ম্মশালায় গড়িয়াছিলেন আত্মা, আজি এখানে গড়িতেছেন তিনিই প্রাণ। আমাদের দিয়াছেন Spirit, তাহাদের দিতেছেন might. —এতদুভয়কে সংমিশ্রিত করিয়া যদি কিছু গড়া তাঁহার উদ্দেশ্য হয় ভারতে ইয়োরোপে মিশিবেই। উভয়ের মিলনে দুজনের বিশেষত্বের সংমিশ্রণে নবজাতি নব সভ্যতা গড়িয়া উঠিবেই। সহস্র সহস্র বর্ষের স্পর্দ্ধিত শির ভূমিতলে চাপিয়া ধরিতে এই যে ইয়োরোপের might সর্ব্বদিকেই ভারতের ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া পড়িতেছে কে বলিতে পারে কি ইহার অন্তর্নিহিত ভাগবত উদ্দেশ্য? কে বলিতে পারে এই নবাঙ্কুরিত সৃষ্টি, নব্যতন্ত্র, অবশেষে শাখাপল্লব সমেত বিকশিত হইয়া কি দাঁড়াইবে!

নব্যতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত সে চাহে না ইয়োরোপের ভারতের উপর এই বর্ত্তমান অস্বাভাবিক Suppression. সে হৃদয়ের মধ্যেই বলসঞ্চয় করিয়া দিনে দিনে অসমসাহসে সাহসী হইয়া উঠিতেছে।—ইয়োরোপকে সে ছাঁটিয়া ফেলিবে না তাহাও ঠিক। সে সত্যপূত দৃষ্টির ব্যবহার শিখিয়াছে। দেখিয়াছেও ভারত সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়োরোপের কতকটা ন্যায্য Authority.

এটা অন্ধ অনুকরণ চেষ্টার ফল নহে। প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ জাগারই নিদর্শন। হুড়মুড় করিয়া পাশ্চাত্যের প্লাবন ভারতের ঘাড়ে পড়িল,—ভারত প্রস্তুত ছিল না। সে হটিতে হটিতে এইখানে আসিয়াই রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানেই সে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে।

আর এ ঘটনা ত অতীতের ইতিহাসজ্ঞের অপরিচিত ঘটনা নহে। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর, মুসলমান প্লাবনের পর,—কালে কালে হিন্দুসমাজ এমন নব নব রূপে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেই। এ লীলা সনাতনের পরিচিত লীলা। এমনি করিয়া কতবার ত যুগধর্ম্ম স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। যত গ্লানি যেখানে জমিয়া ভারতের জীবনাধারে ধর্ম্ম অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল সব ধীরে ধীরে নিঃশেষে পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। এও তাই। এবারে তেমনি করিয়াই নূতনের প্রতিষ্ঠা, অন্তর-পুরুষ, সব্যসাচীর মত অব্যর্থ শরসন্ধানে ঘর ও বাহির দুইই নিষ্কণ্টক করিয়া দিবেন। ঘরের ব্যাধি আর বাহিরের আক্রমণ দুইয়ের প্রভাবকেই অতিক্রম করিয়া সবল হইয়া উঠিয়া আজ আমাদের বাঁচিতে হইবে। অতীত অধ্যাত্মবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার ফলে ভারত আবার সেই দুই সহস্র বর্ষের পুরাতন গিরিগুহা উৎকীর্ণ শিলালিপির দেশ হইবে না। সে এক সম্পূর্ণ অভিনব সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে, অতীত ভারতের সহিত যাহার পিতাপুত্র সম্পর্ক কল্পনা করিতে পারি। নব্যভারত বিগত ভারতের ছায়াচিত্র নহে।—তাহারই অন্তর্গূঢ় মর্ম্মপ্রেরণা তাহারই প্রাণের নিবিড় ইচ্ছাশক্তির উপর বর্ত্তমান যুগের ফলান রঙে রঞ্জিত এক প্রাণময় জীবন্ত আলেখ্য।

সেই জীবন্তের আবির্ভাবের পথস্রষ্টা আমি নূতন,—নির্ম্মাণ আমার প্রাণের মন্ত্র। হৃদয়ের মধ্যে ভাগবত অনুভূতি (God consciousness) প্রেরণার বান ডাকাইয়াছে। আমার জীবন আত্মনিঃসৃত উল্লাসে উল্লসিত হইয়া যে অর্থ প্রকাশিত করিয়া যাইবে সে ত বাধায় বাধা মানিবার নয়, সে কি কখনও ভয়ে স্তব্ধ হয়? ত্যাগ ও ভোগের গতানুগতিক ছিঁচকাঁদুনে তাহার কাছে চিররুগ্ন দুর্ব্বলের শঙ্কালাপ! প্রলাপভাষণ। আমার গতিভঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে উছলিছে এ নূতন উল্লাস। নিয়ন্তা ভগবান্। প্রাণের নিবিড় ইচ্ছাশক্তি যে আলেখ্য পাইয়াছে তাহাকে ধরাবক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে যদি দিতে হয় কিছু, তবে বক্ষপঞ্জর বিদারিয়া আপন করে হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া উৎসর্গ করিব।—তাহাতেও ম্রিয়মাণ কুণ্ঠিত নহি। আবার যদি নরকেও এমন কিছু থাকে যাহার সহিত যুক্ত হইতে পারিলে তাহারই বিকাশোপযোগী বলে বলীয়ান হই, মহা উল্লাসে তবে ঝাঁপাইয়া পড়িব সেই প্রজ্জ্বলিত তাহার জ্বালাময় রৌরব বাহুশিখায়। আজ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই আমার মিলাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, আমি যে নির্ম্মাণের

ভাবোন্মাদে ছাপাইয়া গিয়াছি। এ গতির জীবন স্থিতির সে সশঙ্ক সপ্রশ্ন সঙ্কোচনমুখী মনস্তত্ত্বকে আর চিনিতেই পারে না।

আমার নবোন্মেষিত দৃষ্টি সে প্রত্যক্ষ করিতেছে একটা বিরাট জগৎ-ব্যাপী ধাঁধা। সত্য কথা বলিতে কি ত্যাগ ও ভোগ দুইটা কথাই চির-কাল ভারতের ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর মনে বিচিত্র সংশয় জাগাইয়া আসিয়াছে। নির্ম্মাণের মন্ত্রগৃহীতা নব্যতন্ত্রের উপাসক সে বিবেকের মানদণ্ডে তৌল করিয়া সকল কথা উচ্চারণ করিবে, ত্যাগ এ কথা তাহার মুখে বাঁধিয়া যাওয়াই সম্ভব। ভাঙ্গার ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া এই অকালপক্ক ত্যাগের মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার ফল সত্যই বিভ্রমজনক। আমরা এখনও ত্যাগ বুঝিতে পারি নাই। বুঝিয়াছি বৈরাগ্য।—খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি বৈরাগ্যই সত্য। ত্যাগ তাহারই একটা প্রকাশভঙ্গী। ভোগের বিপরীত একটা কিছু মানসিক ভাবভূমি নাই যাহার নাম ত্যাগ। যেটা বৈরাগ্য হইতে স্বতন্ত্র আরও কিছু। যেটা জগদতীত। যে চোখ বুঁজিয়া নাক টিপিয়া জগৎ মিথ্যা কথাটার মানে বুঝাইতে বসে।

বৈরাগ্য জগতের নয় বলা চলিতে পারে যদি বলা যায় যে বৈরাগ্য স্বর্গের। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বৈরাগ্য দৃষ্টির সম্মুখে আর এক অর্থে প্রকাশিত মাত্র। জগৎ মিথ্যা বলিতে সে জগতের এই আপাতঃ প্রতীয়মান অর্থকেই মিথ্যা বলিয়া বুঝে। এটা কিছু নয় বলিতে বৈরাগ্য একটা স্তব্ধতা একটা হৃদয়বৃত্তির ক্রমানুশীলনসাপেক্ষ সঙ্কোচ বুঝে না।—সে এগুলার সত্যকার অর্থ বুঝিতে ব্যগ্র। এগুলার প্রয়োজন কোন্ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, কি ইহাদের মূলগত উদ্দেশ্য, সে তাহারই সন্ধান জানিতে তৎপর। তাহার দৃষ্টিতে বালকের কৌতূহল, সে ক্রমাগতই বুঝাইয়া চলিয়াছে এগুলা কি। এই বৈরাগ্য যাহাদের মধ্যে জাগে তাহাদের হৃদয়ের গঠন এমন বিচিত্র হইয়া যায় যে তাহার সংস্পর্শে কোথাও আর সংঘাত বাজিয়া উঠে না। সামঞ্জস্যমুখী প্রতিভার স্ফুরণ করিয়া সে বহুকে একের শৃঙ্খলায় বিচিত্রকে সমাবেশের সৌহৃদ্য আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে উন্মুখ। সে এই জীবনেরই একটা জীবনাতীত অর্থ প্রকাশ করিতে থাকে। জীবনকে অস্বীকার করে না। নিজে জীবনশৃঙ্খলার বাহিরে গিয়াও দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সেথা হইতেই এমন একটা নির্দ্দেশ দিতে থাকে যে তাহার ফলে জীবনস্রোত আরও বিপুল এবং উদ্দাম বেগেই

ছুটিতে থাকে। জীবনীর হ্রাস নয়, বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এ বৈরাগ্য আত্মলব্ধ সামগ্রী। এ বৈরাগীর ত্যাগ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সরল সহজ-সাধ্য। কোনও পরিচ্ছদ বিশেষ কোনও সম্প্রদায় বিশেষ বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি বিশেষের সাধ্য নাই যে এ জিনিষ কাহারও মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারে। আবার লোপ করিতেও পারে না। জগতে প্রলোভন বলিয়া যে একটা কথার সৃষ্টি হইয়াছে সে ওই কষ্টকল্পিত অকালোদ্গত ত্যাগ কথাটারই প্রতিক্রিয়া।

তারপর ভোগ। ভোগ যদি মিথ্যা হইত তবে দেহ ভোগায়তন হইয়া সৃষ্ট হইত না। বিশ্বস্রষ্টা প্রস্তরের ন্যায় কোনও অসাড় পদার্থও মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিতেন। প্রকৃতি ভোগ বলিয়া যে প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে জাগাইয়াছেন দেহধারণের জন্য যখন তাহার সার্থকতা সুস্পষ্ট, তখন গতানুগতিকের প্রভাবে, তৎসম্বন্ধে এই উপচিত লজ্জা,—এ যদি যুগধর্ম্ম প্রভাবে কতকটা শ্লথ হইতে চায়, দোষ দিতে পারি না। পাশ্চাত্যের প্রভাব বলিয়া নাসিকা সীটকানর পরিবর্ত্তে, বরং চোখ মেলিয়াই দেখিব। তাহার দৃষ্টান্তটা কি? চোখ বুজিব না।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ হিন্দু ভোগবাদী অধ্যাত্মবাদী এই সব বড় বড় কথাগুলা উচ্চারণের সহিত যে একটু স্পর্দ্ধা ও সংস্কারে আমরা জড়ীভূত হইয়া আছি সেটুকু ভগবানের দয়ায় যদি কোনও দিন অপসারিত হইয়া যায় তখন দেখিব বোধশক্তির একটু ইতর বিশেষ হইয়া গিয়াছে। অধ্যাত্মজীবন ভারতের সাধনা বটে ও বৈশিষ্ট্যও বটে, ভারতের monopoly নহে। বৈরাগ্য জিনিষটা পৃথিবীর অপরাপর দেশেও মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেখানকার মানুষের মধ্যেও সংযত সংজ্ঞাশীল চৈতন্যের অমর সত্তায় উদ্বুদ্ধ নরনারী জন্মগ্রহণ করে। বাহিরের আচারের খোলস ছাড়াইয়া যদি দেখিতে শিখি দেখিতে পাইব অন্তরের ভাবে উভয় জাতিরই মহৎ অন্তঃকরণ কত এক।

নূতনের আদর্শ নির্ম্মাণ। সেই অতীত ভারতের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য নূতন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। যে সভ্যতা বর্ত্তমান যুগের সহিত মিশিতে পারিবে। ভালয় মন্দয় তাহার সহিত এক হইবে। আপনার হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া অন্তরের অমৃত মন্দাকিনীর সলিল সিঞ্চনে

তাহার অন্তর ধৌত করিয়া দিবে। পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবে তাহার সমস্ত অশুদ্ধ বৃত্তিকে। গড়িয়া তুলিবে তাহারও কল্পনারাজ্যে আপনার অন্তর-দেবতার অপূর্ব্ব স্বর্ণমন্দির।

জান কি তরুণ দেবসাধক পৃথিবীর মহামানব আজ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছে এই এমনই একটা গঙ্গাপ্রপাতের অবতারণার জন্য? অলস নিশ্চেষ্ট হইও না। জড়তাময় হৃদয়স্তম্ভ ভেদ করিয়া ফেল। নৃসিংহ-গর্জ্জনে, ঐ কান পাতিয়া শোন, তোমার অন্তর দেবতা হুঙ্কারিতেছেন। তাঁহারই রুদ্র গর্জ্জনে জগৎ জাগিবে বলিয়া। বাহির এই নব সৃষ্টিকে বিচূর্ণিত করিবে না। ভয় অন্তরকে। সেইই সঙ্কুচিত করিয়া দিবে সঙ্কল্পকে। বার বার তাহারই আকুঞ্চনে। সেইই কেবল গতানুগতিক প্রমাদ দিনে দিনে ঘটাইতে থাকিবে।

আপনার আত্মা ভারতের অপরিচিত নহে। বাহিরের কোন্‌টা বলাধান করিবে কোন্‌টা দুর্ব্বল করিবে সেটুকু চিনিয়া লইবার মত মস্তিষ্কসম্পদ্ হিন্দুর আছে। Spiritএর সহিত mind মিশিয়াই নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। এই মিশ্রণ ব্যাপারে কোন্‌টা উপাদান কোন্‌টা আবর্জ্জনা তাই লইয়াই তর্কাতর্কি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে কি পারিতেছি না যে তর্ক একদিকে, তুমুল মীমাংসার কোনও সম্ভাবনাই নাই। ও দিকে প্রকৃতির কর্ম্মশালায় নীরবে কাজ চলিতেছে, অর্জ্জন বর্জ্জনে ভবিষ্যৎ জাতির একটা আদরা outline টানা এক রকম শেষ হইয়া আসিল।

চাই কর্ম্মযোগে সিদ্ধসম্পদের সঞ্চয়। জাতীয় জীবন আজ যে একটা নূতন ভঙ্গিমায় ফিরিয়া দাঁড়াইবে সে নিশ্চয়ই। বহুযুগ হইতেই এতদিন আমরা সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগে জীবন ধারণ করিতেছিলাম। সুতরাং বিশ্বের কর্ম্ম কোলাহলে আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহারই ছিল বিচিত্র। আজ আমাদিগকে সরল হইতে হইবে, সোজা হইতে হইবে, সুবোধ্য হইতে হইবে। আপনার অগাধ সম্ভ্রম একটু খর্ব্ব করিয়া সকলের সহিত নিজের একটা সামঞ্জস্য নির্ণয় করিতে হইবে। তা যদি না পারি কোনও দিনই আমরা পৃথিবীতে পরিচয় দিতে পারিব না আপনার আত্মার। বরং দিনে দিনে আজিকার আবহাওয়ায় যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাতি বাঁচিয়া থাকে সেই প্রাণের অনস্তিত্ব বশতঃ দিনে দিনে স্তিমিত হইতে স্তিমিততর হইয়া অবলুপ্ত হইব।

নবশক্তি

কেবলই ভাবনা—শেষ নাই, সীমা নাই, আমার প্রাণ যেন বাংলার সুপ্ত-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—বাংলার আকাশে বাতাসে আমার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত, শ্বাসে প্রশ্বাসে সেই অফুরন্ত জীবনীশক্তি লইয়াই আমি বাঁচিয়া আছি—বাঙ্গালীজাতির আত্মা আমার আত্মার মধ্যে সংগোপিত—বাঙ্গালীকে আমি জাগাইব।

যোগমগ্ন দেবসাধক বাংলার জন্য ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চক্ষু মেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বাংলার যে নূতন সৃষ্টি, উহাই আদর্শ সৃষ্টি, বিজ্ঞানের কল্পদৃষ্টি দিয়া উহাকে এইবার একেবারে নিখুঁত করিয়া রচিয়া তুলিতে হইবে। চাই জ্বলন্ত অনলপিণ্ডের মত সহস্রটি শক্তিধর আধার—যাহারা নূতন বিজ্ঞানমন্ত্রে বাংলায় অমর দিব্যজীবনের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিবে—সহস্র যোগী, সহস্র আত্মনিবেদিত সন্ন্যাসী—পাইব না কি? আমার এই প্রলয়ঙ্করী ক্ষুধা মহাকালী নিশ্চয়ই মিটাইবেন—অসীম ধ্যানসমুদ্র মন্থনে বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎচিত্র আমি যে দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

যোগকে আজ শরীরগত করিয়া তুলিবার সাধনা চলিয়াছে। দৃঢ় কায়াপ্রতিষ্ঠান না পাইলে ঝটিকাবর্ত্তের মত বাংলার বুকে যুগান্তর আরম্ভ কেমন করিয়া হইবে? চাই কেবল বিশ্বাস, অটল অচল শ্রদ্ধা—আর সব আপনি আসিবে। শ্রদ্ধামান তরুণের দল! তোমাদের তো আজ কিছুরই জন্য ভাবনা নাই; অতি জঘন্য প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও অসীম যোগশক্তি প্রকাশ হইবে—ধর্ম্মজীবন ও প্রাকৃত জীবন, স্বর্গ ও পৃথিবী ভিন্ন নয়, উভয়ের মূলেই সত্য আছে, আনন্দ আছে, কেবল সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন—সেই নিগূঢ় রহস্য দিন দিন স্ফুটতর করিয়া তুলিবার আদেশমন্ত্র

পাইয়াছি। বাঙ্গালীকে পূর্ণজীবন লাভ করিতে হইবে।

অহঙ্কার দূর হইয়া যাক। শুধু উৎকট অশুদ্ধ রজঃপ্রভাব নয়, সাত্ত্বিকতার বিমোহিনী সৃষ্টিও চূর্ণ বিচূর্ণ হউক—আবার নূতন রচনা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নূতনকে আজ নিবিড় হইতে হইবে, নিরেট হইতে হইবে, অমর শক্তিতে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ভরাট হইয়া উঠিতে হইবে। বৈচিত্র্যই জীবন, অগণ্য বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হউক—ঊর্দ্ধজগতের মন্দাকিনী ধারা আমাদের মধ্যেই সঞ্চিত, সংশয় যেন প্রতারণা না করে—হে প্রকৃতির বরপুত্রগণ! নির্ভয় হও, আশ্বস্ত হও, কোনও ভোগ, কোনও আনন্দ হইতে তোমাদের বঞ্চিত হইতে হইবে না—সৃষ্টির সব রস, দিব্যজীবনের অপূর্ব্ব সোমধারা তোমাদের মধ্যেই প্রথম বিতরিত হইবে—তাহারই আয়োজন চলিয়াছে।

বাংলার জীবনে আজ নূতন ভাবের প্রয়োজন আসিয়াছে—নূতন ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া গড়িতে হইবে। উপরের বিজ্ঞানদৃষ্টি দিয়া নূতন আলোকে জগতের সকল দিকটা দর্শন করা চাই, ভবিষ্যৎ সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সবই নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবননাট্যে নূতন অঙ্কপাতের দিন আসিয়াছে। বাংলার সাধনা কর্ম্ম ও প্রেমে জমাট বাঁধিয়াছে—এক্ষণে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

বাংলায় নূতন ধর্ম্মপ্রচারের আয়োজন কি বিচিত্র মূর্ত্তিতে চারিদিকে প্রকট হইয়া উঠিতেছে—একই উৎস হইতে কত হাজার হাজার সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে, কে বলিবে? এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংঘের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান না হইলে দেশে একটা নূতন আন্দোলন, তুমুল কলরব খুব কর্কশ ভাবেই পরিশ্রুত হইবে। নবসৃষ্টির জন্য ইহারও প্রয়োজন আছে—কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশেই সকল বিরোধের তিরোধান ঘটিবে। সংস্কার ও অহঙ্কার মুক্ত হইয়া আপনার ক্রমপ্রসারণেই ঐক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা অনায়াসলভ্য হইবে।

মানুষ এখনও হৃদয়ের স্পর্শে যত আনন্দলাভ করুক আর নাই করুক, বুদ্ধির ততোধিক পরিতোষ চায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গ বুদ্ধির পরিতুষ্টি পাইলেই আত্মসমর্পণে যে সিদ্ধ এরূপ ধারণা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়—এইবার আপন আপন বোঝাই তরী নিপুণ ও দৃঢ় হস্তেই তোড়ের মুখে চালাইতে হইবে, পথে না বানচাল হয়, দাঁড়িমাঝি সকলের আর

বেহুঁস হইলে চলিবে না—নিজের নিজের হৃদয় দেখিয়া পথ না চলিলে আবেগভরে দশ পা আগাইয়া গেলেও হোঁচট খাইয়া আছড়াইয়া পড়া নিতান্ত স্বাভাবিক। প্রতিজনকেই আজ আপনার অন্তরনির্দ্দেশটি পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

গান্ধী আজ ভারতবর্ষে যে উজ্জ্বল আত্মসাধনার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাঁহার মধ্যে যে মহিমাময় Soul-force আছে, সকলের মধ্যে সমানভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া চাই—তবে কাজ হইবে। গান্ধী যাহা স্বয়ং পারেন, সকলকেই তাহা পারিতে হইবে—ছোট বড় জিনিষ থাকিলে চলিবে না—সকলের ভিতরে যে ব্যক্তিসত্তাটি আছেন, তাঁহাকে ভাগবতভাবে জাগাইয়া না তুলিলে ইহা সম্ভব হইবে না—এই ভাগবত সত্তা (divine personality) দিয়া যে সংঘ সৃষ্টি হইবে, উহার কর্ম্মপ্রকাশ যতই ম্লান ও বিলম্বিত বলিয়া প্রতীত হউক, পরিণামে তাহারই সিদ্ধি জয়যুক্ত হইবে—ইহা অবশ্যম্ভাবী।

বাহিরে বিচিত্র মত বিচিত্র পথ চিরদিনই থাকিবে—এবং সেগুলি ভগবানের ইচ্ছার বিপরীতও নহে—তাহা হইলে তো উহা থাকিতেই পারিত না—কিন্তু কথা হইতেছে, কোন্ পথে চলিলে গতি ঋজু হয়, ক্ষিপ্র হয়। পাশ্চাত্য আদর্শে হোমরুলই ভারতের চরম লক্ষ্য নয়—ভারতের পূর্ণাদর্শ আত্মমুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত—যোগরহস্য আয়ত্ত না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মুক্তি ভুক্তি সকলই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, ইহা ধ্রুব জানিও। যোগশক্তিই জাতির দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত, গতিবেগ অব্যর্থ ও ক্ষিপ্রতর করিয়া তুলিবে।

কাজ অসংখ্য—রাষ্ট্র নয়, ধর্ম্মই আমাদের মূলমন্ত্র—এই মূল জীবনসঙ্গীত সপ্তসুরে বাজাইতে হইবে—ধর্ম্মশক্তি নূতন সমাজ নূতন জীবনতন্ত্র লইয়াই জাগাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার জন্য বাংলার বুকে অচিরে এই যোগশক্তি বিধিমত সংক্রামিত করিতে হইবে। সিদ্ধকর্ম্মী ও সিদ্ধসম্পদ্ লইয়াই এই যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হইবে, সেকথা সহস্রবার উল্লেখ করিয়াছি। উপরের প্রেরণা দিয়াই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের নব নব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইবে, নূতনের সকল কর্ম্ম, সকল ঐশ্বর্য্য অন্তরজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমতালে অগ্রসর হইবে।

মহাদেবীর অসীম করুণায় অনন্ত প্রেরণাপুঞ্জ মাথার উপরে স্তূপীকৃত

হইয়া রহিয়াছে—উহাকে স্বতঃপ্রকাশ করিতে হইবে—হে বাংলার নরনারি ! আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোল, সিদ্ধি তো আজ একজনের জন্য নয়, একজনের সার্থকতা সহস্রজনকে গিয়া পরিপ্লুত করিবে, সহস্রজনের সিদ্ধশক্তি কল কল বিপুল তরঙ্গে সকলকে ভরাইয়া তুলিবে—চিন্তাকে গভীর, হৃদয়কে অসীম প্রসারিত করিয়া দাও, দিগন্তবিস্তৃত হৃদয়সমুদ্রের উপর চিত্র বিচিত্র অপূর্ব্ব জীবনকৌশল ক্রীড়া করুক—বাক্ শ্রান্ত, লেখনী আমার চলিয়া চলিয়া ঢলিয়া পড়িল—বাঙ্গালী আমার মর্ম্মকথা কি অন্তর দিয়া বুঝিবে না ?

যাহা করিতে চাই, তাহা যে বিশাল—তাহার প্রতিষ্ঠান অটল করিতে, চাই যে অসংখ্য প্রাণশক্তির অবিরাম উৎসর্গ—নিরেট জীবন, দৃঢ় হৃদয়, সৈনিকের বীরচরিত্র লইয়াই বাংলার নবীন জাতিত্বের বনিয়াদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে—ভাগবতশক্তির যে আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার দ্বারাই কার্য্য হইবে—অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব।

ওগো আমার জন্মজন্মের আপনার, অমর সম্বন্ধে চিরযুক্ত তরুণজাতি, আজ আমি বিজ্ঞানের হিরণ্ময় তোরণদ্বার হইতে আবার ফিরিয়াছি, এবার একেবারে মহাকালী হইয়া আনন্দের তুফান তুলিতে চাই, আজ আর যুক্তি নয়, তর্ক নয়, আচার নয়, সংস্কার নয়, অনিরুদ্ধের মত শক্তিকে বিচার করিয়া তিল তিল করিয়া গ্রহণ করা নয়—একেবারে নির্ব্বিচারে সমাজ, ধর্ম্ম, জাতির শবমূর্ত্তির বুকে পা দিয়া তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য—ফেরুপালের বিকট চীৎকার তুচ্ছ করিতে হইবে, অন্ধকার চিরকাল পিছন হইতে ভ্রূকুটি করিয়া থাকে—মহাকালী কিছুই গ্রাহ্য করেন না—আজ বাংলায় মহাকালীর নৃত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিবার বিপুল আয়োজন কর।

পুরুষ ও নারী

আমাদের সাধ্য "পূর্ণযোগ"। অর্থাৎ মানুষকে তার সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে' পাওয়া। এ পাওয়ার অন্ততঃপক্ষে তিন চতুর্থাংশ রয়েছে পুরুষ নারীর মিলনের মধ্যে। সুতরাং নারীবিহীন পুরুষ ও পুরুষবিহীন নারী এ দুয়েরই পূর্ণযোগ অসিদ্ধ।

আমাদের লক্ষ্য "লীলা"। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে যে একটী অনন্ত রঙের ভাণ্ডার আছে সেই ভাণ্ডারের অনন্ত রঙ্‌কে উচ্ছ্বসিত করে' এ সংসারকে এ জগৎকে রামধনুর রঙে রঞ্জিত করে' তোলা। কিন্তু ঐ যে রঙের ভাণ্ডার সেই ভাণ্ডারের বেশীরভাগ রঙকে প্রাণদান কর্‌বার মন্ত্র রয়েছে পুরুষনারীর পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ কর্‌বার মধ্যে। সুতরাং নারীবিহীন পুরুষ ও পুরুষবিহীন নারী এ দুয়ের কাছে লীলা বেশীরভাগই ব্যর্থ।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র ও ধর্ম্মক্ষেত্র হচ্ছে সংসার। এই সংসারের বৃহত্তম রসের উৎস রয়েছে পুরুষ নারীর পরস্পরের পরিচয়ের মধ্যে। সুতরাং নারীবিহীন পুরুষ ও পুরুষবিহীন নারী এ দুয়ের কাছে সংসারের সেই বৃহত্তম রসের উৎসটীই অনধিগম্য।

* * *

যেখানেই মানুষ নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, কঠোর হ'য়ে উঠেছে, সেইখানেই সে আপনার মধ্যে কামকেই বড় করে' পেয়েছে। এই অসত্য থেকে তাকে বাঁচ্‌তে হবে। নারীকে অস্বীকারের মধ্যে এই অসত্যকেই পাকা করে' রাখ্‌বার একটা বন্দোবস্ত আছে।

সুতরাং নারী কোন্‌খানটায় অন্তরায় সেইটেকেই আজ আমরা বড় করে' তুল্‌ব না—নারী কোন্‌খানটায় অমৃত সেইটেকেই আজ আমরা আবিষ্কার কর্‌ব।

নারীকে ছোট করে' দেখ্‌ছি কারণ আমি আমাকেই ছোট করে' পেয়েছি। দোষ নারীর মধ্যে নেই, আছে আমার মধ্যে। দোষ যেখানে

আমার সেইখানে সেই দোষ নারীর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে বীর সেজে সিংহ-নাদ কর্‌বো কোন্ মুখে—ততদূর কাপুরুষতা ভগবান্ যেন কোনদিন আমাদের না দেন।

* * *

নারী হচ্ছেন প্রতীক। কিসের? মর্ত্ত্য এবং স্বর্গের মিলনের। মর্ত্ত্য ও স্বর্গ, হলাহল ও অমৃত—এই হচ্ছে নারীর উপাদান। অবিদ্যার দ্বারা এই মর্ত্ত্যকে ও বিদ্যার দ্বারা এই স্বর্গকে জয় করা হচ্ছে পরম সার্থকতা—চরম মঙ্গল। মর্ত্ত্যকে স্বর্গের আলোতে ফুটিয়ে তোলা—স্বর্গকে মর্ত্ত্যের নিবিড়তার মধ্যে ধরে' আনা পূর্ণযোগীর ঐশ্বর্য্য।

সুতরাং নারীর কোন্ অংশটিকে আমরা বড় করে' তুল্‌ছি তারই ওপরে নির্ভর কর্‌বে আমাদের জীবন অথবা অমৃত বা মৃত্যু। নারীর যেখানটায় মৃত্যু সেইখানটাকে বড় করে' দেখে যদি নারীকে বর্জ্জন করি তবে সঙ্গে সঙ্গে জীবন বা অমৃতকেও বর্জ্জন করা হবে। এ বর্জ্জনের পরিণামও মৃত্যু—নয় জীবনের বিদ্রোহ পূর্ণযোগের বিরুদ্ধে।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটী সম্বন্ধ আছেই—অতি সত্য সম্বন্ধ—ভগবান্‌সিদ্ধ। যোগযুক্ত যাঁরা তাঁরা আপনার ইচ্ছাশক্তির বলে সে-সম্বন্ধকে অস্বীকার কর্‌তে পারেন। কিন্তু যে ইচ্ছাশক্তি বা will ভগবানের সৃষ্টি-তত্ত্বের সুতরাং ভগবানের willএর বিরোধী সে-শক্তিকে একদিন না একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়্‌তেই হবে। তখন নারীর মধ্যে মর্ত্ত্যটাই মৃত্যুর মতো এসে আকর্ষণ কর্‌বে। তখন আবার আর একবার আবিষ্কৃত হবে কি ভুলটাই করে' ফেলেছি। নারীকে যতদিন অন্তরায় করে' দেখ্‌বো ততদিন সে কিছুতেই সহায় হ'য়ে উঠ্‌বে না—ততদিন সে বিরাট বাধার পর্ব্বত তুলে বসে থাক্‌বে।

* * *

নারীর সঙ্গে পরিচয় আমাদের পশুত্বের মধ্য দিয়ে হবে, নারীর স্পর্শে আমাদের মধ্যেকার পশুটাই জেগে উঠ্‌বে—কেন? এ প্রশ্ন আজ আমরা কঠোর কণ্ঠে বিদ্রোহীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌ব। মানুষের পক্ষে ঐ বিরাট অসত্যটা আজ আমরা প্রাণপণে মান্‌ব না। যে-মুহূর্ত্তে নারীর স্পর্শে আমার মন সজীব হবে, আত্মা জাগ্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে নারীরও মন

জাগ্‌বে, আত্মা জাগ্রত হবে। কারণ অনন্ত প্রকৃতি নারী, সেখানে যে স্পর্শ নিয়ে যাবে সেখান থেকে সেই স্পর্শই ফিরে পাবে। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার থেকে যে-সত্যটী চাইবে সেই সত্যটীই পাবে। কিন্তু সে-সত্য তোমার আত্মার সত্য হওয়া চাই—বুদ্ধির নয়। নারীকে যদি আমরা আমাদের মহত্তের দিক দিয়ে স্পর্শ না কর্‌তে পারি সে অক্ষমতা আমাদের। সে অক্ষমতাকে বীরত্ব নাম দিয়ে যেন আমরা আত্মপ্রতারণা না করি ও আত্মপ্রসাদ না পাই।

* * *

বিশ্বমানবের একটা সহজ সাধনার ধারা আছে। এই সহজ সাধনার ফলে আজ পুরুষ নারী তার অন্তরের কামের পঙ্কে প্রেমের পঙ্কজ ফুটিয়ে তুলেছে। পূর্ণযোগী কি আজ বিশ্বমানবের এই সহজ সাধনার সিদ্ধি থেকেও বঞ্চিত? যদি বঞ্চিত হয় তবে তার মত আর দুর্ভাগ্য কে আছে? আর যদি বঞ্চিত না হয় তবে নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি ঐ প্রেমের বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা। ঐ প্রেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা মানুষের অন্তরের স্বর্গকে অমৃতকেই অস্বীকার করা। এ অস্বীকার চোখমেলে কোন্ পূর্ণযোগী কর্‌বে?

না, পূর্ণযোগীকে সেই প্রেম সেই অমৃতকে ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধলোকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন কর্‌তে হবে—অনন্ত শক্তিতে অনন্ত জ্ঞানে অনন্ত আনন্দে। এই অমৃতের স্পর্শ যেখানে সেখানেই নারীর স্পর্শে পুরুষ শক্তিমান্। কেবলমাত্র মর্ত্ত্যের স্পর্শ যেখানে সেইখানে নারীর স্পর্শে পুরুষ পশু—এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সে পুরুষের আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা—নারীর বিরুদ্ধে নয়। এই কথাটা সদা সর্ব্বদা স্পষ্ট মনে রাখ্‌বে।

* * *

এতক্ষণ আমরা প্রশ্নটাকে পূর্ণযোগীর দিক থেকেই দেখ্‌বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এর বাইরের দিক থেকেও অনেক কথা বল্‌বার আছে। তা বল্‌ছি।

আমাদের দেশকে উঠ্‌তে হবে। কিন্তু দেশ কি কেবল পুরুষের দেশ? এর অর্দ্ধপ্রাণ যে নারী। আর এই অর্দ্ধপ্রাণ পুরুষজীবনের থেকে নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন নয়—বিচ্ছিন্ন হতে পারে না—বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং নারী হয় সহায় হবে নয় অন্তরায় হবে। দেশের উঠ্‌বার পথে বাইরেকারই কত বিঘ্ন কত বাধা। তারপর প্রতি গৃহে গৃহে নারীসমাজের

ক্ষুদ্রের টান সংকীর্ণতার টান অজ্ঞানতার টানকে জয় করে' করে' যদি চল্‌তে হয় তবে পুরুষসমাজের কতটা শক্তি এইখানে ব্যয়িত হয়ে যাবে। শক্তির এই অপব্যয় কত দুঃখের কত আপশোষের—কারণ যে নারীসমাজ পুরুষের শক্তিকে হরণ কর্‌ছে সেই নারীসমাজের কাছ থেকেই যে সে শক্তি আহরণ কর্‌তে পারে। নারী যখন পুরুষের সাম্‌নেকার বৃহতের পথ মহতের পথ তাঁর স্নেহে প্রীতিতে প্রেমে সরস ও উজ্জ্বল করে' দেবেন তখন পুরুষ চতুর্গুণ শক্তিমান হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু পুরুষকে এই শক্তি দান কর্‌তে হলে সর্ব্বপ্রথম দরকার নারীসমাজের ক্ষুদ্রতা থেকে সংকীর্ণতা থেকে অজ্ঞানতা থেকে বৃহতে মহতে আলোকে বেরিয়ে আসা। আর এ কর্‌তে হলে চাই শিক্ষা।

* * *

কিন্তু পুরুষসমাজ যদি প্রাণপণ বলে সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত অপরাধের ভার নারীর ওপরে চাপিয়ে সেই নারীসমাজকে দূরে ঠেলে রাখে—তবে দেশের এই অর্দ্ধপ্রাণ কোথা থেকে শিক্ষা পাবে? মানস-সরোবরের ঋষিদের কাছ থেকে? তিব্বতের দালাই লামার কাছ থেকে? বদরিকাশ্রমের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে? না। এ শিক্ষা নারীকে পেতে হবে গৃহে বসে, আপনার সমাজের অন্তর থেকে। কেননা সেইটেই সম্ভব আর সেইটেই সত্য হবে।

বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে দেশে একটা অতি অস্বাভাবিক রকমের অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে,—পুরুষসমাজ ও নারীসমাজের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের প্রকাণ্ড ফাঁক জেগে উঠেছে যা কিছু দিয়েই ভরে না। আজ পুরুষের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে নারীর আশা আকাঙ্খার যোগ প্রায় নেই বল্লেই হয়। সমাজজীবনে এটা একটা অতি অস্বাভাবিক অবস্থা। এর ফল টানাটানি আর শক্তিক্ষয়। পুরুষ যখন আজ সাত সাগরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে রূপকথার রাজপুত্রের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তখন নারী তার সংকীর্ণ কোণে বসে' এ ব্যাকুলতার অর্থটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পাচ্ছেন না—সেই সংকীর্ণ কোণে বসে বসে তাঁদের চোখের জলে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের জাল বুন্‌ছেন। পুরুষের বৃহৎ আকাঙ্খাকে বৃহৎ কর্ম্মকে বৃহৎ গৌরবকে কাঁকনের ঠিনি ঠিনি শব্দ তুলে মঙ্গলদীপ নিয়ে অভিনন্দিত কর্‌বার মতো সামর্থ্য নারীর আজ সে নেই—

আকাঙ্খা সে কর্ম্ম সে গৌরব ঘরে ঘরে তাঁদের চোখের জলে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ছে। এই টানাটানি সমাজকে দুর্ব্বলই করে' তুল্‌ছে।

* * *

সুতরাং নারীর যখন শিক্ষা দরকার এই সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা অজ্ঞানতা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে এবং যখন এ শিক্ষা তাঁদের সমাজের কাছ থেকেই পেতে হবে তখন এ শিক্ষা তাঁদের কে দেবেন? তাঁরাই যাঁরা মানস-জগতে এগিয়ে গেছেন। নারীর মানসজগৎকে পুরুষের মানসজগৎ দিয়ে আঘাত কর্‌তেই হবে। পুরুষ যেখানে সত্য সত্যই আপনাকে বৃহৎ করে' পেয়েছে সেখানে তার সেই সত্য নারীর অন্তরে সংক্রামিত হবেই। সুতরাং নারীসমাজকে পুরুষসমাজের পথ দেখাতে হবেই। কিন্তু সে কি কেবল পিতারূপে পুত্রীকে, ভ্রাতারূপে ভগ্নীকে, পুত্ররূপে মাতাকে? না। এ-সবের চাইতে বড় শিক্ষা সহজ শিক্ষা সত্য শিক্ষা শক্তিপূর্ণ শিক্ষা যখন তরুণের বুকের স্বপ্নে তরুণীর বক্ষ ভরে' উঠ্‌বে।

* * *

কিন্তু তরুণের বুকের স্বপ্নে তরুণীর মন রঙিন হয়ে উঠ্‌বে—সে কি অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে? বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে? বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে? না—তা হবে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে, মিলনের ভিতর দিয়ে, প্রেমের ভিতর দিয়ে। দেশমাতৃকার যে মন্দির গড়্‌বে তাতে চাই পুরুষসমাজ ও নারীসমাজের মিলিত হাত—তরুণ তরুণীর মিলিত স্বপ্ন। এ মিলন—পুরুষ নারীর এই মিলন—তরুণ তরুণীর এ মিলন—সে যে সত্যকেই সত্য করে' তোলা। সুতরাং আজ আমরা নারীকে বল্‌ব—দূরে নয় কাছে, বাহিরে নয় অন্তরে, মোহে নয় প্রেমে। আজ আমরা অভিনন্দিত কর্‌ব এসো নারী শক্তিরূপে লক্ষ্মীরূপে মঙ্গলময়ীরূপে—এসো জীবনযজ্ঞে আহুতি নিয়ে জীবনকাব্যে সঙ্গীত নিয়ে—পুরুষ নারীর মিলনে সমাজ চিরন্তনকে লাভ করুক।

সাধনার কথা

(২)

মানুষ সাধারণ অবস্থায় অনুভব করে সে যেন আছে শরীরের স্থূল আধারের ভিতরে; এই অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া তাহাকে অনুভব করিতে হইবে সে যেন আছে শরীরের বাহিরে, মাথার উপরে। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরেই আছে একটা স্তর বা কেন্দ্র যাহাই হইতেছে অতীন্দ্রিয়, অতি-মন Supermind বা বিজ্ঞানময় লোক। এই স্তরে আমার মূল চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই কেন্দ্রে আমার আমি-বোধকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সব সময়ে সকল ভাবে চিন্তায় কর্ম্মে নিবিড় জাগ্রত অনুভব থাকিবে আমি যেন শরীরের মধ্যে আর নাই, আমি দাঁড়াইয়া আছি শরীরের বাহিরে মাথার উপরে ঐ বিজ্ঞানময় লোকে।

আমি যখন আমার আধারের মধ্যে তখন সেই চেতনা অনুসারে আমার আধার, আমার বৃত্তি, আমার প্রকৃতি, আমার স্বভাব শুধু তাই নয়, বাহিরের প্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠে—ইহারা পায় একটা বিশেষ ভঙ্গিমা, যেটা হইতেছে বর্ত্তমানের, সর্ব্বসাধারণের ভঙ্গিমা, যেটাকে বলা যাইতে পারে স্বাভাবিক অবস্থা natural state। যোগীর লক্ষ্য হইতেছে, এই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তে তুরীয় অবস্থার প্রবর্ত্তন অর্থাৎ শরীরের বাহিরে বিজ্ঞানলোকে দাঁড়াইলে চেতনার যে ভঙ্গিমা হয় তাহার দ্বারা আধারকে, জীবনকে, জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া ধরা।

এই তুরীয় বা বিজ্ঞানলোকই আরোহণ ক্রমের শেষ নয়, উহারও উপরে হইতেছে অনন্ত—সৎ চিৎ আনন্দ। জীবের পরমা দৃষ্টি ও গতি হইতেছে বিজ্ঞানময়কেও ছাড়াইয়া আনন্দময় চিন্ময় ও সন্ময়ে উঠিয়া দাঁড়ান। বস্তুতঃ স্থূল আধারকে পরিধি বা সীমা করিয়া জীবকে উহার মধ্যে যে আমরা স্থাপন করি, সেটি অজ্ঞানতা—পুরাতনের সংস্কারের অভ্যাসের ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার আধার শুধু শরীর নয় তাহা শরীরকে ছাড়াইয়াও আছে, তাহা অনন্তপ্রসারিত; শরীর আমার আধারের একটা

অঙ্গ, স্থূলতম নিম্নতম স্তর মাত্র। আধারের উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্তরে, কেন্দ্রে আমার 'আমিত্ব'কে মূল চেতনাকে তুলিয়া ধরাই উন্নতি, যোগসাধনা।

কিন্তু মস্তিষ্কের, স্থূল আধারের সীমাটি জীবের ক্রমোন্নতির একটা সঙ্কটস্থল—এটিকে পার হইয়া গেলে জীব যাইয়া পড়ে সম্পূর্ণ একটা নূতন ধরণের রাজ্যে। তখন বোধ হয় যেন সৃষ্টির সব উল্টা হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতেছি মানুষ পায়ে ভর করিয়া উপরের দিকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বৃত্তি তাহার গতি সব উর্দ্ধমুখ, তাহার চেতনা তাহার ইষণা উপরের দিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া উঠিয়াছে; তখন কিন্তু দেখি ঊর্দ্ধোমূলোঽবাক্‌শাখঃ—মাথার উপরে বিজ্ঞানলোকে যখন দাঁড়াইয়াছি তখন দেখি এই বিজ্ঞানময় লোকই মূল; তাহা শাখা প্রশাখা মেলিয়া দিয়াছে নীচের দিকে, যাহার ফল এই স্থূল আধার। স্থূল আধারের স্থূল মাটির স্থূল সব খেলা—চিন্তা ভাব কর্ম্ম—সবই যেন উপরের কেন্দ্র হইতে উৎসারিত হইতেছে, তাহারই ছায়া প্রতিরূপ প্রতিধ্বনি নিম্নের এই সব। সাধারণ জাগ্রত জীবনে স্ফুট আধারটুকুকে স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ বোধ হয়, তখন কিন্তু দেখি ইহা শুধু যন্ত্র, পুতুলমাত্র, এই যন্ত্রকে পুতুলকে চালাইবার চাবি আছে ঐ তুরীয়ে। শুধু তাহাই নয়, তখন দেখি এই আধারকে আধারের গঠনকে, সংস্কারসমূহকে কঠিন নিরেট সনাতন বলিয়া যে বোধ হইত তাহা কত ভুল—আধারটি বস্তুতঃ ছায়াময় বাষ্পময়, কত নমনীয়, যথা ইচ্ছা গড়িয়া তোলা যায়।

এখানে উঠিলে মনে হয় কি একটা গ্রন্থী টুটিয়া গেল, সত্তা যেন পাইল একটা অসীম প্রসারতা, আমি যেন আছি বিশ্বকে ধরিয়া ছাইয়া; তখন আর ভয় নাই, সংশয় নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংঘর্ষ নাই। তখন পাইয়াছি নিজের প্রকৃত সত্তা, অটুট জ্ঞান, অব্যর্থ শক্তি, অনাবিল আনন্দ; বিশ্ববস্তুর সহিত আমার শুধু যোগাযোগ নাই, আমি যেন সকলের সহিত প্রত্যেকের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। এখানেই মুক্তি, জীবন-মুক্তি।

আমরা বলিয়াছি বিজ্ঞানের উপরে হইতেছে সচ্চিদানন্দ। মাথার উপর হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের আরম্ভ, ক্রমে তাহা উদারতর বৃহত্তর হইয়া শেষে অসীম আকাশমণ্ডপের মত সচ্চিদানন্দে, অনন্তে উঠিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই অনন্তে নানা নাই, এখানে বিশেষ যাহা তাহা সব লুপ্ত হইয়াছে, এটি অনির্ব্বচনীয় একম্ অদ্বৈতম্। এখানে উঠিয়া গেলে জীব শুধু শরীরান্তি-

রিক্ত নয়, সে হয় শরীরনির্ম্মুক্ত; পায় কৈবল্যমোক্ষ। সেই এক অদ্বৈত অনন্তেরই একটা স্তর বা ভঙ্গী হইতেছে নির্ব্বাণ বা লয়।

এই অসীম অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দই সৃষ্টির মানুষের মূল উৎস—সকলের উপরে সকলের পিছনে রহিয়া সমস্তকে ধরিয়া আছে। কিন্তু এই অনন্ত হইতেছে চরম সাম্য, নির্ব্বিকার, অরূপ। রূপের বিকাশ, সৃষ্টির নানাত্বের আরম্ভ হইল এই অনন্ত যখন নামিল বা আসিয়া দেখা দিল বিজ্ঞানময়-লোকে। প্রকাশ বা সৃষ্টি যেন অনন্তের অবতরণ। আকাশ হইতে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষ হইতে মূর্দ্ধা, মূর্দ্ধা হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে নাভি, নাভি হইতে উপস্থ—এই রকম কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে সচ্চিদানন্দ, বিজ্ঞান, মনবুদ্ধি, চিত্ত, প্রাণ, দেহ। সৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে এই রকম অবরোহণ পদ্ধতিতে, সৃষ্টি আবার চলিয়াছে ঐ একই পথে আরোহণ পদ্ধতিতে, সৃষ্টির বিবর্ত্তন, মানুষের উন্নতি হইতেছে সৃষ্টির নিগূঢ় ক্রমকে আবার বাহিরের দিক হইতে উল্টা মুখে বাহিয়া চলা।

কিন্তু আরোহণের আছে দুইটি বাধা—অর্থাৎ মানুষের পক্ষে। আমরা বলিয়াছি মানুষের কেন্দ্র, তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র হইতেছে মনবুদ্ধি, মূর্দ্ধা—তাহার উন্নতি বা আরোহণ অর্থ মনবুদ্ধিকে অতিক্রম করা, মূর্দ্ধার উপরে মূল চেতনাকে, নিজের অস্তিত্ব আমিত্ব কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। এখন, প্রথমতঃ, মানুষ যখন শরীরাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম চেতনা বা অনুভব পায় তখন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটা জিনিষ তার বৃহতের মহত্তের আলোয় আনন্দে শক্তিতে মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে; মানুষ বোধ করে এইবার পূর্ণসত্যকে, একেবারে গোড়ার কেন্দ্রকেই সে পাইয়াছে; এতদিন শরীরের মধ্যে তাহার যে সব অনুভব উপলব্ধি ছিল তাহা ছায়া মাত্র অর্থাৎ মায়া, কৃত্রিম, ভুল। শরীরের উপরে উঠিয়া সে শরীরকে অস্বীকার করিয়া ফেলে—শরীরের মধ্যে অবস্থান কালে যে একটা ধর্ম্ম বাঁধন শৃঙ্খলা পাইয়াছিল, শরীরের বাহিরে উঠিয়া গিয়া সে সকলের সহিত প্রথমে দেখিল কেবলি একটা বিসাদৃশ্য, একটা অসামঞ্জস্য। মানুষের তখন লোভ হয় আকাশের অনন্তের অরূপের অক্ষরব্রহ্মের মধ্যে ছুটিয়া পড়িতে। শরীরের মধ্যে জীব যতদিন আছে, ততদিন তাহার যেমন একটা স্বাভাবিক গতিই যেন থাকিয়া যায় চলিতে নীচের দিকে, সেই রকম শরীরের বাহিরে একবার গেলে জীবের যেন আবার একটা গতি হয় উল্টা দিকে একেবারে

চরম উপরের দিকেই উঠিয়া যাইতে।

কিন্তু উপরটা সত্য নীচেরটিকে বাদ দিয়া নয়, অনন্ত আকাশ পৃথিবী হইতে মুখ ফিরাইয়া (convex) দূরে সরিয়া যায় নাই, পৃথিবীকে ঘিরিয়া পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে (concave). এই অনন্তের কেন্দ্র (focus) হইতেছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতেই মূলসৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনন্ত যখন নামিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, পৃথিবীও তখন উঠিয়া সেই বিজ্ঞানেরই মধ্যে অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যে লীলা তাহা একেবারেই অসত্য বা ভুল নয়। শরীরের চালক হইতেছে বিজ্ঞান, শরীরের ধর্ম্মের কর্ম্মের মূল ধরণগুলি (types) সব ঐ বিজ্ঞানে; তবে জীব যতক্ষণ শরীরের মধ্যে ততক্ষণ তার দৃষ্টি ঠিক মূল জায়গা হইতে আসিতেছে না বলিয়া শরীরে শরীরের ধর্ম্মে কর্ম্মে বিকৃতি দেখা দিয়াছে মাত্র। কিন্তু শরীরের উপরে উঠিলে দেখিব দৃষ্টি আমার সহজ ও ঋজু হইয়া উঠিয়াছে, শরীরের অভ্যন্তরের ধর্ম্ম কর্ম্মও সহজ ও ঋজু হইয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞানময়ের সত্য সহজ ঋজু, মন-প্রাণ-অন্নময়ের সত্য ঐ বিজ্ঞানময়ের সত্যেরই বিকৃত কুটিল প্রতিরূপ। বিজ্ঞান অনন্তের—সচ্চিদানন্দের—সাক্ষাৎ প্রকাশ, তাই অনন্ত সচ্চিদানন্দ যেমন সত্য বিজ্ঞানও তেমনি সত্য। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় জীব বিজ্ঞান পার হইয়া যে'ই শরীরে প্রবেশ করিয়াছে অমনি জীবের সম্মুখে পড়িয়াছে একটা যবনিকা, তাই তখন আরম্ভ হইল গৌণপ্রকাশের খেলা—অজ্ঞানের অর্দ্ধজ্ঞানের খেলা। জীবের কাজ আপনাকে ঐ বিজ্ঞানময়ে তুলিয়া জাগ্রত রাখিয়া শারীরধর্ম্ম মনবুদ্ধি চিত্তপ্রাণ ও দেহকে রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অনন্তের সচ্চিদানন্দের কৈবল্যমুক্তির মধ্যে এ সকলের নির্ব্বাণ নয়, নির্ব্বাণে ইহাদের সার্থকতা নাই; কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ যে অনন্ত জাগ্রত সজ্ঞান স-রূপ হইয়া উঠিয়াছে সেই সত্য জ্ঞানে রূপে জীবনে এই নীচের সব আধারকে, শারীর-প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর

আমার কোন্ জিনিষকে বাস্তবিকই আমার বলিতে পারি? হাতের জিনিষ আমার কখন হইয়া উঠে প্রাণের জিনিষ? দানের ফলে যে-জিনিষ আমি পাই, আমার মুঠিতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে-জিনিষ সে-জিনিষকে আমার নিজের বলিয়া কোন দাবি আমি করিতে পারি না। সে-জিনিষকে আমি আমার কাজে লাগাইতে পারি, তাহাকে উপভোগও করিতে পারি, কিন্তু তবুও তাহা আমার নয়, আমার অন্তরাত্মার অটুট অধিকার তাহার উপর নাই। কারণ, সে-জিনিষ আমাকে না দিলেও হইত, আমার হাতে সে যেমন আসিয়া পড়িয়াছে আর এক জনের হাতেও ঠিক তেমনিই যাইয়া পড়িতে পারিত; আমি এখন তাহাকে যেমন কাজে লাগাইয়াছি উপভোগ করিতেছি, আর এক জনেও ঠিক তেমনি তাহার কাজে ও ভোগে লাগাইতে পারিত। বলা যাইতে পারে বটে, জিনিষটিকে যে আমাকেই দেওয়া হইয়াছে, আমারই হাতে তাহা উঠিয়াছে সে যে অন্যত্র যাইয়া পড়ে নাই ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে সে-জিনিষ আমার, আমার নিজের। হইতে পারে, কিন্তু এই প্রমাণটুকুই যথেষ্ট নয়, আরও প্রমাণ চাই। এই রকম হইয়াছে, এটুকু আমার স্বপক্ষে; কিন্তু অন্য রকমও যে হইতে পারে না, তাহা যদি দেখাইতে পারি তবেই কেবল নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। ফলতঃ দানের জিনিষ আমার বিত্তের ভাণ্ডারে আসিয়া জমিতে পারে, কিন্তু প্রাণের মণিকোটায় পৌঁছিতে পারে না; আর পৌঁছিতে পারিলেও সে আমার অজ্ঞাতসারে, আবার তাহাকে যাচাই করিয়া কষিয়া না দেখিয়া সেখানে স্থান দিতে পারি না।

যে-জিনিষকে আমি উপার্জ্জন করিয়াছি তাহাই শুধু আমার। ঘটনা-চক্রে যাহা আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে অথবা লোকান্তরালে সংগোপনে যাহা সরাইয়া আনিয়া নিজের অধিকারে পুরিয়াছি সে-জিনিষ আমার

উপার্জ্জন নয়, সে জিনিষ আমার নয়, যেমন আসিয়াছে তেমনি ভাবেই সরিয়া যাইতে হয়ত তাহার বেশীক্ষণ লাগিবে না। এমন কি জোর করিয়া জগৎ হইতে ছিনাইয়া যে-জিনিষ ঘরে লইয়া আসিয়াছি তাহাও আমার প্রকৃত উপার্জ্জন নয়, তাহাকে আমার বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। বিশ্বের সকল সম্বন্ধের ভিতর থাকিয়া যে-জিনিষ স্বেচ্ছায় স্বাধীন-ভাবে আমাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমার; পাওয়া জিনিষকে বিশ্বের মাঝে ছাড়িয়া দিয়াছি, অথচ তাহা যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া আমারই কাছে আসিয়াছে তখনই সে-জিনিষ আমার, আমার প্রাণের, আমার অন্তরাত্মার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে।

পাওয়ার মধ্যে থাকা চাই না-পাওয়া। যে-পাওয়ার মধ্যে সাথে সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে নাই এই না-পাওয়া সে পাওয়া যথার্থ পাওয়া নয়, সে পাওয়া হইতেছে গ্রাস করা, তাহা সম্মিলন একীকরণ নয়, তাহা একের আত্মার লোপসাধন হইতে পারে কিন্তু দুই'এর একাত্মতা নয়। ধরিয়া থাকার মধ্যে থাকিবে একটা বিপুল ত্যাগের ভাব, গ্রহণের মধ্যে বর্জ্জন, প্রতিষ্ঠার সাথে বিসর্জ্জন। আগ্রহভরে যাহাকে আঁকড়িয়া ধরি, আর কিছু পাই না বলিয়া যাহাকে ছাড়িতে পারি না সে আমার বাসনার কামনার আমার অহঙ্কারের লক্ষ্যবস্তু, আমার মধ্যে যে রাক্ষস ও অসুর তাহার তৃপ্তির উপচার। কামনার পাত্রকে, বুভুক্ষার উপচারকে অনাসক্ত বীর তপস্বীর মত যখন আমার কবল হইতে মুক্তি দিতে পারি, এই উদার মুক্তির ভিতর তাহা যখন ফিরিয়া পাই তখনই তাহা হইয়া উঠে আমার আত্মার অপরার্দ্ধ, আমার ভিতরের দেবতার ভোগ। তাই উপনিষদের ঋষি গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। পাও যে-জিনিষ অমনি তাহাকে ধরিয়া নিজের কুক্ষিগত করিও না। আসিতেছে যে-জিনিষ তাহাকে যেমন সে আসিতেছে তেমনি চলিয়া যাইতে দাও। প্রথম স্পর্শেই তোমার অতি আপনার বলিয়া জিনিষটি বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ হয়ত সে তোমার অতি বাহিরের একটা অঙ্গের সাময়িক তৃপ্তি দিতেছে, যদি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাক, তবে এই সাময়িক তৃপ্তিটুকুর পর-মুহূর্ত্তে তাহা আর তেমন লাগিবে না। কিন্তু যদি যাইতে দিতে থাক তবে তোমার অন্তরাত্মার প্রয়োজনের টানে টানে যদি ফিরিবার হয় তবে তাহা ফিরিয়া আসিবেই, তোমাতেই তাহা আশ্রয় করিয়া রহিবে।

তোমার খাঁচার পাখী খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না—দাও তাহাকে উড়াইয়া অনন্ত নীলিমায়, আকাশে বাতাসে সে যথেচ্ছ খেলিয়া বেড়াক, সকলের সাথে মিলিয়া মিশিয়া বুঝুক সে—জগৎ কি, সে কি, তুমি কি? তোমার জিনিষ যদি সে হয় বা সেইভাবে থাকিতে চায় তবে আপনা হইতেই তোমার খাঁচায় সে ফিরিবে। দুয়ার উন্মুক্ত পাইয়া, মুক্ত বিচরণের রসাস্বাদের পরেও যে পাখী তোমার খাঁচায় ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, বাস করে, সে ত বাস্তবিকই তোমার জিনিষ। বদ্ধখাঁচার পাখী জড়বস্তু, তাহার উপর সকলেরই সমান অধিকার, অথবা কাহারও কোন অধিকার নাই।

ঘরকে বাহির করিয়া দাও, তোমার ও কঠিন নিরেট বাঁশে আঁটা, গাঁটে গাঁটে বাঁধা, পুরু ছাউনিঘেরা, অন্ধকারে অন্ধকারে ভরা ঘরখানি ভাঙ্গিয়া ফেল; খুঁটি, আড়া, বেড়া, খড় সব উড়াইয়া ছড়াইয়া দাও দিকে দিকে, সৃষ্টির অনন্ত প্রসারে। তারপর সেই উন্মুক্ত অসীমতায় আহরণ কর আকাশের নীলিমা, উষার গোলাপী, কান্তারের সবুজ, সূর্য্যের জ্যোতিঃ, সাগরের গতি, ভূধরের স্থিরসত্তা, এই সকল উপকরণ দিয়া তোমার আবাসখানি গড়িয়া তোল—বাহিরকে আবার ঘর করিয়া লইয়া আইস।

পরকেই আপন করিয়া লও। আপনকে আপনার করিয়া লওয়ার কোন অর্থ নাই। পর অর্থাৎ স্বাধীন স্বতন্ত্র যে, আপনাকে চিনিয়াছে জানিয়াছে যে, তাহাকে তুমি ধরিতে পার শুধু তোমার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা দিয়া, তুমি যখন তোমাকে চিনিয়াছ জানিয়াছ। আপনকে আলিঙ্গন করিতে পার শুধু বাহিরের একটা সম্বন্ধের, ঘটনাচক্রের সুবিধার আশ্রয়ে অজ্ঞানের অন্ধতার মধ্য দিয়া। অজ্ঞানের সম্বন্ধ যতই স্থায়ী হউক না কেন তাহা গভীর নয়, উদার নয়—অন্তরতম সত্তার সম্বন্ধ নয়। সে মিলনে প্রাণের আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আনন্দের আনন্দ নয়।

পরকে আপন করিয়া লও—কিন্তু সাবধান, আপন করিয়াও ভুলিয়া যাইও না—সে আবার পরও। সে পর কারণ সে কেবল তোমার নয়, সে নিজেরও—নিজের অন্তরাত্মার, শুধু নিজেরও নয়, সে আবার বিশ্বের, ভগবানের। আপন করিয়া যদি তাহাকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও, তবে তাহার সবখানিকে তুমি পাইবে না, তুমি পাইবে তাহার একটা খণ্ড অংশ। তাই আপনাকে সর্ব্বদাই পর করিয়া দিতে চেষ্টা করিও। আপন

সাম্যের সহিত মিলিত হও কিন্তু—"সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

ঘরকে বাহির করিয়া দাও, বাহিরকে ঘর করিয়া আন; পরকেই আপন করিয়া লও, সে আপনকে আবার পর করিয়া দাও। ঘরের ও বাহিরের, পর ও আপনের মধ্যে যে আছে দেউল, সেটি যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ধূলিসাৎ হইয়াছে, যখন তোমার জিনিষটি ঘর ও বাহির, পর ও আপনের মধ্যে অবলীলাক্রমে আনাগোনা যাওয়া আসা করিতেছে, খেলিয়া বেড়াইতেছে, তখনই সে জিনিষ স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীনতায় পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার স্বতন্ত্র স্বাধীন পূর্ণপ্রকৃতির—তোমার প্রকৃত আপনার হইয়া উঠিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে। মানুষের প্রকৃত অধিকার মুক্তির মধ্যে—অহঙ্কারের ভালবাসায় নয়, অধ্যাত্মের আনন্দে। অহঙ্কার যে দাবী করে, সেটা হইতেছে জোরজবরদস্তির দাবী—might is right. সেখানে হয় একজনকে আত্মবলিদান দিতে হয় নতুবা দুইজনের মধ্যে একটা রফা করিতে বা জোড়াতালি দিতে হয়। কিন্তু অধ্যাত্মের দাবী যেখানে করিতে পারি সেটি হইতেছে সমস্ত বিশ্বের প্রেরণা ভগবানের আজ্ঞা—ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওয়া যেখানে অবসান হইয়াছে সেখানে ব্যক্তির ভাগবত চাওয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেখানে right is might. অজ্ঞানে অহঙ্কারে যে অধিকার তাহাতে আছে শুধু দ্বন্দ্ব, মৃত্যু, সর্ব্বদা হারাই হারাই ভাব; জ্ঞানে অধ্যাত্মসত্তায় আছে বিচিত্র মিলন, সুসমঞ্জস জীবন; অটুট একত্ব।

নিজের নিজের ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও, লজ্জা মান ভয় ত্যাগ করিয়া পরের উদ্দেশ্যে চল—তবেই তোমার প্রকৃত ঘরের প্রকৃত আপনের সন্ধান পাইবে। আপনকে পাইবার, পরকে গড়িয়া তুলিবার আর অন্য পন্থা নাই।

নারী-সমস্যা

(২)

পুরুষের অন্তরাত্মার, প্রাণের ছবি হইতেছে নারী। পুরুষ যতদিন তাহার প্রকৃত অন্তরাত্মা তাহার প্রকৃত প্রাণ নিজের ভিতরে না পাইবে ততদিন বাহিরে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রকৃত নারীকেও পাইবে না। যে মিথ্যা তাহার অন্তরাত্মায়, তাহার প্রাণে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, নারী হইবে তাহারই প্রতিকৃতি, সে বাস্তবকে নারী-শক্তি আরও ঘোর বাস্তব করিয়া তুলিবে মাত্র।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যতদিন পুরুষ নিজের অন্তরাত্মার প্রকৃতি না পাইতেছে ততদিন সে কি করিবে, ততদিন নারীর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ হইবে? অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান যতদিন না পাই ততদিন কর্ম্মজীবনের বহিঃপ্রকৃতিকে লইয়া কি করিতে পারি? এক, সকল সম্বন্ধ ছেদ করিতে পারি নিজেরই মধ্যে নিজে ডুবিয়া যাইতে পারি, তারপর ভিতরে সেই পরশমণি পাইয়া ফিরিতে পারি। আর না হয়, বহিঃপ্রকৃতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে পারি, যতদিন শ্রান্ত অবসন্ন আধারকে সে স্রোত আপনা হইতেই অমৃতসাগরের বুকের মধ্যে না লইয়া যায়; হয় সন্ন্যাসী না হয় ভোগী।

কিন্তু সন্ন্যাসের পথে ভয় হইতেছে মোক্ষ—লয় অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবনে ফিরিয়া না আসা। ফিরিতে পারিলেও, দুই একজনকে তুমি সন্ন্যাসের পথে লইতে পার, কিন্তু সমস্ত সমাজকে সে পথে লইবে কি করিয়া? নারীকে ছাড়িয়া একটা পুরুষের সন্ন্যাসীসংঘ করা যাইতে পারে, কিন্তু ফল? খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ ইউরোপের সমাজকে কতখানি খৃষ্টের স্বপ্ন সেই দিব্য রাজ্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে? আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সব—নিজেরা তাঁহারা যতই শুদ্ধ সিদ্ধ হউন না কেন—দেশের সমাজের সমস্ত প্রাণকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক গঠন দিয়া কতখানি রচিয়া তুলিয়াছেন? তাহা ত স্বচক্ষেই সকলে দেখিতেছেন।

আর ভোগের ভয় বিলয়। সে ধারায় চলিলে কোন বিকট বিশাল

ঘুর্ণিপাকে যে তলাইয়া যাইব না তাহার নিশ্চয়তা কি? অন্ধ নর, অন্ধ নারী হাত ধরাধরি করিয়া চলিলে, পরস্পরের সাহায্যে বাঁচিতেও পারে, কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া খাতে পড়িয়া মরিবার আশঙ্কাই বেশী। ইউরোপ এই পথে চলিয়াছে, ফল ত প্রতিপদেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

নিবৃত্তির পথে নির্ব্বাণের আশঙ্কা; প্রবৃত্তির পথে প্রলয়ের আশঙ্কা। আর উপায় নাই কি? আছে; সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি—মুরারেস্তৃতীয়পন্থাঃ।

সে উপায় সে পথ হইতেছে বাহিরে প্রবৃত্তি, ভিতরে নিবৃত্তি। পুরুষ ও নারীকে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। আবার উভয়কে মোহসূত্রে অতিমাত্র বাঁধিয়া দিবারও আবশ্যকতা নাই। সমস্ত নির্ভর করিতেছে ভিতরের একটা ভাবের পরিবর্ত্তন, একটা new angle of vissionএর উপরে। পুরুষ নারীকে কখন অন্তরায় ভাবিবে না, সে নারীকে একটা নিবিড় সাদর স্বাগত আহ্বানেই ডাকিয়া লইবে; কিন্তু পুরাতন প্রাণের সংস্কারসমূহের উপরের স্তর হইতে। পুরুষ নারীকে ভাবিবে তাহার অন্তরাত্মারই শক্তির ও শ্রীর বিগ্রহরূপ। গোড়ায় এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া চলিলে পুরুষনারীর সম্বন্ধ ক্রমে সহজ শুদ্ধ উন্নতই হইয়া উঠিবে। পুরুষকে যখনই শিক্ষা দেই নারীকে দেখিলেই চক্ষু অবনত করিবে, মাতৃভাবে বন্দনা করিবে, তখন সেই স্ফুট কথার অন্তরালে একটা সুপ্ত কথার বীজ নিক্ষেপ করি, তাহার ফল বড় বিষময়—পুরুষের গুপ্ত চেতনায় সেই বিষতরুই অসাক্ষাতে বাড়িয়া উঠে, শেষে তাহাই তাহার কাল হয়। নারী যে নারী এই সহজ কথা দিয়াই আরম্ভ করা উচিত। নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—তুমি নারী; তোমার অসম্বৃত নারীত্ব লইয়াই পুরুষের সম্মুখে এস। আমরা পুরুষনারীকে যখন একটা বিশেষ সংজ্ঞার খাঁচায় ফেলি, তখনই তাহার চারিদিকে একটা কুহক জন্মাইতে দেই। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে মিলামিশা করে এই রকম একটা সহজ সম্বন্ধের উপর দাঁড়াইয়া, অন্তরাত্মার, মানুষের দিক দিয়া—তাই সে সম্বন্ধে গ্রহণ বর্জ্জন, ত্যাগ ভোগ বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির প্রশ্ন বিশেষ কিছু উঠে না। নারীকেও সেই রকম প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে শিখিতে হইবে মানুষ হিসাবে মানুষের দৃষ্টি দিয়া। এই সরল দৃষ্টি দিয়া দেখিলে, মানুষে

মানুষে একদিকে যেমন সহজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে, পুরুষে নারীতেও তেমনি পুরুষ নারীত্বের স্বাভাবিক সত্য সম্বন্ধই ফুটিয়া উঠিবে।

এই যে সহজ সত্য সম্বন্ধটি পুরুষ নারীর মধ্যে এত বিরল হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের পূর্ব্বতন শিক্ষা দীক্ষার, সংস্কারের, সমাজ ব্যবস্থার ফল। ইহার মধ্যে নিত্য সনাতন সত্য কিছু নাই। এই ভাবটুকু বদলাইতে ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধনার যে প্রয়োজন আছে এমন বোধ হয় না। পুরুষের দিক্ হইতেও নয়, নারীর দিক্ হইতেও নয়। সেই কৃচ্ছ্রসাধনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে পুরুষ যখন নারী হইতে পৃথক হইয়া আপনা আপনি চলিতে চেষ্টা করে, নারী যখন পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার পথ খুঁজিতে থাকে। একটা উচ্চতর মহত্তর জীবনের অংশী যদি দুই জনেই হয়, দুই জনেই যদি সমান ভাবে সজাগ হইয়া একই ব্রতের ব্রতী হয় তবে কাহারও পদস্খলনের সম্ভাবনা আমরা দেখি না—পরস্পর পরস্পরের ভাবকে উপচিত করিয়া উভয়েই মহাসিদ্ধিতে সম্মিলিত হয়।

পদস্খলনের ভয়টাকেই বড় করিয়া দেখা আমরা কিছু কাজের মনে করি না। এই ভয়ই বাস্তবিক পদস্খলনের কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু জগতে পদস্খলনের সম্ভাবনা কখন কোন্ অবস্থায় নাই? পুরুষ নিঃসঙ্গ একাকী থাকিলে, অথবা কেবল পুরুষের সতীর্থ হইলে কি সে সম্ভাবনা দূর হইল? তবে কেবল নারীর দোষ দেওয়া কেন? অথবা বলা যাইতে পারে, অনর্থক প্রলোভনের কারণ বাড়াইয়া লাভ কি? ধরিয়া লইলাম নারী মস্ত প্রলোভনের কারণ, কিন্তু এই প্রলোভনের সাথে যে মিশিয়া আছে একটা মস্ত লাভের সম্পদ্—একটা অমৃতই, তাহা পাইবে কেমন করিয়া? প্রলোভন যেখানে যত বড় তাহার মধ্যে তত বড় অমূল্য জিনিষ লুকাইয়া আছে। প্রলোভনের কারণ না বাড়াইলে লাভের কারণও বাড়িবে না। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, সমস্ত জগৎই প্রলোভনে ভরা—সন্ন্যাসী হইয়াও বাঁচিবার উপায় নাই, সন্ন্যাসীরও প্রলোভন বাহিরে না থাকিলেও নিজের ভিতরেই যথেষ্ট।

সকল সাধনারই আছে বিপুল বাধা বিপত্তি প্রলোভন ঝুঁকি। সে জন্য একটা সাহস একটা শ্রদ্ধা চাই আরম্ভেই। সাহস ও শ্রদ্ধার সেই ন্যূনতর পরিমাণটুকু না থাকিলে কার্য্যে অগ্রসর হইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা।

মানুষকে শুধু পশু বলিয়া স্বীকার করিয়া তারপর চলিতে চেষ্টা করিলে যে ফল হয় তার অপেক্ষা বেশী ফল হইবে মানুষকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিতে থাকিলে। নিজের চারি দিকে যত ঘের দিয়া ফেলি যত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে চলিতে থাকি ভিতরের ব্রহ্মপুরুষও তত সঙ্কুচিত শক্তি লইয়াই কার্য্য করিতে থাকে। একটা সময়ে একটা অবস্থায় কোন বিশেষ মানুষের পক্ষে এই ঘের এই সংকীর্ণ-করণ প্রয়োজন হইতে পারে—তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলের পক্ষে সকল বা বেশীর ভাগ অবস্থায় এইটিকেই অকাট্য বিধানে পরিণত করা অন্ধ গোঁড়ামী ছাড়া কি বলিব?

নারীর উক্তি

নারীর উক্তি—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম এ বি এল—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

নারীর উক্তি মূল্যবান্—কেননা এই সমস্যাময় যুগে পুরুষের মনে নারীসমস্যা যে আকারে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সবখানি নয়—নারীর নিজের চিন্তা, নিজের কথা শুনিবার যথেষ্ট প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তক খানিতে এই বিষয়ে অনেক-গুলি কথা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। লেখিকার মনোরম ভাষা ও সুচারু লিপি-শিল্পের প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র। বর্ত্তমান যুগে, 'যখন কালপুরুষের নিঃশ্বাস বেগে পড়িতেছে, তাহার রক্ত জোরে বহিতেছে, তাহার নাড়ীর গতি চঞ্চল', তখন জাতির সকল সমস্যার চিন্তায় মীমাংসায় চিন্তাযন্ত্র এক চরম প্রান্ত হইতে অপর চরম প্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়াই স্বাভাবিক। 'নারীর উক্তি'র একটি বিশেষত্ব ইহাতে এরূপ গোঁড়ামীর পরিচয় নাই। লেখিকা একদিকে যেমন নারীচরিত্রের আদর্শ নিরূপণে সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিতে নিরস্ত হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে সূর্য্যাস্তদেশের নবনারীদলের বিদ্রোহযাত্রারও অন্ধ পক্ষপাতিনী নহেন। আদর্শ বঙ্গরমণীর সুস্পষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি কি? গ্রন্থকর্ত্রীর কথা আবার একটু উদ্ধৃত করি—'আমরা দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাহি—যিনি আমাদের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা বুঝিবেন, ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন, অথচ যিনি আমাদের কাজে কর্ম্মে, গৃহে সমাজে, আচারে অনুষ্ঠানে, ভাবে ভাষায়, চালচলনে অধিনেত্রী হইবেন; কোনও একজন বিশেষ দেবী বা মানবী নহেন'—কথাগুলি বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। নারীই নরকের দ্বার বলিয়া ভারতের অধ্যাত্মজগতে যে বিপুল ঘৃণাস্তূপে নারী প্রতিভাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক দিয়াই অনেক কথাই "প্রবর্ত্তকে" যথেষ্ট আলেচিত হইয়াছে—সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অভ্যুত্থান চাই—তাহার জন্য চাই সর্ব্বাগ্রে নারী আত্মার জাগরণ; বাংলার নারীজাতির আত্মা কি জাগিয়া-

ছেন? তর্কে যুক্তিতে কথায় তো এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবার নহে—প্রাণের নয়, মনেরও নয়, আত্মার জাগরণ—অন্তরের দৃষ্টি দিয়াই তাহা প্রত্যক্ষ করিবার। বাংলার যে নিজস্ব মাতৃমূর্ত্তি কল্পজগতে জাগিয়া উঠিতেছেন, তাহার ভিতরে কি অসীম তপঃশক্তি, কি নীরব হৃদয়োৎসর্গ, কি জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভার বিদ্যুৎ-আভাস পরিলক্ষ্য করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার দিন এখনও আসে নাই—কিন্তু কোন্ স্ত্রীশিক্ষার ফলে এই মাতৃশক্তির জাগরণ ঘটিবে, তাহা আজিও বাঙ্গালীর বিজ্ঞানপটে পরিস্ফুট নয়। আদর্শ চাই, আদর্শ তপস্যার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিবে—কিন্তু সে আদর্শ কিরূপ, কোন্ স্পর্দ্ধাশীল আজ তাহা ছকিয়া দিবে? তবে সে আদর্শ যাহাই হউক—সমাজপুরুষের ভিতর হইতেই উহার সৃষ্টি হইবে। লেখিকা প্যাটেল বিল প্রসঙ্গে যে কথা তুলিয়াছেন—'সমাজের যদি নিজের অবস্থা বুঝিয়া নিজে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্যই থাকিবে, তবে আমরা ব্যবস্থাপত্রের জন্য রাজদ্বারে হাত পাতিতে যাইব কেন'—বস্তুতঃ বিশাল হিন্দু সমাজ তো ঐখানেই মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। হয় সমাজের নিজের ভিতর হইতে বাঁচিয়া উঠিবার শক্তি আছে মানিয়া লইতে হইবে, নয় বুঝিতে হইবে, এ সমাজ doomed, যে আপনার জীবনীশক্তি হারাইয়াছে, তাহার অবস্থা চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে—তখন আইনের উগ্র মন্ত্রৌষধিবীর্য্যে কি ফল! লেখিকা ঠিক এই দিক্ দিয়া কথাটা আলোচনা না করিলেও, আমরা ঘুরাইয়া এই দিক্‌টাই সম্মুখে ধরিলাম—কেন না এই যুগপরিবর্ত্তনের মুখে এরূপ গুরু সমস্যা যত গভীরতর অন্তস্তল হইতে দেখা যায়, ততই মঙ্গল। পুস্তক খানি মনোজ্ঞ ও চিন্তাপূর্ণ, বাঁধাই মলাট বাহ্যাবয়বও সুদৃশ্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

সেবক কর্ত্তব্য—শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য এক আনা মাত্র।

মহাধর্ম্ম বার্ত্তিক—শ্রীকালিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত মূল্য ৵০ মাত্র।

স্বাস্থ্যচিত্র ও খাদ্যচিত্র—প্রকাশক ও প্রণেতা শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মূল্য মোট ৵০ তিন আনা—পল্লীস্বাস্থ্যশিক্ষা প্রচারের এইগুলি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্দেহ নাই।

অন্ধ বিদ্যালয়—শ্রীঅরুণ কুমার সাহা কর্ত্তৃক লণ্ডন সার্ব্বভৌমিক অন্ধ কন্‌ফারেন্সে পঠিত এই প্রবন্ধটী পাইয়া বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়াই বাংলার এই একমাত্র অন্ধ বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে যাইতে হয়। 'অন্ধজনে দয়া কর' শিশুশিক্ষার এই মমতার উপদেশের উপরেও একটা কর্ত্তব্য আছে, চক্ষুহীন চক্ষুষ্মানের নিকট হইতে শুধু দয়া নয়, চায় আলো—এই অন্ধ নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক অরুণবাবুর পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ মহাশয় এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গালীর অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অনুষ্ঠানটি বাংলার সত্যই একটী কীর্ত্তিস্বরূপ। ভারতে মোট অন্ধসংখ্যা ৪৷৷০ লক্ষ, বিদ্যালয় মাত্র ১২টী, তন্মধ্যে ৮টী মিশনরী চালিত, কলিকাতার অন্ধ বিদ্যালয়টিতে বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩৭ জন। বালিকা ছাত্রীও আছে। ছয়টী বিন্দু অবলম্বনে সমস্ত বর্ণমালা সাজাইয়া যে কৌতুহলাবহ 'ব্রেল' প্রণালী লালবিহারী বাবু তাহার বাংলা অনুরচনা গড়িয়া তুলিয়া বাঙ্গালী অন্ধ ছাত্রের লিখন পঠনের আশ্চর্য্য সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রগণকে বিবিধ সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত জীবনোপায় উপযোগী নানা শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া চিত্তরঞ্জিনী শিক্ষার জন্যও সঙ্গীতাদি বিচিত্র ব্যবস্থা আছে। প্রধান শিক্ষকমহাশয় কিরূপ মাতৃস্নেহে বালক বালিকাগুলিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিলাম। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টি-হারা বন্ধুগুলি কেমন অনর্গল লিখিতেছে, পড়িতেছে, গণিত বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছে, রুগ্ন সহপাঠীর শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষা করিতেছে, ঠিক যেন চক্ষুষ্মানের মত ক্রীড়া কৌতুক সাধ আহ্লাদে রত, সত্য সত্যই দেখিতে এগুলি অতি পুলকসঞ্চারক জীবনচ্ছবি। এই অন্ধ বিদ্যালয় হইতেই একটী ছাত্র সে বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শোক সংবাদ

আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্যময়ী সহধর্ম্মিনী শ্রীশ্রীসারদা দেবী বিগত ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার, রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় বাঙ্গালীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাযোগে অনন্তধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

৩০এ শ্রাবণ, ১৩২৭

ধর্ম্ম-সংঘ

তবু আরবার সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, বাংলার জাগরণ কি সত্য? ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে এই যে একটা বাঙালীর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে ইহা কি জাগরণের লক্ষণ? যদি তাই হয়, তবে আর তোমরা হতাশ ভগ্নমনে মাটীর উপরে বসিয়া থাকিও না, উঠিয়া দাঁড়াও—যাহারা সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের সহিত আত্মশক্তি নিয়োগ কর, দুর্গম যাহা তাহাকে সুগম ও সহজ করিয়া তোল।

চাই জয়, চাই সিদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্ম্মের অবতারণা করিয়া সাধক চলিয়াছে জাতির একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, কর্ম্মের ধারা স্বতন্ত্র, নানা মত ও পথের অন্তর্গত, কিন্তু লক্ষ্য কি এক নয়, আর মানুষ আমরা, আমাদের বিজ্ঞানময় স্থানে কি প্রকাশের স্বাভাবিক বৈষম্যের মধ্যে অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধান মিলে না? কেবল মন আর বুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া আর আমাদের চলা হইবে না, ইহারও ঊর্দ্ধে যে বিজ্ঞানশক্তি আছে উহাকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইবে, অসংখ্য বন্ধন ও বিচিত্রতার মাঝেই আমাদের মুক্তি ও ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কাজ কঠিন নয়, কিন্তু বর্ত্তমান মন ও বুদ্ধির সাহায্যে ইহা সংসিদ্ধ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই মন ও বুদ্ধিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিজ্ঞানস্পর্শে ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করা চাই, এই পরিবর্ত্তিত নূতন মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া যে নূতন ধর্ম্ম সমাজ গড়িয়া উঠিবে—তাহাই নূতন যুগের আদর্শ, পূর্ণ-যোগীর সিদ্ধ সৃষ্টি।

ভারতের শিক্ষা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সাধনা? তো এই অখণ্ড

ঐক্যকে অনুভব করা, এবং যোগশক্তি সাহায্যে বাহিরে ইহাকেই আঁকিয়া তোলা। কোথায় একটি রেখায় মনোরম চিত্র ফলিয়া উঠে? বহু রেখার সমবায়ে শিল্পী তার মানসসৃষ্টিকে ফুটাইয়া তোলে। বাংলায় যে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যে নূতন চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহার জন্য অসংখ্য প্রাণের তুলির আঁচড়ে অসংখ্য রেখার সৃষ্টি হইয়াছে—ইহার কোনটাই নিষ্ফল হইবে না, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, পরস্পরের সহিত পরস্পর যথারীতি যুক্ত হইয়া নূতন পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত করিবে।

অন্তরায় কর্ম্মবৈচিত্র্যে নয়, অন্তরায় আমাদের মনে বুদ্ধিতে, ঘোরতর অন্তরায় আত্ম-আতিশয্যে। আমি শ্রেষ্ঠ, জাতির মুকুটমণি, কেননা আমার মত কবি, আমার মত বৈজ্ঞানিক, আমার মত সাহিত্যিক, আমার মত অধ্যাত্মবিদ্ কে আছে? কিন্তু এই শ্রাবণের অজস্র বারিধারায় মাথা পাতিয়া এক হাঁটু কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া যে কৃষক বাংলার মাটী খুঁড়িয়া আমাদের জন্য আহার্য্য আহরণ করিতেছে; আগুনের হল্কায় ললাট দগ্ধ করিয়া গলিত লৌহ হাতুড়ির ঘায়ে পিটিয়া পিটিয়া যে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সংস্থান করিয়া দিতেছে; তাহার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্বের কথা ভুলিয়া যাই কেন? কেন আমার মনীষা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতির প্রতি ব্যষ্টির অতুল আনুকূল্যের কথা বিস্মৃত হই? কেন বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অসংখ্য সংগ্রহকারীকে দরিদ্রতার কঠোর বন্ধনীবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখি—প্রকৃতির নির্ম্মম আঘাতে মুহূর্ত্তের জন্য যখন চৈতন্য ফিরিয়া পাই—তখন চীৎকার করি—ঐক্যের অভাব অনুভব করিয়া সাতকোটী ভাই বোন এক করিবার রাগিণী আলাপ করি—কিন্তু হায়! অহঙ্কারের দৃপ্তমুকুট মাথা হইতে তো খসিয়া পড়ে না, জনশক্তির স্কন্ধদেশ হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত পদব্রজে মহাতীর্থে ছুটিয়া চলিতে তো ভরসা হয় না; বরং শ্রেষ্ঠ আমি, মহৎ আমি নেতা আমি, আমার পায়ের ধুলায় অপর সকলে যে কৃতার্থ হইয়া যায়! হায় রে, ভুল কি ভাঙ্গিবে না? জাতির ঐক্যসূত্র কোথায় জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সন্ধান কি কেহই করিবে না? বাংলার সাধনা কি কেবল মন আর বুদ্ধিগত হইয়াই থাকিবে, উপরের অজস্র অমৃতবর্ষণে সবখানি নূতন হইয়া একবার মুক্তির আনন্দে বিশ্বের দেউলে বাঙ্গালী কি বিজয়-সঙ্গীত গাহিবে না?

য়ুরোপের জনশক্তি ভাঙিয়া দিতে চায় ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণপ্রাচীর। সম্পদ বিশ্বের একটী কোণে স্তূপীকৃত থাকিবে না, জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে উহা সমান ভাবেই জনসাধারণে বিতরিত হইবে—বাহিরকে লইয়া এই যে টানা-টানি ইহার ফল বিপ্লব, রক্তারক্তি, আভিজাত্যশ্রেণীর সহিত শ্রমজীবীর তুমুল সংগ্রাম।

ভারতে আমরা অন্তরপরিবর্ত্তনের বিপুল শিক্ষা প্রচার করিতে চাই। বাহিরে যেখানটী যেমন সাজে, অন্তর দিয়াই তাহা নির্দ্ধারণ করিব, অন্তরের মিলন দিয়াই বাহিরের বৈষম্যকে সুন্দর করিয়া তুলির, ঐক্যের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের সত্যতা উপলব্ধি করিব।

যে মাথায় মোট বহিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে, যে সুরম্য কক্ষে তুলির আঁচড়ে মানসজগতের গোপনরহস্য রেখায় রঙে ফলাইয়া তুলিতে যোগমগ্ন, বাহিরের দিক হইতে একজনের কাজ অপরজনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বের লীলাখেলায় উভয়েরই প্রয়োজন আছে, এবং উভয়ের জীবনেই বিশ্বপতির পরম আনন্দ সমান ভাবেই বহিয়া ছুটিয়াছে—এই চরম দৃষ্টি, চরম জ্ঞান সকল মানুষের মধ্যেই যদি প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঘৃণা বিদ্বেষ, উচ্চ নীচ, হৃদয়ের ভাব-বৈষম্য তিরোহিত হইবে।

মানুষ যাহা করে—উহা তাহার মন বা বুদ্ধির ইচ্ছাকৃত নহে, মন ও বুদ্ধির উপরে যে শক্তিকেন্দ্র আছে উহা হইতেই নিরূপিত হয় তাহাকে কি করিতে হইবে, এবং কেবল কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াই এই কেন্দ্র ক্ষান্ত হয় না, তদুপযোগী আধারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তি সঞ্চারও করিয়া দেয়; সুতরাং মানুষের সমাজজীবনে, বিচিত্র কর্ম্মের মাঝেও, আমরা যদি অন্তরগত এই মিলনের সত্যসূত্রটী আবিষ্কার করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তেই জগতের ঘোরতর সমস্যা নিরাকৃত হয়।

আমাদের সাধনা সে তো কেবল ভাবসাহিত্যের মধুর বাক্যবিন্যাস নয়, বিজ্ঞানলোকের অলৌকিক স্বপ্নগুলিকে মর্ত্ত্যের বুকে সত্য করিয়া ফুটাইয়া তোলা। এত কথা বলার মাঝে, মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া হয়তো কিছুই বলা হইল না, কিন্তু যাহা করিবার তাহার ক্ষেত্র আমরা ধীরে ধীরে নির্ম্মাণ করিয়াছি—বাংলার নবীনকে কর্ম্মের মাঝেই এবার পাইতে হইবে। কথা সে তো বহুদিন শেষ হইয়াছে; সাধনার বিপুলক্ষেত্রে, জীবনের

প্রতি মুহূর্ত্তের নব নব অভিজ্ঞতার আদান প্রদানে, নূতন যোগের হেঁয়ালি কেমন মূর্ত্ত হইয়া উঠে—তাহা জীবন দিয়াই বুঝিতে হইবে। এইজন্য আজ আমরা বাংলার সকল শ্রেণীর কর্ম্মীর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গত মিলনের প্রত্যাশা করি। বাংলার সাধনক্ষেত্রে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কেন্দ্র সৃষ্টি হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে আমাদিগকে একেবারেই মিশাইয়া দিতে চাই—স্ব স্ব স্বভাবকে হারাইয়া ফেলিবার জন্য নহে, কেননা উহা সনাতন, কোনও কারণে বিনষ্ট হয় না, পরন্তু সকলে মিলিয়া বাংলায় ধর্ম্মসংঘ প্রতিষ্ঠার কালকে ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবার জন্য।

সাড়া পাইব কি? হে বাংলার ধর্ম্মপুরোহিতগণ! বিজ্ঞানের মণি-কোটায় বসিয়া যদি আত্মধর্ম্মকে নিবিড়ভাবে পাইয়া থাক, তাহা হইলে এই মিলনের মাঝে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইবে না, অহঙ্কারই ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে। কাহার সাহস আছে, কে আজ আপনার গণ্ডী উঠাইয়া বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে মিলন প্রত্যাশায় মুক্ত হৃদয়ে দাঁড়াইতে প্রস্তুত, সিদ্ধপীঠ সোণার বাংলায় আজ যে লীলা সংঘটনের সূচনা কল্পজগতে সূচিত হইতেছে, তাহা যে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবে—এই মহালীলার সহতীর্থ কে? কাহার হৃদয় আজ মহাকালীর পদভরে অকম্পিত থাকিবে—আগাইয়া আইস, আমার সবখানি দিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি, ধন্য হই।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা

ব্যবহারিক জগতের মত অধ্যাত্ম সাধনাতেও যে তুমি পরমুখাপেক্ষী হইতে চাও? পরাধীনতার নিবিড় বন্ধন তোমার আত্মাকেও স্পর্শ করিয়াছে নাকি? স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, অন্তর্জগৎ হইতেও যদি নির্ব্বাসিত হইয়া থাকে—মুক্তি তোমার সুদূরপরাহত, কেবল অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে তুমি দাসখৎ সহি করিয়াছ, এমন নহে, নিজের অন্তর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য পরের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছ!

* * *

স্বভাব আমাদের এমনই হইয়াছে। বাহিরের অবস্থা—অন্তরকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে, পরের গোলামী না করিয়া জীবনযাত্রা যেমন আমাদের অসম্ভব, আত্মাকে পাইতে হইলেও, পরের পায়ে লুটাইয়া পড়া যেন অনন্যগতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ওগো প্রভু, আমায় মুক্তি দাও, তোমার পায়ের ধূলায় আমায় সার্থক কর, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে এমনি দাস্যভাব যেন চরম সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা কি মুক্তি?—অন্তরে বাহিরে এমন করিয়া বাঁধা পড়িলে জাতির দুর্দ্দশা যে শোচনীয় হইবে—ইহাতে আর কথা কি আছে?

* * *

বজ্রপাতের মত কথাটা ভক্তমণ্ডলীর মাথায় গিয়া বড় বাজিবে? কিন্তু করা যায় কি? বাহিরের বন্ধন, বাহিরের আঘাতে বরং শ্লথ হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্তরের বন্ধন সে যে ভীষণ, সে যে স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে অতি নির্ম্মমভাবেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। মানুষের চরণে মানুষ বাঁধা পড়িয়া, আত্মপ্রকাশের পথে যদি বিঘ্ন উপস্থিত করে, তবে গড্ডলিকা প্রবাহের মত, এত বড় বিশাল জাতিটা মরণের দিকেই ছুটিবে, যদি জীবন আনিতে চাও, প্রতি ব্যক্তির আত্মমর্য্যাদা, স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটাইয়া তোল, প্রতি ব্যষ্টি ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ আপনাকে উপলব্ধি করুক—নিজের সকল শক্তি অবধারণ করিতে, সকল সম্ভাবনা সাধন

করিতে, প্রতি আধার উপযোগী হইয়া উঠুক—ইহাই না বর্ত্তমান সাধনার চরম লক্ষ্য ?

চৈতন্যকে তো তোমরা হাততালি দিয়াই উড়াইয়া দিলে, মাটীর বুকে লুটাইয়া চোখের জলে গৌরাঙ্গভক্তি খুব প্রচার করিলে, রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া প্রমাণ করিতে কত সাজ সাজিলে, মঠ মন্দির কত নির্ম্মাণ করিলে—তারিপর বাংলায় মহাপুরুষের সংখ্যা হয় না, সেদেশে এত অবতার, এত মহাত্মার আবির্ভাব, সে-দেশের মানুষ পেটের দায়ে গলায় দড়ি দিয়া মরে কেন ? পুকুরের পাঁক তুলিয়া জঠর জ্বালা নিভায় কেন ? ছেঁড়া নেকড়া কোমরে জড়াইয়া কুলস্ত্রীগণ লজ্জায় অধোমুখী কেন ? আর শিয়াল কুকুরের চেয়েও তোমরা এমন অধম, এমন ঘৃণ্য কেন ? কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি ?

জানি, ভারতের প্রাণ ধর্ম্ম। ধর্ম্মবলই জাতির পরম শক্তি। কিন্তু সে কোন্ ধর্ম্ম ? প্রেম ভক্তি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু সে কি প্রেম, কি ভক্তি ? একপাল ভক্ত জুটিয়া, একজনকে স্কন্ধে চড়াইয়া অবতার প্রচার করিতেই কি বঙ্গে ধর্ম্মপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে—প্রেম ভক্তির উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তির দ্বিতীয় পথ কি আর নাই ? বাঙ্গালীর আবেগময় প্রাণে কবে সত্য উৎসাহ জ্বলিয়া উঠিবে, বাঙ্গালীর মন কবে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিতে পূর্ণ হইবে, কবে বাঙ্গালী ভগবানের স্পর্শে জনে জনে ধন্য হইবে ?

স্বভাব আমাদের পরের পায়ে আপনাকে লুটাইয়া দেওয়া, কিন্তু বাংলার ধর্ম্মপুরোহিত যাঁহারা তাঁহাদিগকে আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, ভক্তের প্রথম আবেগ নিঃশেষ করিয়া প্রত্যেকের জীবনে নিজের সকল অনুভূতি, সকল দর্শন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, গুরুর মত যদি ভক্ত না হয়, তবে ভক্ত আবার যখন গুরু হইয়া উঠিবে তখন তাহার ভাব আবার তদপেক্ষা অল্পশক্তিমান হইবে, এইরূপে ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রে অধোগতিই তো অবধারিত। না, তাহা নহে; আজ এমন ধর্ম্মক্ষেত্র, এমন সাধনা নির্ম্মাণ ও প্রবর্ত্তন করা চাই, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করিবে, আপনাকে কোন অংশে অপরের অপেক্ষা হীন তুচ্ছ মনে করিবে

না, একেবারে সকলকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

* * *

পূর্ণ-যোগ ইহার জন্য প্রশস্ত। যিনি ইহার সিদ্ধি-জীবন দিয়া উপভোগ করিয়াছেন—তিনি সাহায্য করিবেন সকলকেই, সকলের মধ্যেই ভগবান্‌কে জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, এইরূপ সাহায্যকারী অবতার নহেন, তথাকথিত গুরুও নহেন, তাঁহার সহিত সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহা মন ও বুদ্ধির চালিত কিছু নহে, সে সম্বন্ধ একেবারে আত্মার সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ পালন করিতে সাধককে তাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে হয় না, বরং তুল্য অনুভূতিই দিন দিন জাগ্রত হইয়া উঠে, কেননা পূর্ণযোগে পূর্ণসিদ্ধিই আনয়ন করে, ক্রমভেদ থাকিতে পারে না।

* * *

আমরা বাংলার ধর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ সাধনারই প্রবর্ত্তন দেখিতে চাই, ধর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে, একজনকে ভগবানের অবতার বোধে সহস্রজনের ভক্তবেশে অবস্থান দেশের উন্নতিসূচক নহে, যিনি অবতার তাঁরও কর্ত্তব্য সকলকেই অবতার করিয়া তোলা—নতুবা ভারতের অতীত ধর্ম্মপ্রবাহের মত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মও জাতির জীবনে কোন স্থায়ীশক্তি দিয়া যাইবে না, অবতারের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য প্রশিষ্যগণ নেড়া নেড়ির দলে পর্য্যবসিত হইবে, আর মঠ মন্দিরগুলি ইঁদুর চামচিকা গোচক প্রভৃতি নিশাচরগণের বিচরণক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, নূতন বাংলাকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি।

বিজ্ঞানের কথা

জড়ের মধ্যেও জীবন আছে—কিন্তু উহা সুপ্ত। প্রাণের আভাস মাত্রেই জড় জাগ্রত হইয়া উঠে, শৈবালে, তৃণে, লতায়, বৃক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। জড় শুধুই জড় নহে। বিশ্বপ্রকাশের সকল সম্ভাবনাই উহার মধ্যে নিহিত থাকে।

জড়ই হইতেছে জগতের ভিত্তি। কেবল জগৎ কেন মর্ত্তালীলার যে পরমা চৈতন্য যে ব্রহ্মশক্তি, সে জড়ের গর্ভেই ভবিষ্যৎ অনন্ত সৃষ্টির বীজ লইয়া অবস্থিত, জড়কে ভেদ করিয়াই থরে থরে আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান যেন জড়ের মধ্যেই আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্ব মহিমা প্রকাশ করিয়া তুলিতেছেন, এই প্রকাশের জাগ্রত ভঙ্গীই যোগশক্তি।

উদ্ভিদ্‌জীবন প্রাণ পাইয়াছে কিন্তু জড়দেহ ছাড়াইয়া চৈতন্য প্রাণে গিয়া এখনও পৌঁছায় নাই, সে অচল হইয়া বিশ্বপ্রকাশের একটি স্তরের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তারপর মানুষ, দেহ প্রাণ অতিক্রম করিয়া মূর্দ্ধাদেশে মনের সন্ধান পাইয়াছে, এই তিনটি স্তর লইয়া বিশ্ব-প্রকাশ এখানে সার্থক।

মানুষের চৈতন্য শুধু জড় দেহকে লইয়া নহে, জড়ের পশ্চাতে যে প্রাণ, তাহারও উর্দ্ধে যে মন, এই তিনটিকে সে একত্র করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতে চাহে। এই দেহ প্রাণ মনের খেলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আত্ম-চৈতন্য যখন ইহারও উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, সেইদিন মানুষ সত্য সত্যই মুক্তিলাভ করিবে—এই মুক্তি জীবন্মুক্তি—দেহ হইতে মুক্তি, প্রাণ মন হইতে মুক্তি, এইখানে দেহের প্রাণের মনের বন্ধন মানুষকে আর অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে না, যন্ত্রারূঢ় মানবাত্মা সেদিন ইচ্ছামত দেহ প্রাণ মনকে পরিচালিত করিবে, প্রয়োজন মত ভাঙ্গিবে গড়িবে—মানুষের আত্ম-জন্ম এইখানে আসিয়া সার্থক হইয়া উঠিবে।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, হয়তো সে তাহা জানে না—তাহার অহমিকা এখনও জাগিয়া উঠে নাই, কিন্তু এই দেহ প্রাণ মন হইতে সে বঞ্চিত নহে।

আঘাত পাইলে বেদনার অনুভূতি আছে। পশুর জীবনেও প্রাণ মনের লীলাভঙ্গী আছে, কিন্তু মানুষের মত তাহার সবখানি জানিবার অধিকার নাই—কেবল মানুষ জানিয়াছে জগতের তিনটী স্তর, শরীর মন আর প্রাণ। এই জ্ঞান তাহার একদিনে জন্মায় নাই, ইহাও বহু তপস্যার ফল।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহাকে স্বীকার করাই ছিল মানুষের স্বভাব। কিন্তু অনুভূতিকে মানুষ চিরদিন উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে নাই, অন্তর দিয়াই সে দেখিয়া আপনার প্রাণ ও মনকে চিনিয়াছে এবং ইহাদের কেন্দ্রস্থানও নির্ণয় করিয়াছে।

অধঃ, মধ্য ও ঊর্দ্ধ এই তিনটী ভাগে আমরা আমাদের আধারটীকে বিভক্ত করিতে পারি। জড়জীবনের যে চাঞ্চল্য—তাহা স্নায়বিক শক্তি সাহায্যে পরিচালিত হয়, অধঃ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ইহার লীলাক্ষেত্র, তদূর্দ্ধে হৃদ্‌পিণ্ড অবধি প্রাণের স্থান, ইহার উপরে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত মন অবস্থান করে, "প্রবর্ত্তক" পাঠক "সাধনার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় অবগত হইয়াছেন।

সাধনা এই তিনটি স্তর লইয়া। মানুষ এই তিনটী স্তরের খেলায় আত্মহারা হইয়া কখন পশু, কখন মানুষ। এই তিনটি স্তরের কোনটিকেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না; জীবন দিয়া যদি মুক্তির আস্বাদ করিতে হয়, তবে এইগুলি অটুট রাখিয়াই আমাদের সাধনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের মানুষ, মনের অনুশীলন করিয়া, অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, এই সমুদয় মনের সৃষ্টি। কিন্তু এই মনের একটা সীমা আছে, সেইজন্য মানসসৃষ্টি নিখুঁত হয় না। আর এই মন দিয়া আমরা যাহা গ্রহণ করি সেগুলি নির্ভুল সত্য নহে। আমরা যে যোগের কথা বলি তাহা আর কিছুই নহে, মনেরও ঊর্দ্ধে আর এক জগতে উঠিয়া সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করা।

মন, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু প্রাণ ও শরীরের টানে উহা স্বভাবতই নিম্নমুখী। আমাদের মন কখনও ঊর্দ্ধে উঠিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সাধনে তৎপর হয়, আবার পরক্ষণে মাটীর উপর আছড়াইয়া পড়ে, ভাবে আমাদ্বারা জগতের কিছু হইবে না। মনের স্বভাব এই, মনকে কেন্দ্র করিয়া বৃহৎ কিছু করা যায় না।

আমরা প্রাণকে চক্ষে দেখি নাই, মনের রূপও কিছু বলা করি

নাই, অথচ এই গুলিকে স্বীকার করিয়াছি, কেননা দেখার মত অনুভূতিরও একটা দর্শন আছে, এই অনুভূতির সাহায্যে প্রাণ ও মনকে ধরা হইয়াছে এবং কেবল ধারণা করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নাই, এগুলির কেন্দ্র কোথায় এবং ইহাদের কি কি বৃত্তি, তাহাও সুনিশ্চিত জানা গিয়াছে।

এই জানার ফলেই—জ্ঞানের সীমা মনকে অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে চায়। কিন্তু আধারের বাহিরে যে আবার কিছু থাকিতে পারে, এইরূপ সংশয় এই সাধনার পথে ভীষণ অন্তরায়, সেইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্ আমাদের কথাগুলিকে একেবারেই কল্পনা এবং খেয়াল বলিয়াই উড়াইয়া দেন। মানস জগতের অপূর্ব্ব রহস্য যে দিন আত্মবিদ্ দার্শনিকের চক্ষে প্রথম ধরা পড়ে, তখনও জড়বাদীর দল তাহাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র জগৎ এক্ষণে মানস দর্শন সত্য বলিয়া শুধু স্বীকার করা নহে, ইহার ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমরা যে তুরীয় বা বিজ্ঞান সাধনার কথা আরম্ভ করিয়াছি—ইহা মনের ঘরে বন্দী মানুষের কাছে স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু ইহা একটা সত্য আবিষ্কার।

মানুষ, সে আপনাকে যতখানি জানিয়াছে, সেটা একেবারেই সত্য মানুষের ছায়া, একটা তরল বায়বীয় শরীর, তাহার পরিবর্ত্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় আছে, কিন্তু সত্য মানুষটির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, পরিবর্ত্তনও নাই, সে অটলপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইচ্ছামত মূর্ত্ত শরীর লইয়া খেলা করিতেছে।

এইখানেই আমাদের চৈতন্যকে চির প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ভূমার আনন্দ সম্ভব হইবে। আমরা শরীর প্রাণ বা মন নহি, এই সকল আমাদের খেলার যন্ত্র, কিন্তু যন্ত্রের সহিত আত্মচৈতন্যকে এমনই ভাবে বিজড়িত করিয়াছি, যেন ইহা ব্যতীত অপর কিছু আমরা এই সত্য কথাটা আরব্য উপন্যাসের মতই অলীক এবং বিস্ময়প্রদ বলিয়া হাসি পায়।

আবার সংস্কার ও অজ্ঞান এমনিই ভীষণ, এমনিই দুরতিক্রমনীয়—সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষ আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনা করিতেছে—কিন্তু এই ছাড়াইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে লীলার ক্ষেত্রটীকে পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে—আজ আমাদের সত্য ধর্ম্মটীকে পাইবার জন্য অতি নির্ম্মম ভাবেই সংস্কার ও অজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

সাধনার কথা "প্রবর্ত্তকের" আষ্টে পৃষ্ঠে নানা ছন্দে বলিয়া আসা হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে, কেননা একেবারে একটা নূতন সাধনা প্রবর্ত্তন

করা সহজ আজ নয় এবং একটি প্রবন্ধে তাহার সবখানি বলাও সম্ভবপর নহে। তবে এই বিজ্ঞানময় স্থানে আত্মচৈতন্যকে উদ্ধৃত করিতে হইলে মানুষকে আর মন লইয়া ঘর করা চলিবে না—গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহাতেই আত্ম উৎসর্গ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—কেননা ধর্ম্মের যে বিরাটরূপ পার্থের নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মত বীরের হৃদয়েও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। এই হৃদয় মন লইয়া আমরা সত্যধর্ম্মের আস্বাদ করিব এমন ধারণা বাতুলতা মাত্র, যোগের দ্বারা এই সকলের একেবারেই পরিবর্ত্তন হওয়া চাই, নতুবা পুরাতনের ক্ষেত্রে এই নূতন যোগ ফলপ্রসূ হইবে না।

আত্মসমর্পণযোগী হইবেন একেবারেই নিরহঙ্কার। একটা কথা আছে—"এমন সাধনা দিব যে বাপের নাম ভুলিয়া যাইবে"—সত্য সত্যই ভগবানকে জানা ও পাওয়া বড় সহজ কথা নহে, অথবা আপনাকে একেবারে ভুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু আপনহারা হওয়াই যে কঠোর তপস্যা।

জগতের যাহা কিছু ভাল মন্দ, পাপপুণ্য, ন্যায় অন্যায়, সকলই ভাগবত সত্তায় প্রতিভাসিত, মনের খণ্ডতায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, আমরা সত্য সত্যই যখন অসীম সত্তার সহিত সংযুক্ত হইব, তাঁর বিচিত্র লীলার মধ্যে নিরানন্দের আভাস থাকিবে না। আমি যখন হইব সেই বিশ্বসত্তা, জগতের সব কিছুই হইবে আমার সৃষ্টি, অথচ এই সকল বিচিত্র যন্ত্রের উপরে বিচিত্র কর্ম্মের প্রেরণাই আরোপ করিব। আমি সবের মধ্যে হইলেও, আমার নির্দ্দিষ্ট আধার বিশিষ্ট কর্ম্মের দ্যোতক হইবে, সে এক অপূর্ব্ব লীলা, অপূর্ব্ব আনন্দ—কথায় কেবল লোভই বাড়িয়া যায়—সাধনাকে তো ব্যক্ত করিতে পারি না—আজ "প্রবর্ত্তক" এক নূতন পর্য্যায়ে উপস্থিত—ভগবান নূতন কথা ব্যক্ত করিবার শক্তি দিন—সিদ্ধক্ষেত্র বাংলা আজ নূতনের অভিযান করুক।

অর্থসমস্যা

বাংলায় অনেক কাজ, কিন্তু কাজ করবার মত টাকা নেই। যাদের টাকা আছে তাদের মতামতের সঙ্গে তরুণজাতির তেমন মিল হয় না, কাজেই এই নূতন জাতিটাকে কাজ করতে হ'লে টাকার সংস্থান তাদের করতেই হবে।

গোলামী, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, প্রভৃতির সাহায্যেই অর্থ সংগ্রহ হ'তে পারে, অবস্থানুসারে এই সবগুলির কোনটীকেই বাদ দিলে চল্‌বে না। উপস্থিত সর্ব্বপ্রধান ভরসা গোলামী। কেননা অপর বৃত্তি অবলম্বন করতে হলে' মূলধনের প্রয়োজন, নূতনজাতির সে মূলধন কোথায়?

এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কাহারও সাহায্য চাই না—তবে সাহায্যটা যত নিঃস্বার্থ হয় ততই মঙ্গল, দানের সঙ্গে দাতার যদি আশা আকাঙ্খা জড়িয়ে থাকে, কর্ম্মীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক —কর্ম্মক্ষেত্রে অনর্থক ঘুরপাক খেয়ে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য। সেইজন্য হয় দেশবাসীকে এই তরুণজাতির কর্ম্মে অজস্র অর্থদান করতে হবে, কোন বিশিষ্ট সাফল্যের আশা না রেখে, নয় কর্ম্মীকে আগাগোড়া সব নিজের শক্তি দিয়েই সৃজন করে' নিতে হবে।

স্বদেশীর প্রথম যুগে অনেক কাজ চাঁদার টাকায় আরম্ভ হয়েছিল, তারপর বাংলার কাজ যখন বিপ্লববাদ হয়ে দাঁড়াল তখন দেশের লোক মজা দেখতে পেছপাও হয় নাই, কিন্তু একেবারেই হাতগুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কাজেই ডাকাতি না করে' ছেলেদের কাজ চালাবার উপায় ছিল না। আইন উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু বিধাতার বরে সে সব দায় থেকে তরুণ বাঙ্গালী রক্ষা পেয়েছে, বাংলায় এখন নূতন কাজ আরম্ভ হয়েছে—প্রবীন আরাম কেদারায় বসে যতই রাজনীতির বোলচাল আওড়ান, নবীন আর সেদিকে ঘেড়োবে না, তাদের সাম্‌নে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রসারিত, এইখানেই তাদের জীবনের সব দেয়টুকু নিঃশেষে দিয়ে যেতে হবে।

নবীনজাতির রাজনীতি নেই। আছে সমাজ, ধর্ম্ম, আর শিক্ষা। নূতন

সমাজ গড়ে তুল্‌তে হবে, ধর্ম্মের সত্যরূপটীকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, আর আমাদের দেশের শিক্ষার ভার আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। এই কাজের জন্য অজস্র অর্থ চাই। সে অর্থ দেশের লোকের নিকট থেকেও যেমন আশা করি, রাজশক্তির সাহায্যও সে পাবো না এমনও আমরা মনে করি না, তবে সকল সাহায্যই যেন নিঃস্বার্থ হয়, আমাদের প্রেরণানুযায়ী আমরা সমাজ ধর্ম্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌বো—প্রাচীনদের কথা কানে নেব না—আর রাজশক্তিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি আমাদের দিকে অনুক্ষণ রাখ্‌তে বলি। কিন্তু অনর্থক বাধা পেতে ইচ্ছা করি না।

কোন দিক থেকে সাহায্য পাবার আগে, আমাদের নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে চাই—তাই যখন দলে দলে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বদেশসেবক কোম্পানীর অতিথিশালা থেকে ফিরে এলেন, আর তাঁদের অসহায় অবস্থা দেখে করুণার্দ্রহৃদয়ে দেশপ্রাণ বিজয়বাবু ও ইন্দ্রভূষণকে বাহিরেও একটা অতিথিশালা খুল্‌তে হ'ল, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে জাতির দ্বারে ধন্না দেওয়ার আয়োজনেরও কোনও অভাব নেই, এসব দেখে আমরা তখন তার ঘোরতর প্রতিবাদ করেছিলাম—যাঁরা দেশের কাজে ঘরের বাহির হয়েছিলেন, তাঁরা উপায় উপার্জ্জন করে' যে জীবন চালাতে হবে—এতটা ভাবেন নাই—এ অবস্থাটা আমরা মনুষ্যত্বের যথেষ্ট পরিচয় বলে' কোনদিনই স্বীকার কর্‌তে পার্‌বো না।

আমরা নিজের পেট চালাবার জন্য দুটো জিনিষ শিখে রেখেছি—একটা গোলামী আর অপরটি ভিক্ষা। স্বদেশীযুগে অন্য এক বৃত্তি দেশে আরম্ভ হয়েছিল, উহা রাজনীতিক ডাকাতি, ইহার মধ্যে একটীও জাতিগঠনের সুষ্ঠু বিধি নহে।

এই বৃত্তিগুলি ছেড়ে দিলে—বাকী থাকে শিল্প বাণিজ্য আর কৃষি। সকলেই স্বীকার কর্‌বেন স্বাধীন উপজীবিকাই মনুষ্যত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়, কিন্তু মূলধনের অভাবে ইচ্ছা থাকলেও আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হতে পারি না। দেশে এইবার মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে।

একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে—মূলধন হ'লেই যে ব্যবসা টিকে যাবে এমন কোন কথা নেই, কেননা বাঙ্গালী মাথা বামিয়ে "মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার" হিসাবে ক্ষুধিত সিংহের মত একবার লম্ফ দিয়ে শিকার সংগ্রহ কর্‌তে শিক্ষা পেয়ে এসেছে, নিরবচ্ছিন্ন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে কোন কাজই সে করতে পারে না। এইজন্যই তো দশটা পাঁচটার চাকুরী বাঙ্গালী এত পছন্দ করে। ব্যবসা এরূপ নয়। যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের মরণের অবকাশও নেই—যমকেও ব্যবসায়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

সেক্রেটারী টেবিল নিয়ে, দশটা পাঁচটা কলিকাতার সুরম্য কক্ষে বসে যদি ব্যবসা চালান সম্ভব হয়, বাঙ্গালী তাতে গররাজী হবে না, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম করতে হ'লে তাদের খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে ওঠে।

বাংলায় শ্রমশিল্প উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। কলিকাতায় অফিস খুলে কয়টা ব্যবসা চলবে? কৃষি ও শিল্পব্যবসায়ে বহুলোক প্রতিপালন হতে পারে, কিন্তু উহা ছোটলোকের কাজ মনে করে' আমরা কিরূপ ভদ্রলোক হয়ে উঠ্‌ছি—তা আর লিখে জানাতে হবে না—ভিক্ষা যখন মিলে না, জুয়াচুরী হয় উপজীবিকা—ছিঃ বাঙ্গালী! চাল দেখাতে গিয়ে অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠ্‌ছে।

একটু লেখা পড়া শিখ্‌লে—গ্রাম্য ব্যবসাগুলি আর মনে ধরে না; সহরে গিয়ে তদপেক্ষা যে আর্থিক উন্নতি অধিক হয় এরূপও নয়, তবে ভদ্রলোক হবার সাধে একবেলা আহার জুটলেও, মনের তৃপ্তি বড় তৃপ্তি।

একজন ধোপার ছেলে, আমাদের "প্রবর্ত্তক" প'ড়ে তার লেখা পড়া শেখ্‌বার উৎসাহ হ'য়েছে; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাপড়ে আছাড় দিয়ে একজন ভদ্রবন্ধুর বাড়ীতে পড়াশুনা করে! বন্ধুটী আমাদের জানিয়েছেন এই কাপড় আছড়ান কাজ থেকে ছাড়িয়ে অন্য কাজ দিলে ছেলেটীর বড় উপকার করা হয়। আমরা বলি, কেন? কাপড় আছড়ে যদি সে যোগ নেয় তবেই তো যোগের শিক্ষা সত্য হ'য়ে উঠবে, মহাভারতের যুগে, মাংসবিক্রয়কারীর মুখে উপনিষদের কথাই বেরোতো, এখন উপনিষদ শুনতে হ'লে, ফাঁকিদার সন্ন্যাসীর চরণে ধন্না দিতে হবে, কাজ ক'রলে শিক্ষা হয় না, বা মনের উন্নতি দেখা যায় না, এ অসত্যটীকে উড়িয়ে দিতে হবে, সেই জন্য আমাদের হারাধন, ভার্চুনে কামান চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু একখানা তক্‌মা বুকে ঝুলিয়ে সুন্দরবনে চাষার সঙ্গে লাঙল দিচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের বাবু সাজ্‌তে হয় তা হ'লেই তো দেখছি বাবুর জাতে দেশটাকে রসাতলে দেবে।

মূলধনের জন্য আমরা একটা নূতন ফন্দী খাটিয়েছি, পাঁচ দশ টাকার অংশ বিক্রয় ক'রে, একত্র কতগুলো টাকার যোগাড় করা আর দু দশ খানা বৌবাজার থেকে কেদারা আর টেবিল কিনে কলিকাতায় এক আফিষ খুলে বসা—এ দিকে যে সব কাঁচা মাল উৎপন্ন কর্‌লে সে-ব্যবসা চ'লবে, তার দিকে একেবারেই কারু দৃষ্টি নেই—এমন মূলে হাভাত জাত কখন দেখেছ—এরা আবার বুদ্ধিমান ব'লে পরিচয় দেয়।

—আমাদের একটা কাঠের কারখানা আছে—শতাধিক লোক তাতে কাজ করে, বাটালি মুগুর ধ'রে একখানা কাটারির সাহায্যে এখানকার শ্রমজীবীরা মাসে কুড়ি টাকা থেকে আশি টাকা উপায় করে, আর বাবু তোমরা ধীরে ধীরে শ্রমশিল্প ছেড়ে চাকুরী বৃত্তিতে কত টাকা উপায় কর বল তো।

দেশের শ্রমশিল্পগুলি বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে—বাঙালীর অবস্থা উন্নত হ'লে এত কথা বল্‌তাম না, তার সভ্যতা মানসিক উন্নতির লক্ষণ নয়, শ্রমবিমুখতাই ইহার কারণ—গুজরাট থেকে আমাদের কারখানায় কাঠ চিরে, মাসে দুইজনে শতাধিক টাকা উপায় করে—হায় বাঙ্গালী! ফাঁকি দিয়ে কখন বড় হতে পার্‌বে না, আর আমরা দেশের নেতৃবৃন্দকে বলি কথায় কথায় যৌথ কারবারে ডিরেক্টার হয়ে ব্যবসার-ক্ষেত্রটাকেও য়ুরোপের ব্যর্থ অনুকরণের রঙ্গমঞ্চ করে' তুল্‌বেন না, বাঙ্গালীকে খাট্‌তে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের পেট নিজে চালাতে হবে। য়ুরোপ যে মানুষ হয়ে উঠেছে—তাদের তপস্যার ইতিহাস জান? বরফ সরিয়ে, পাথর কেটে তারা কতদিন গায়ের রক্ত জল ক'রে জাতির অন্নসংস্থান করেছে—তাই তো কমলার শুভদৃষ্টি উহাদের উপর পড়েছে, তাই তো তারা আমাদের পায়ের গোলাম করে' রেখেছে।

বাঙ্গালী! আজ তোমাদের যোগ মোক্ষসাধনের জন্য নহে। জাতিকে সকল দিক থেকে মুক্ত করে' তোল্‌বার জন্য। রাজনীতির মোহ তোমাদের ভেঙ্গেছে, এইবার নির্ম্মাণের যুগ। তোমাদের অসাধারণ তপোবল দিয়ে, জাতির চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দাও—তাদের কি কর্‌তে হবে। শঙ্কর থেকে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত অনেক মহাপুরুষের উপদেশবাণী আমরা শুনেছি, আর ধর্ম্ম উপদেশের আড্ডা গড়্‌তে হবে না, বাংলার অন্নচিন্তা চমৎকার, কেমন ক'রে মাটী চ'ষে লক্ষ্মীকে আয়ত্ত কর্‌তে হয়, দেখিয়ে দাও।

চব্বিশ ঘণ্টা কাজের মধ্যে থেকেও ধর্ম্মতত্ত্ব কেমন সরল সহজ ক'রে ব্যক্ত করতে হয় একবার জাতিকে জানিয়ে দাও, ব্রহ্মণ্যশক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যশক্তিও সমানভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, তা একবার প্রমাণ কর, দোহাই বাংলার মুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ! তোমরা আসন ছেড়ে একবার এই মরা জাতিটার চোখ ফোটাও, ধর্ম্ম দিয়ে জাতির জীবন যে গড়ে' উঠ্‌তে পারে তার আয়োজন কর, কর্ম্মের মাঝেই অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার কর, তা না হ'লে বাংলার প্রতিষ্ঠান চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে যায়—রক্ষা কর।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

দ্ধিজীবী যাঁহারা, তর্কই যাঁহাদের কাছে প্রমাণ, তাঁহাদিগকে আমরা
ঝাইব কি করিয়া? বাস্তবে, চক্ষু দিয়া যাহা দেখিতেছি না, তাহার
ত্যতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার উপায় কি? বাস্তবের আগে ভাব, কর্ম্মের
াগে চিন্তা, বাহিরের আগে ভিতর, দেহের আগে আত্মা, এই সহজ
থাটা যে ধরিতে পারে না তাহাকে তর্ক করিয়া বুঝান মিথ্যা প্রয়াস।
ার্কিক জানেন শুধু একটি কথা, ফলেন পরিচীয়তে—যতক্ষণ বাহিরের
াটা ফলটি ঝুলাইয়া না দিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমরা যে তাঁহার
াছে হাস্যাস্পদই হইতে থাকিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু
ল যদি গাছে একবার ধরে, তবে এই সন্দেহবাদীরাই সকলের আগে
াহা কুড়াইতে ছুটিয়া আসিবেন, প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইবেন এই ফল
কমন অব্যর্থ পরম্পরায় ঘটিয়াছে—ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহার অন্যথা
হইতেই পারিত না।

ঘটন—miracle আমরা বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করিলে যেন
ির ধার কিছু কমিয়া যায়। তাই আমরা সকল ঘটনাকে
াঁধিয়া দেখাইতে সচেষ্ট। নূতন একটা জিনিষ
বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিব, প্রমাণ?
হইয়াছে? ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন অর্থাৎ
জিনিষ কোনদিনই কিছু হয় নাই। দেখাও
য়া দেখাইয়া দিব কি রকমে তাহা
বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কার্য্যকারণ
াইতে যে বুদ্ধি এত সুপটু, সে
বিষয় লইয়াই সে কার্য্যটি
করিয়া বসিতে পারে না

ন? যে ভবিষ্যৎ জিনিষ খুবই স্বতঃসিদ্ধ তাহার সম্বন্ধেও পর্য্যন্ত দেখি সে ভুল করিয়া বসে। বুরবন রাজবংশ কেমন বনিয়াদী হইয়া ফরাসীর রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রলয়ের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত কয়জন বুঝিয়াছিল ভাবিয়াছিল যে সব ডুবিতে চলিয়াছে? কাইজর উইলহেল্‌ম, জার নিকলাস এতবড় সাম্রাজ্য অতুল প্রতাপে চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও miracleকে বিশ্বাস করেন নাই—তাঁহারা ত করেন নাই, আমাদের বুদ্ধিজীবী মহা মহা রাজনীতিবেত্তারাই বা, যাঁহারা কার্য্যকারণজ্ঞ বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন, তাঁহারাই কয়জন বুঝিয়াছিলেন? এই বুদ্ধি লইয়াই ত আমরা আবার দম্ভ করি—ইহারই সহায়ে ভবিষ্যতের মানচিত্র আঁকিয়া দিতে চেষ্টা করি।

বস্তুতঃ অঘটন বা অপ্রত্যাশিত কিছু যে ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই না, তাহার কারণ ঘটনাগুলি হইয়া গেলে পর আমরা দেখি, বিচার করি, তখনই কার্য্যপরম্পরা খুঁজিয়া পাতিয়া মিলাইয়া লই, নানাদিক হইতে নানাভাবে ইহার অব্যর্থতার প্রমাণ স্তূপীকৃত করি। আমরা কারণ হইতে কার্য্যে পৌঁছি না, কার্য্য দেখিয়া কারণে পৌঁছিতে চেষ্টা করি, অথচ কারণই আগে, কার্য্য পরে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাই বুদ্ধি অন্ধদৃষ্টি—কারণ, সে দেখিতেছে বর্ত্তমানের কারণ-শক্তি সব—তাহাও নয়, সে দেখিতেছে অতীতের কার্য্য সব, এই অতীতের কার্য্যের মধ্যে কতখানি কি ভবিষ্যতের কারণরূপে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা ত সে দেখিতেছে না।

ভবিষ্যৎ যখন বর্ত্তমান বা অতীত হইয়া যাইবে তখনই সে চেষ্টা করিবে, কিরূপে এমন হইল। প্রকৃত পক্ষে জগৎ প্র হইতে অঘটনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে—আগে হইতে অঘটনই বলিতাম, ঘটনার পরে তাহাকে জানি হইলেও তাহাকে অবিলম্বে খুব স্বাভাবিক ব রাদে চলিতে থাকি।

নূতন ভবিষ্যতের কি কারণ-শক্তি ব আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি

সুতরাং তর্ক করিয়া ক গীতার কথায়, অব্যবসায়ী

আমাদের জাগ্রত সাধনা তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া। যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, ভিতরের দিব্য আলোক যাহাদের ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা সকলে অগ্রণী হইয়া আমাদের সাথে এস। আমাদের সম্মিলিত প্রতিভা আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি জাগ্রতেই ফলাইয়া অন্ধেরও চোখ ধাঁধাইয়া দিব। বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার শ্রেষ্ঠ কৌশল হইতেছে প্রাণকে আগে পরাস্ত করা। কারণ বুদ্ধি গ্রহণ করে প্রাণেরই ছাপ। বুঝিতে চাহে না যে, পারে না যে, তাহাকে বুঝাইতে হইলে পৌঁছিতে হইবে তাহার প্রাণের দুয়ারে। আর প্রাণে আঘাত দিতে হয় প্রাণ দিয়া। জলন্ত তপঃশক্তি অশ্রদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া দিবেই—সে ভস্মরাশী হইতেই ফুটিয়া উঠিবে জ্ঞানের স্নিগ্ধ শান্ত শতদল।

প্রকাশের চিঠি

তোমাদের তিনখানি পত্র প্রতিদিন উঁকিঝুঁকি মারছে—জবাবের প্রত্যাশায়। পত্রাদি লেখবার আর তেমন স্পৃহা নাই, একটা বিশাল ভাবসমুদ্রে ডুবে আছি।

যাই হোক, এই মাত্র একমাসের মধ্যে অন্তরের মণিকোটার দুয়ারগুলো একে একে খুলে গেছে, আর দেখেছি কত প্রকাশ করবার আছে, অনন্ত জীবন, অনন্তকাল ধরে' কেবলই প্রকাশ, কেবলই আনন্দ, নিত্যই নব নব সৃষ্টি।

তুমি সাধনার কথা লিখেছ—আমার নিকট থেকে একটা স্পষ্টতা চেয়েছ। আমি দেখ্‌ছি আমি তো কিছুই করি না, কালী যা করিয়ে নেন তাই হয়। আমায় যারা ভালবাসে, আমার যারা সহযাত্রী তারা শুধু এই জন্মের নয়, জন্ম জন্ম তাদের পেয়ে এসেছি, আজও পেয়েছি; যারা এই জন্মের, তাদের সঙ্গে কেবল ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌ছে, কাউকে আপন করে পাবো, কাউকে বা ছেড়ে চল্‌তে হবে, যে আমার সে চিরদিনের জন্য আমারই থাক্‌বে। আমি বেশ করে' দেখেছি, তুমি যে আমা ছাড়া কিছু করতে পার না, এটা তোমার অক্ষমতার পরিচয় নয়, এইটা আমাদের অমোঘ মিলনেরই একটা লক্ষণ মাত্র। জন্ম জন্মের বন্ধন এমন নিদারুণ হয়েই দেখা দেয়, কিন্তু এ বন্ধন বড় মধুময়, যখন এই দ্বৈতবোধের মধ্যে অদ্বৈতবোধের খেলা চলে।

আজ বাংলায় অভিনব প্রকাশের যুগ এসেছে, একই কেন্দ্রশক্তি বিচিত্র আকারে প্রকাশ পাবে, কত শত সহস্র Commune গড়ে উঠ্‌বে, কত ভেঙ্গে চূর্ণ হবে, কতক বা মিলে গিয়ে এক বিরাট সমষ্টি গড়ে উঠ্‌বে।

সমাজ, ধর্ম্ম, আর্ট, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, সাহিত্য, এই সবেতেই নূতনে

লা পরিদৃষ্ট হবে, এই সকলের ভিতর দিয়ে Spirit materialised
বে। সারা ভারতের সঙ্গে বাংলার কর্ম্মসাদৃশ্য ক্রমশঃই লোপ পাচ্ছে,
ন্তু বাংলার তপস্যা একদিন ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যই প্রযুজ্য
ব। এত বড় বড় কথা আমি ভাল বুঝি না—আমি বুঝি বাংলাকে,
ালীকে নূতন জীবন দিতে হবে, বাংলার নারীসমাজ নূতন করে' গড়ে'
লতে হবে, বাংলার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধার করতে হবে, সে ঐশ্বর্য্য আত্মা,
াংলার আত্মা জাগ্‌লেই আমার সাধনা সিদ্ধ হবে। আমার পশ্চাতে যে
সীম বিজ্ঞানশক্তি আছে তার কতটা প্রকাশ এই জীবনেই হবে, তার
জ পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু তারা, যাদের সঙ্গে আমার আত্মার
লন জন্ম জন্ম ধরে' সুসিদ্ধ হয়ে এসেছে, যারা কোন আদর্শের জন্য নয়,
সিদ্ধির জন্য নয়, আমার নাম ও সম্পদের জন্য নয়—শুধু প্রেমের
জন্য হৃদয় খুলে দিয়েছে তাদের নিয়েই আমার কাজ।

তাদের জন্যই আমি উন্মাদ। তাদের ভিতর দিয়েই বাংলার আত্মাকে
ুদ্ধ করবার বাতুলতা আমার মধ্যে স্থান পেয়েছে; সাধারণক্ষেত্রে, সাধা-
কর্ম্মে হস্তক্ষেপ আমি করতে পারি না, আমি তাদের আগে ফিরে
তে চাই, যারা আমায় যুগ যুগ ধরে' ভালবাসে। যারা কাজের জন্য
সছে—তাদের কর্ম্মক্ষেত্র আজ সুবিস্তৃত, স্থানাভাব হবে না; কিন্তু যাদের
য় খুঁজতে আমি আজ পথের বাহির, যারা আমায় খুঁজে নিতে ঘুরে
বড়াচ্ছে, তাদের একজায়গায় দাঁড় করিয়ে একবার দেখে নিতে চাই—
তারপর ছড়িয়ে পড়ুক, সর্ব্বত্র কাজ করুক স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে, আত্মার
আদান প্রদান দিয়েই কর্ম্ম সুশৃঙ্খলিত হবে—আড়ম্বর নয়, উত্তেজনা নয়,
পস্বীর মত সারা জন্ম কাটিয়ে যেতে হবে। ইহাতেই তাদের আনন্দ।

আমি তোমায় নিশ্চিন্ত করতে পারবো না, তোমায় কোন আশ্বাসই
ত পারবো না, যদি নিজে থেকেই আশ্বস্ত না হও, নিশ্চিন্ত না হও;
সই নির্ভর করছে তোমার উপর, তবুও আমায় ভালবাসতে হবে,
ায় হৃদয় দিতে হবে, এ কি অত্যাচার! না ইহাই তোমার ও আমার
বনের সত্যপ্রেরণা। ইতি—

তিলকের মহাপ্রস্থান

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক আজ আর ইহজগতে নাই। ভারতে যেন ইন্দ্রপতন ঘটিল। গগনচূড়া হইতে যেন গ্রহরাজ অকস্মাৎ খসিয়া পড়িল। বিধাতার নিষ্ঠুর বজ্র আজ আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতবর্ষের বুকে যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার সৃষ্টি করিল, তাহা কোনও দিন মুছিবার নহে। এ বেদনা অসীম।

তিলক কেবল মহারাষ্ট্রের কুলতিলক ছিলেন না, তিলক ভারতের মুকুটমণি, ভারতরাষ্ট্রমণ্ডলের তিনি দীপ্তসূর্য্য, ভারতজননীর তিনি মাথার উজ্জ্বল কোহিনুর—মহাকাল আজ এই কোহিনুর হরণ করিয়া লইল। ত্রিংশকোটী নরনারী বালবৃদ্ধ নৃপতিকৃষকে অনন্ত শোকসাগরে ভাসাইয়া, জননীর বরেণ্য সন্তান আজ অন্তর্হিত, কর্ম্ম অসম্পূর্ণ, ত্র অসমাপ্ত, ভারতের গগন পবন উৎকট হাহাকারে ছাইয়া কে জানে ভারতের ভাগ্যবিধাতা আজ যবনিকার অন্তরালে নির্ম্মম প্রহেলিকারহস্যে নিমগ্ন—মায়ের এই শূন্য কো দিন পূর্ণ হইবে? না, হওয়া সম্ভব?

তিলকের মৃত্যু সংবাদে মহারাষ্ট্র কাঁ ছ, বাংলা, অযোধ্যা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সকলে ায়ার হইতে চট্টগ্রাম, দিল্লী হইতে রামেশ্বর শ্র-সমুদ্রে ভারতবাসী ভাসমান, এ শোকোচ্ছ্বাসের ? এমন মরণও বুঝি সত্যই সাধের, সুখের, পরম জরাজ্যেশ্বরকে হারাইয়াও কোনও রাজভক্ত জাতি এমন করে না—তিলক ভারতবর্ষের ছিলেন মুকুটহীন সম্রাট্, না, তাহার চেয়েও অধিক কিছু—ভারতেতিহাসে তিলকের নাম তাহার শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপগণের সঙ্গে একাসনে সমগৌরবে চির প্রাতঃস্মরণীয় পূজার্চ্চনার সামগ্রী হইয়া রহিবে। পরাধীন প্রজার জাতি আমরা, এই তাপসবৃন্দের পুণ্য চরণরেণু আমাদের যে একটা মস্ত সম্বল।

[illegible] অলোকসামান্য বরণীয় পুরুষের নূতন করিয়া চরিত্র পরিচয় দেওয়া অনর্থক বাহুল্য মাত্র। তিলককে কে না জানে? মহারাষ্ট্রের পল্লীকুটীরে গিয়া নিরক্ষর কৃষকবালাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিলক তাহার সুপরিচিত, হৃদয়ের অতি সন্নিকৃষ্ট, অপার ভক্তির, শ্রদ্ধার, অর্চ্চনার ঠাকুর—তিলকের একটি বাক্যে সমগ্র মহারাষ্ট্রের হৃদয়ে তাড়িৎ সঞ্চার হইয়া যাইত, তাঁহার একবার অঙ্গুলি হেলনে লক্ষপতি হইতে পথের মজুর পর্য্যন্ত একটী মানুষের মত যমের মুখেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে কুণ্ঠিত হইত না—শুধু মারাঠা কেন, উত্তর দক্ষিণ কোথায় তিলকের নামে তাঁহার ঘোরতর শত্রুর মস্তকও শ্রদ্ধাবনত হইয়া উঠে না—এই লোকপূজ্য লোকগুরুর আবার পরিচয় চাই?

সেই শালপ্রাংশু বৃষস্কন্ধ পুরুষ—যিনি ছিলেন একাধারে তাঁহার জন্মপ্রদেশের জীবন্ত প্রতিনিধি, প্রতীকস্থানীয় মারাঠী চিন্তাবীর এবং কর্ম্মবীর, জন্মসিদ্ধ রাজনীতিধুরন্ধর, বজ্রসঙ্কল্প স্বদেশপূজক—শুধু তাহাই নয়, যাঁহার প্রতিভার গৌরবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজ সমভাবে মুগ্ধচিত্ত, যাঁহার ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি সকল মায়াছল মুহূর্ত্তে উদ্ভিন্ন করিয়া উলঙ্গসত্যকে প্রকাশ করিয়া দিত, যে অতুল সত্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল মহিমাস্তম্ভ ম্লান ও অবনত করিবার জন্য অসংখ্য চক্রান্ত তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল, তবু যাহা একটুও নমিত হয় নাই,—এই শক্তিমান বজ্রসার চরিত্রের কোন্ অংশ রাখিয়া কোন্ অংশের বিবরণ দিতে হয়, তাহা জানি না—শতমুখে সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী চরিতবর্ণনও বুঝি উহার জন্য যথেষ্ট নয়। [illegible] ছিলেন ভারতের জাতীয় পক্ষের বিশাল মেরুদণ্ডস্বরূপ—প্রতি [illegible]য় তিনি ছিলেন Father of Indian unrest, [illegible] স্বদেশ মর্ম্মে হৃদয়ে ভালরূপেই অনুভব করে—মুমুক্ষু- [illegible] তিনিই ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ—জীবনব্যাপী [illegible]র উজ্জ্বল স্বরাজ আদর্শ তিনিই সিদ্ধির [illegible] ছিলেন—বিজয়ভাগ্য তাঁহার জীবনকালে

না ঘটিলেও, জয় অবশ্যার্থ ও অনিবার্য্য, এ ধ্রুব নিশ্চয়তা লই তিনি মরিতে পারিয়াছেন, মহাত্যাগী সন্ন্যাসীবীর—ভবিষ্যৎ বংশীয়ের জন্যই তিনি জয়মুকুট রাখিয়া গিয়াছেন—ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা।

যাও তিলক, আজ ধ্যাননেত্রে শুধু তোমার জ্ঞানবৃদ্ধ ভাগ্নবৎ সৌম্য শান্ত সুন্দর তপোমূর্ত্তি দর্শন করিব—ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার মৈনাকচূড়ার মত তোমার বিভূতিবান্ মহাসত্ত্ব লইয়া পরপারের সাগরবক্ষে জাগিয়া রহিও, নবীনভারতের পানে অমনি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিও, নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিও—হয়তো আরও শ্রেষ্ঠতর ভগবদ্‌বিভূতির জন্য তুমি স্থান ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিলে, কিন্তু তোমার নাম, তোমার স্মৃতি, তোমার অক্ষয় তপঃশক্তি হিরণ্ময় অক্ষরে চির-দিন এই মহাজাতি জনে জনে হৃদয়ে বাঁধাইয়া রাখিবে।